গ্রন্থাবলী-সিরিজ

দামোদর গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর-গ্রন্থাবলী

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(প্রথম ভাগ)

১। তিলোত্তমা, ২। নবাবনন্দিনী ৩। মৃন্ময়ী।

[একাদশ সংস্করণ]

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস।

তিলোত্তমা ও নবাব-নন্দিনী

বিজ্ঞাপন

"দুর্গেশ-নন্দিনীর" অনুসরণক্রমে কেন "নবাব-নন্দিনী" লিখিত হইল, এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার কথা ছিল; কিন্তু বলি বলি করিয়াও এবার তাহা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি কখনও এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তখন মনের কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও করিতে পারি।

যদি কেহ কৃপা-পরবশ হইয়া এই সামান্য পুস্তক মনোযোগসহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি তো এই পুস্তক-রচনা সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য কি, তাহার কতকটা আভাস বুঝিলেও বুঝিতে [illegible]রিবেন।

"নবাব-নন্দিনীর" গল্পাংশ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট [illegible]বার নিমিত্ত আমাকে "দুর্গেশ-নন্দিনী"-বিবৃত পাত্র-পাত্রী ব্যতীত বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন নূতন নর-নারীর আবির্ভাব করাইতে হয় নাই। পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই চিরপরিচিত আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা, ওসমান, জগৎসিংহ, অভিরাম স্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণেরই অনুষ্ঠান ও পরিণাম দেখিতে পাইবেন।

"দুর্গেশ-নন্দিনী"-বর্ণিত ইতিহাসের পরবর্তী ঐতিহাসিক ব্যাপার এই গ্রন্থে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই জন্যই এ "দুর্গেশ-নন্দিনীর" অনুসরণ নামে অভিহিত হইল।

ইতিহাসাংশ যথাযথ রাখিবার নিমিত্ত আমাকে স্থানে স্থানে "দুর্গেশ-নন্দিনী"-লিখিত কোন কোন ঘটনার একটু রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

তিলোত্তমা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষাদের ছায়া

গড়মান্দারণে বীরেন্দ্রসিংহের সেই দুর্গ সমানভাবে আকাশপথে মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুর্গ-পার্শ্বস্থ সেই আম্রকানন সমভাবে শাখাপ্রশাখা দুলাইতে দুলাইতে বায়ুর সহিত খেলা করিতেছে। সেই ক্ষুদ্রকায়া আমোদর নদী পূর্ব্ববৎ মৃদু-মধুর ধ্বনি করিতে করিতে দুর্গমূল প্রধৌত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে। সেই বসন্তের মন্দানিল চুতমুকুলের গন্ধাপহরণ করিয়া সমান ভাবে সকলের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সেই কবিপ্রসিদ্ধ বসন্তের অবিচ্ছিন্ন অনুচর কোকিল বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরালে প্রচ্ছন্নদেহ হইয়া ক্রমোচ্চকণ্ঠে তান ছাড়িতেছে, সুনীল গগনাঙ্গনে সেই চন্দ্রতারকা সমানভাবে মেঘমধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছে।

সকলই সমান আছে; কিন্তু কি অল্পকালের মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটিয়া গিয়াছে। সেই শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত বিমলা ও দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার প্রথম সক্ষাৎ, আর পাঠান-দুর্গে বিমলার অস্ত্রাঘাতে নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু—এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটিয়াছে। সেই কাল-রাত্রি—যে রাত্রিতে বিমলার অসাবধানতায় পাঠানগণ দুর্গজয় করিয়া দুর্গস্বামী বীরেন্দ্রসিংহ ও জগৎসিংহকে বন্দী করিয়াছিল, সে কালরাত্রির কোন চিহ্নই এখন আর বিদ্যমান নাই। যে শোণিতস্রোতে সে দুর্গের নানাস্থান কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অণুমাত্র অঙ্কও এক্ষণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না। যে হাহাকার রবে সে দিন দুর্গ প্রকম্পিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও এক্ষণে শ্রবণগোচর হইতেছে না। দুর্গে সর্ব্বত্র শোভা ও সমৃদ্ধির বিবিধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে; সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে; সকলেই সমভাবে রহিয়াছে সত্য; কিন্তু সে বীরকেশরী বীরেন্দ্রসিংহ আর নাই। এই অল্প-কালের মধ্যে বিমলা বিধবা হইয়াছেন, তিলোত্তমা পিতৃহীন হইয়াছেন। দুর্গের সকলই আছে, সকলই ফিরিয়াছে; কেবল সেই বীরেন্দ্রসিংহ [illegible] নাই—তিনি আর ফিরেন নাই! যে যমের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে কেহ কখন আর ফিরিতে দেখিল না।

কত লোকই যমালয়ে গিয়াছে, কত লোকই নিত্য সেই স্থিরনিবাসে প্রস্থান করিতেছে; কেহই কখনও সে স্থান হইতে ফিরে নাই এবং ফিরিতেছে না। তাহাতে সংসারের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধিও কিছুই কখনও ঘটিতেছে না; অথবা সে জন্য বসুন্ধরার সুখদুঃখ-স্রোতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে না। গড়মান্দারণের অধীশ্বর বীরেন্দ্রসিংহ ফিরেন নাই, সে জন্য দুর্গের বিশেষ কোন অপচয় হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে না। রোদন যায়, হাস্য তার স্থান অধিকার করে; হাস্য যায়, রোদন তার স্থান গ্রহণ করে; হাসি কান্না বোধ হয় সমসূত্রেই গ্রথিত; উভয়েই বোধ হয় সমান গতিতে অবিরত বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিতেছে।

বিমলা—সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যময়ী, হাস্য কৌতুকনিরতা বিমলা বিধবা হইয়াছেন। প্রণয়াস্পদ পুরুষকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, সহধর্ম্মিণীরূপ গৌর-বের পরিচয় গোপন করিয়া কাল্যাতিপাত করিতে হইয়াছে, তাঁহার সেই হৃদয়দেবতা তাঁহাকে চিরদিনের নিমিত্ত ছাড়িয়া গিয়াছেন। বড়ই অসহনীয় যাতনা! কিন্তু এত যাতনার মধ্যে সন্তোষের ঘটনা কিছুই নাই কি?—আছে। তাঁহার বীরপতি বীরের ন্যায় তেজস্বিতা সহকারে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা বীর-পত্নীর বড়ই

গৌরবের কথা। আর গৌরবের কথা,—বিমলা স্বহস্তে পতিহন্তা হৃদয়-হীন শত্রু নবাব কতলু খাঁর বক্ষোদেশে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শমনমন্দিরে প্রেরণ করিয়াছেন। আরও বিশেষ আহ্লাদের কথা,—তাঁহার বড় আদরের কন্যা, যত্ন-পালিতা তিলোত্তমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে; সেই সুশীলা সুর-সুন্দরী এক্ষণে পরম গৌরবান্বিত মহারাজা মানসিংহের পুত্রবধূ হইয়াছেন; তাঁহার গর্ভজাত পুত্রের অম্বরেশ্বর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বড়ই অতুলনীয় আনন্দ!

তিলোত্তমা—পিতৃহীনা—দুঃখিনী তিলোত্তমা প্রেমময় পিতার স্নেহধনে বঞ্চিত হইয়া বড়ই মর্ম্ম-ব্যথা পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মর্ম্ম-ব্যথার মধ্যে আনন্দ-প্রদ ঘটনা কিছু নাই কি? কি—যথেষ্ট আছে। তিনি পাপপঙ্কিল নবাব-অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়াছিলেন, সে স্থান হইতে কেহ কখন আপনার পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখিয়া ও ধর্ম্ম-ধন সঙ্গে লইয়া ফিরিতে পারে না। তিলোত্তমা তাহা পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সাররত্ন জগৎ-সিংহ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে মৃতকল্প হইয়াও পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। সেই একান্ত প্রেমমুগ্ধ, সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-সৌভাগ্য-শালী বীরপুরুষ বিবাহরূপ পুণ্যময় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তিলোত্তমারই হইয়াছেন। বড়ই অতুলনীয় আনন্দ!

মহারাজ মানসিংহের বাসনানুসারে গড়মান্দারণ স্বর্গীয় বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী ও কন্যার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কিছু দিনের জন্য এই দুর্গ পাঠানদিগের হস্তগত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে কোথাও সে পরাধীনতার কোন নিদর্শন নাই।

অপরাহ্নকালে এই দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুর-সংলগ্ন ছাদের উপর কুমার জগৎসিংহ একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিলে তাঁহাকে যেন উৎকণ্ঠিত বলিয়া অনুমিত হয়। সুস্নিগ্ধ বায়ু ও দিগন্ত-ব্যাপী রমণীয় দৃশ্য কিছুই যেন তাঁহাকে এখন বিনোদিত করিতেছে না। এখনও এক মাস অতীত হয় নাই, তিনি আপনার প্রাণ-মন-বিনোদন-কারিণী সুন্দরীর সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নবোঢ়া কামিনী এক্ষণে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সহচরী বলিলেও হয়, তথাপি তিনি চিন্তিত কেন?

দ্বারকেশ্বর নদী-তীরে মহারাজ মানসিংহ আপনার সৈন্যাদি সহ শিবির-স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি ছাউনি উঠাইয়া অনুচরগণ সহ পাটনায় চলিয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ যথাসময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে বিশেষ কোন কার্য্যের ভার কুমার জগৎসিংহের হস্তে অর্পিত ছিল না; যুবরাজ স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত স্থানে কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই গড়মান্দারণে প্রেমময়ী প্রণয়িনীর সঙ্গসুখে কাটিয়া যাইতেছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার সৈন্যাদিও বিশেষ কর্ম্মাভাবে দারুকেশ্বর-তীরে আলস্যে কাল কাটাইতে লাগিল।

যে ছাদের উপর জগৎসিংহ পরিভ্রমণ করিতে-ছেন, তাহার এক দিকে মহার্হ শয্যা রচিত রহিয়াছে, যুবরাজ তাহাতে আসীন না হইয়া ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারংবার পরিক্রমণ করিতেছেন।

সেই ছাদে সহসা এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী উপ-স্থিত হইলেন। অস্তোন্মুখ ভাস্করের স্বর্ণ-বর্ণ-রশ্মিমালা-সমাচ্ছন্না সুষমাময়ী প্রকৃতিও সেই লাবণ্যময়ী ললনার সমাগমে সমুজ্জ্বল ও শোভাময় হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-সম্পন্না যুবতী ধীর ও সলজ্জপদে জগৎসিংহের সমীপাগত হইয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "যুবরাজ, আমার অধিক বিলম্ব হইয়াছে কি?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "বোধ হয়, অধিক বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু প্রাণাধিকে, যাহার তিলমাত্র অদর্শনও অসহ্য, তাহার অত্যল্প বিলম্বও অনেক বলিয়া মনে হয়।"

সেই লজ্জাশীলা সুন্দরী ঈষৎ হাস্য সহকারে বদন বিনত করিলেন। যুবরাজ সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশে বামহস্ত প্রদান করিয়া দক্ষিণ-হস্তে তাঁহার বদনকমল উত্তোলন করিলেন এবং কোনরূপ নিমন্ত্রণ বা আহ্বা-নের অপেক্ষা না করিয়া নবীনার সুধাস্নিগ্ধ বিম্বাধরে প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন। লজ্জা ও অনুরাগে, সঙ্কোচে ও আদরে যুবতীর মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

এই সুন্দরী দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা। যুবক-যুবতীর পরিণয়-সম্বন্ধ বড় অধিক দিন সংঘটিত হয় নাই; তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচয়ও অধিকদিনব্যাপী নহে; সুতরাং স্বভাবতঃ সুশীলা সুন্দরীর সঙ্কোচ ও স্বাধীনতা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিলোত্তমা বদনকমল আরও বিনত করিলেন। আনন্দ ও অনুরাগ-মিশ্রিত ব্রীড়া তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব

শোভা সংবিধান করিল। মুগ্ধ জগৎসিংহ অতৃপ্ত নয়নে সেই শোভা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "বলিতে পার সুন্দরি, কোন্ পুণ্যবলে আমাদের এই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছে ?"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কাহার পুণ্যফলে ? তোমার, না আমার ?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আমার। তুমি ভুবনের সাররত্ন—এ অতুলনীয় রত্ন দেবকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইলেই যথোপযুক্ত হইত। আমি তো ছার ক্ষুদ্র মনুষ্য; এ মিলন যদি কোন পুণ্যের ফলে হয়, তাহা হইলে সে পুণ্য জন্মান্তরে নিশ্চয়ই আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "মিথ্যাকথা গোপন করিতে হইলে ঐরূপ মিষ্টকথাই বলিতে হয় বটে, কিন্তু জান না কি দেবতা, তুমি কে, আর আমি কে ? তুমি ভুবন-বিখ্যাত অম্বরেশ্বরের পুত্র; রূপে, গুণে, সাহসে, বীর্য্যে বসুন্ধরায় অতুলনীয়। আর আমি ? আমি ক্ষুদ্র গড়মান্দারণের ক্ষুদ্র নায়কের কন্যা—তোমার দাসী হইবারও অযোগ্যা। তুমি যে দয়া করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয়াছ, সত্য বল দেখি, ইহা কি আমার কোটি কোটি জন্মের পুণ্যফল নহে ?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "পুণ্য তোমারই হউক আর আমারই হউক, সে বিবাদে আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু হৃদয়দেবি, এ বসুন্ধরায় যে স্বর্গের অপেক্ষা মধুরতর স্থান বিরচিত হইতে পারে, এ নশ্বর জগতে হীন মানবও যে নন্দনকাননচারী দেবগণের অপেক্ষাও অধিকতর সুখভোগ করিতে পারে, তাহা আমি তোমাকে লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমাকে ভাগ্যবান্‌দিগের অগ্রগণ্য করিয়াছ। আমি তোমার নিকট চিরঋণে বদ্ধ।"

ঈষৎ হাসি মিশাইয়া তিলোত্তমা বলিলেন, "কঠোরহৃদয় অসি-সাধক বীরের রসনায় এত মধু সঞ্চিত থাকিতে পারে, আমার জানা ছিল না। ঋণের কথা বলিতেছ গুণময়, কিন্তু কে কাহার নিকট চিরঋণে বদ্ধ, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ ? মনে করিয়া দেখ দেখি, তুমি আমার নিমিত্ত কি না করিয়াছ ? বীরপুত্র, স্বয়ং বীরশ্রেষ্ঠ হইয়াও তুমি গভীর নিশীথে পরকীয় দুর্গে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ, কি জন্য ?—একবার এই সামান্য নারীকে দর্শন করিবার আশায়। তুমি পুণ্যময় ও পরম ধার্ম্মিক হইয়াও স্বল্পপরিচিতা এক অবিবাহিতা কুলকামিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ; কি জন্য ? একবার এই ভাগ্যবতীর সহিত দুইটা কথা কহিবার অভিপ্রায়ে। তুমি শত্রুর অবিরল অস্ত্রাঘাতে শরীরের অমূল্য শোণিতপরিশূন্য হইয়া মরণদ্বারে উপনীত হইয়াছিলে, কি জন্য ?—এই অধমা নারীর জীবন-রক্ষা করিবার বাসনায়। তুমি দুরন্ত শত্রুর হস্তে সুদীর্ঘকাল বন্দিভাবে জীবন-যাপন করিয়াছ; কি জন্য ?—এই হীনা নারীর প্রতি প্রেমাকর্ষণই তাহার কারণ। তুমি তোমার চরণসেবার অযোগ্যা এই নারীকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতার বিরাগভাজন হইয়াছ; কি জন্য ?—এই অধম নারীর প্রতি একান্ত অনুকম্পাই তাহার হেতু। তবে বল দেখি যুবরাজ, কে কাহার নিকট চিরঋণী ?"

তিলোত্তমার কথার শেষভাগ জগৎসিংহকে নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি সুন্দরীর অন্য কথার আলোচনা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জানি না প্রাণেশ্বরি, আমার অদৃষ্টে কি আছে; কিন্তু তুমি যে প্রসঙ্গতঃ পিতার বিরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাতে আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছি। সে চিন্তায় উদাসীন থাকা আর আমার উচিত নহে। আইস; আমরা এই আসনে বসিয়া অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহারই বিবেচনা করি।"

তিলোত্তমা নীরব। তাঁহার সেই প্রফুল্ল-কমলতুল্য মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি জানিতেন, মহারাজ মানসিংহের অগোচরে বিবাহ হইল বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম হয় ত ভয়ানক হইবে। অধুনা যুবরাজের মুখেও সেইরূপ আশঙ্কার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়ে ধীরে ধীরে স্বামীর অনুগমন করিলেন এবং নিঃশব্দে সেই আসনের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

জগৎসিংহ সরিয়া গিয়া তিলোত্তমার নিকটস্থ হইলেন এবং বামবাহু দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া সেই উৎকণ্ঠিত নিশাবসানকালীন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ম্লান মুখমণ্ডল স্বকীয় বিশাল বক্ষের উপর বিন্যস্ত করিলেন। তিলোত্তমা সভয়ে ও সকাতরে দেবোপম স্বামীর বদনের প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

জগৎসিংহ বলিতে লাগিলেন, "বাস্তবিকই আমার পিতা আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি মুখে কোন বিরাগের কথা ব্যক্ত করেন নাই অথবা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারাও আমাকে হৃদয়ভাব জানিতে দেন নাই, তথাপি

শতসহস্র লক্ষণ দ্বারা আমি তাঁহার বিরক্তির প্রমাণ পাইয়াছি॥"

তিলোত্তমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তথাপি তুমি সাবধান হও নাই কেন?"

জগৎসিংহ সেই সরলার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সাবধান? সরলে, তোমার এই মুখ যে দেখিয়াছে, তোমার প্রেমসাগরে যে ভাসিয়াছে, তোমাকে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে কি কখনও কোন বিপদের ভয়ে বা কোন সর্ব্বনাশ সম্মুখে দেখিয়া সাবধান হইতে পারে? সাবধানতার কথা বলিও না। আমি সাবধানতার কথা একবারও ভাবি নাই।"

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন, "তবে এখন ভাবিতেছ কেন?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "ভাবিতেছি দুই কারণে। তোমার পিতা রাজপুত বীর। তাঁহার মনে যে [illegible] উদয় হইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইবে না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবার লোক সংসারে কেহ নাই। স্বয়ং বাদশাহ আকবরও তাঁহার ইচ্ছার অধীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতা যদি অবাধ্য সন্তান বোধে আমার প্রাণদণ্ড করেন, তাহাতেও কোন বিচিত্রতা নাই।"

তিলোত্তমা চমকিয়া উঠিলেন। জগৎসিংহ বলিলেন, "ভয় করিও না; রাজপুতবীর মরিতে কখনও ভয় পায় না। জীবনে কখনও মরণের ভয় ছিল না, কিন্তু এখন হইয়াছে। এখন মরিলে তোমার সঙ্গশূন্য হইতে হইবে, এ চিন্তা অসহ্য।"

তিলোত্তমা সজল-নয়নে বলিলেন, "প্রেমময়, সঙ্গশূন্য হওয়ার আশঙ্কা আমার নাই। তুমি বীর-শ্রেষ্ঠ—অকাতরে মরিতে জান; বীর-পত্নীও হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "কিন্তু সে আশঙ্কা এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ হয় ত পিতাকে সহসা তাদৃশ কঠোর কার্য্যে প্রবৃত্ত না করিলেও করিতে পারে। কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষাও বহুগুণ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সহজে প্রাণনাশ করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান না করিয়া, তিনি হয় তো ধীরে ধীরে অতি ভয়ানকরূপে আমাকে মরণের পথে ফেলিয়া দিতে পারেন।"

তিলোত্তমা নিতান্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তিনি হয় তো তোমাকে গ্রহণ বিষয়ে অসম্মত হইতে পারেন। তিনি হয় তো যাহাতে তোমার সহিত আমার আর কখনও সাক্ষাৎ না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

তিলোত্তমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি রোদনবিজড়িত রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমার বিমাতা ধর্ম্মপত্নী হইয়াও আপন স্বামীর গৃহে দাসী-রূপে জীবন কাটাইয়াছেন। শ্বশুরগৃহে সে ভাবে কি আমার স্থান হইবে না?"

জগৎসিংহ স্বকীয় বস্ত্রে তিলোত্তমার নয়নমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "ভয় করিও না, ব্যাকুল হইও না। মনুষ্যবাসের বাহিরে, দূর সমুদ্রতীরে তোমাকে লইয়া আমি বৃক্ষতলে বাস করিতে পাইলেও ধন্য হইব। কিন্তু আমার পিতা অসীম শক্তিশালী পুরুষ; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারে, এমন লোক কে আছে? যাহাতে সকলই শুভ হয়, আমি তাহার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিব। তাহার পর ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।"

তিলোত্তমা তখন নীরব। তাঁহার চক্ষুতে আর জল নাই, মুখে বিষাদ নাই। জগৎসিংহ সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, "কি ভাবিতেছ তিলোত্তমা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিলোত্তমা বলিলেন, —"ভাবিতেছি, মরণের পথ সর্ব্বদাই খোলা আছে, তবে চিন্তা কিসের?"

নবপরিণীত প্রেমোন্মত্ত দম্পতির কি বিষম যন্ত্রণা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়া-শরীরী

জগৎসিংহ পরদিন প্রাতঃকালে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তখন উষার সম্মোহন মধুরালোকে প্রকৃতি পরম রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছে; তখন পূর্ব্বদিগঙ্গনা রক্তাম্বরী প্রগল্‌ভা নারীর ন্যায় অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া হাস্য করিতেছে; তখন দহিয়াল পক্ষী নাত্যুচ্চ বৃক্ষের ঘন বল্লীর অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া মধুর গীতধ্বনিতে শ্রোতৃ-মন মুগ্ধ করিতেছে; তখন পিককুলের কুহুস্বর উহু, উহু, উহু,

চোখ গেল ধ্বনির সহিত মিশিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আনন্দধারা ছড়াইয়া দিতেছে; তখন শান্তি ও পবিত্রতা, মাধুর্য্য ও শোভা, প্রীতি ও আনন্দ যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। সেই সময় জগৎসিংহ স্বীয় শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী দুর্গতোরণমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই শান্তিপূর্ণ দৃশ্যাবলীর মধ্যে চিরাভ্যস্ত অশ্ব যেন সেই চিরপরিচিত ভার পৃষ্ঠে লইয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা নিদ্রার সন্তাপনাশক আশ্রয় লাভ করিয়া একবারও সুখী হন নাই। বায়ুপ্রবাহে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করিলে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতল হইবে, চিন্তার ভার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইবে মনে করিয়া যুবরাজ দুর্গের তাবৎ ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই শয্যা-ত্যাগ করিয়াছেন। যখন তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তিলোত্তমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। জগৎসিংহ অতি সন্তর্পণে তাঁহার জীবনস্বরূপা সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং অতৃপ্তনয়নে কিয়ৎকাল সেই নিদ্রাভিভূতা মাধুরীরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বড়ই আদরের সহিত তাঁহার কপোল চুম্বন করিলেন। তাহার পর সেই স্বভাবসুন্দরীর শোভাময় শরীর সন্দর্শন করিতে করিতে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সাধের কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দুর্গ হইতে কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হওয়ার পর জগৎসিংহের কি মনে হইল, দুর্গের যে অংশে তিলোত্তমার শয়ন-মন্দির, সেই দিকে নেত্রসঞ্চালন করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অশ্ব-বল্গা সংযোজিত করিতে হইল; [illegible]বং নির্নিমেষ-নয়নে সেই দৃষ্ট বস্তুর অভিমুখে [illegible]য়া রহিতে হইল। সেই শয়নকক্ষের বাতা-[illegible]খে আলুলায়িতকেশা বিগলিতকুন্তলা, বিস্রস্ত-[illegible] তিলোত্তমা দণ্ডায়মানা। জগৎসিংহ কত [illegible]য় কত ভাবেই সেই শোভাময়ীকে দর্শন করিয়া [illegible]াহিত হইয়াছেন; কিন্তু অধুনা এই মধুর সময়ে [illegible] ক্ষেত্রে মধুর নৈসর্গিক শোভামধ্যে যেন [illegible]ী মূর্তিময়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার [illegible] হইল।

জগৎসিংহ শয্যাত্যাগ করার অনতিকাল পরে [illegible]লাত্তমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এবং তিনি মন্দুরায় অশ্ব সজ্জিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, ব্যস্ততাসহ সেই প্রেমময় হৃদয়-রত্নকে দেখিবার আশায় সেই বাতায়নে অপেক্ষা করিতেছেন।

জগৎসিংহ বক্ষে উভয় হস্ত প্রদান করিয়া তিলোত্তমার প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন, উষ্ণীষ-বস্ত্র আন্দোলন করিয়া সুন্দরীকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন ও আপনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং হস্তচালনা করিয়া তিনি অচিরে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহারই সঙ্কেত করিলেন। অশ্ব আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। জগৎসিংহ আবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সুন্দরী সমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। জগৎসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হইবামাত্র তিলোত্তমা গললগ্নীকৃতবাসা হইলেন এবং ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জগৎসিংহ উভয় করপল্লব প্রসারণ করিয়া শুভেচ্ছা প্রকাশ করিলেন এ[illegible] সুন্দরীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার স[illegible] করিলেন। অশ্ব ধীরে অগ্রসর হইল। জগৎসিংহ আবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই বাতায়ন-সমীপে তিলোত্তমা রোদন করিতে করিতে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিতেছেন। মন নিতান্ত অস্থির হইল; অগ্রসর হইতে আর মন সরে না। অল্পমাত্র পর্য্যটনের পর অচিরে প্রত্যাগমন করিবেন স্থির করিয়া অশ্বদেহে মৃদু কশাঘাত করিবা-মাত্র সে বেগে প্রধাবিত হইল। জগৎসিংহ আবার ফিরিয়া দেখিলেন—সে বাতায়ন আর দেখা গেল না, অশ্বারোহী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বাহক সমান চলিতে লাগিল।

যে পথ অবলম্বনে বিমলার সহিত যুবরাজ প্রথমে রাত্রিকালে গড়মান্দারণ আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া জগৎসিংহ চলিতে লাগিলেন। সেই আম্রকানন—যাহার মধ্যস্থ বৃক্ষবিশেষে লুক্কায়িত পাঠান বিমলার প্রদত্ত বর্শা-বিদ্ধ হইয়া জগৎ-সিংহের হস্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সে উদ্যান অতিক্রম করিলেন। এই স্থলে এক অদ্ভুত বেশের পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে ব্যক্তি বিসদৃশ দীর্ঘকায় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নরসুন্দরের অস্ত্র-সাহায্যে তাহার মস্তক কেশশূন্য, কেবল যথা-স্থানে এক গুচ্ছ শিখা; বদন শ্মশ্রু ও গুম্ফ-বিরহিত। তাহার দেহের অধোভাগ পায়জামা দ্বারা আবৃত, ঊর্দ্ধভাগ চাপকান-সমাচ্ছন্ন; সেই চাপকানের উপর কণ্ঠদেশে রুদ্রাক্ষমালা; চরণদ্বয়

নগ্ন; সুদীর্ঘ নাসিকার উপরে তিলকের পরিবর্ত্তে একরাশি মৃত্তিকা সংলগ্ন। জগৎসিংহকে দর্শনমাত্র এ ব্যক্তি বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "খোদা নারায়ণ মহারাজের মেজাজ সরিফ করুন!"

জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনারই নাম না গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ?"

চাপকান ও রুদ্রাক্ষধারী পুরুষ বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া সম্প্রতি স্মৃতি অভ্যাস করিতেছিলাম; ইহাতেই দেখিতেছি, আমার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ উর্দ্দু ও শিক্ষা হইয়াছে। বোধ হয় এবার আমার খ্যাতি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আপনার এ বেশ কেন?"

গজপতি কহিলেন, "যবন-সংসর্গে যাবনিক বেশই ভাল ছিল। পাঠানেরা জাতি মারিয়া আমার বেশ বদলাইয়া প্রস্থান করিল। আরও অনেকে তাহাদের সংস্রবে গিয়াছিল, কাহারও জাতি গেল না; সকলেই দেশের মানুষ দেশেই রহিল। আমিও অধ্যাপক স্বামী ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিলাম। তিনি কহিলেন, 'এ বেশে তুমি আমার আশ্রমে আসিতে পাইবে না; বিশেষ তোমার জাতি নাই; তোমাকে আর সনাতন শাস্ত্রের পাঠ দিতে ইচ্ছা করি না।' তখন 'বালানাং রোদনং বলং' অর্থাৎ আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু 'অমৃতং বালভাষিতং,' সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি তিন দিন গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গাস্নান, মস্তকাদি মুণ্ডন এবং কেবল একবারমাত্র হবিষ্য ভোজন করিয়া আমার নিকটে আসিলে, আমি তোমাকে পাঠ দিব।' গুরু-আজ্ঞা পালন করিয়া এত দিনে আবার আশ্রমে ফিরিতেছি।"

জগৎ। কিন্তু এখনও আপনার এরূপ পরিচ্ছদের কারণ কি?

গজ। বস্ত্রাভাব। যবনেরা আমাদের বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া এই সকল বস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়াছিল। সম্প্রতি এইগুলির ব্যবহার ব্যতীত আমার আর উপায় নাই।

জগৎসিংহ অঙ্গরক্ষকের ভিতর হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিগ্‌গজের নিকট ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনি দুর্গে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আপনার সমস্ত কথা শুনিব।"

গজপতি টাকা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! আপনি কি এখন বীরেন্দ্রসিংহের স্থান পাইয়াছেন?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আপনি কি আমাকে জানেন না? পাঠান শিবিরে আপনার সহিত এক দিন পরিচয় হইয়াছিল। আপনি কি জানেন না, আমি স্বর্গীয় বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "বটে, বটে! তা পত্নী আর কন্যা, একই কথা। উভয়কেই তো রক্ষা করিতে হইবে। উপযুক্ত পাত্রের হস্তেই পত্নী কন্যা রক্ষার ভার দিয়া বীরেন্দ্রসিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।"

এ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণে সময় নষ্ট না করিয়া জগৎসিংহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর-মাত্র অগ্রসর হইলেই শৈলেশ্বর-মন্দির দেখা যায়। সেই পর্য্যন্ত গমন করাই জগৎসিংহের অভিপ্রায়। এই কাতর চিত্তের শান্তিকামনায় দেবাদিদেবের করুণা লাভ করিবার আশায় তাঁর চরণে ভক্তিসহ প্রণাম করিয়া দুর্গে প্রত্যাগমন করিবেন, ইহাই যুবরাজের অন্তরের বাসনা। আর অল্পমাত্র অগ্রসর হইলেই মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে। জগৎসিংহ দেবদর্শন ও দেবচরণে দুঃখ নিবেদনের নিমিত্ত চিত্তকে সংযত ও সমাহিত করিতে লাগিলেন।

সহসা দূরাগত বহুসংখ্যক অশ্ব-পদধ্বনি যুবরাজের চিত্তের শান্তি বিধ্বস্ত করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, দূরে মণ্ডলাকার মেঘমণ্ডলের ন্যায় ধূলিরাশি আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব-সমূহের পদধ্বনি নিকটস্থ হইতে লাগিল। তিনি আরও দেখিলেন, নিকটে স্বজাতি-সমাগম অনুভব করিয়া তাঁহার অশ্ব পুচ্ছ আন্দোলিত করিতেছে, কর্ণদ্বয় ঋজু করিয়াছে এবং এক প্রকার বিশেষ কণ্ঠশব্দ সহকারে স্বকীয় বিদ্যমানতা ব্যক্ত করিতেছে। অবিলম্বে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন, অদূরে বহু-সংখ্যক বীর তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

জগৎসিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শত্রু-সমাগম সম্ভাবিত নহে। পাঠানগণ যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছে। দেশমধ্যে বাদশাহ-পক্ষীয় সৈনিক ভিন্ন অন্য সৈনিক নাই। তাহারা গড়মান্দারণের শত্রু নহে। স্বয়ং মহারাজ মানসিংহ গড়মান্দারণের অধিকার বীরেন্দ্রসিংহের উত্তরাধি-কারীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তবে ইহারা কে? আগন্তুকগণ আরও নিকটস্থ হইল। তখন

জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন, তাহারা মহারাজ মানসিংহের অধীনস্থ সৈনিক। সহসা তাঁহার হৃৎকম্প হইল; চিত্ত নিতান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল।

সৈনিক নিকটস্থ হইল। তাহারা সংখ্যায় পঞ্চাশ জন; সকলেই অস্ত্রধারী, সকলেই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট-কলেবর। এক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে একটু অগ্রে অশ্বারোহণে আসিতেছিল। বোধ হয়, সেই ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেতা। আর একটু অগ্রসর হইলে সৈনিকেরা সেই নেতার আদেশক্রমে অশ্ববল্গা সংযত করিল; তার পর সকলে সমভাবে স্ব স্ব অসি বক্ষের উপর ধারণ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জয় বাদশাহ আকবরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বকীয় অসি সৈনিকগণের ন্যায় বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় বাদশাহ আকবরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!" তাহার পর সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এ কি মথুরাসিংহ! সংবাদ কি? শাহান-শাহের খবর ভাল ত? মহারাজ কুশলে আছেন?"

মথুরাসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং বলিল, "ভগবানের বাসনায় কোন দিকেই অমঙ্গলের সূচনা নাই।"

পশ্চাতে একজন সৈনিক মথুরাসিংহের অশ্ববল্গা ধারণ করিল। যুবরাজের নিকটস্থ হইয়া মথুরাসিংহ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তাহার পর স্বকীয় উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি পঞ্জা বাহির করিল। অতীব বিনীতভাবে সে সেই নিদর্শনখানি যুবরাজের হস্তে প্রদান করিল।

যুবরাজ পঞ্জাসহ সৈনিক-সমাগম দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার সুখের ও আনন্দের দিনের বুঝি এই স্থানেই শেষ। জিজ্ঞাসিলেন, "আমার প্রতি মহারাজের কি হুকুম?"

মথুরাসিংহ বলিল, "যুবরাজ! আমি আপনার অনুগত ব্যক্তি, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি এখানে যে অবস্থায় আছেন, সেখান হইতে সেই অবস্থায় আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"পাটনায়—মহারাজের নিকট।"

"যদি একটু বিলম্ব করিয়া, আজিকার দিনমাত্র এখানে থাকিয়া, যাইবার উপযোগী সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপত্তি আছে কি?"

মথুরাসিংহ করযোড়ে কহিল, "যুবরাজ, একটু বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করিলে আপনাকে বন্দীর ন্যায় ধরিয়া লইয়া যাইতে আমরা হুকুম পাইয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "এখানে আমার আত্মীয়-বৃন্দ আছেন। তাঁহাদের সহিত একবার শেষ দেখা করিয়া বিদায় লইবার সময়ও আমি পাইব না কি?"

মথুরাসিংহ পূর্ব্ববৎ করযোড়ে কহিল, "আমি দাস। দাসের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনাকে তিলার্দ্ধ সময় দিতেও আমার প্রতি আদেশ নাই।"

জগৎসিংহ বুঝিলেন, দ্বিরুক্তি বা প্রতিবাদের সময় নাই। ভাবিলেন, তাঁহার প্রতি রাজবিদ্রোহীর ন্যায় আদেশসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার অপরাধও যে রাজ-বিদ্রোহীর অনুরূপ হইয়াছে, সে বিষয়েও তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে [illegible] করে, এরূপ ব্যক্তি ভারতে কেহই নাই; আমি [illegible] তাঁহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবক। তথাপি মথুরাসিং[illegible] আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আমি স্বেচ্ছায় না যাই, তাহা হইলে আমাকে বন্দীর ন্যায় বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে, এ কথা তুমি বলিয়াছ। যদি আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করি, তাহা হইলে তোমার প্রতি কিরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।"

মথুরাসিংহ বলিল, "এ গোলামদিগের মুখে সে কথা ভাল শুনায় না। যুবরাজকে মৃত বা জীবিত যে কোন অবস্থায় হউক, মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, ইহাই আমাদের প্রতি আদেশ।"

সুতরাং জগৎসিংহের প্রতি চূড়ান্ত আদেশই প্রচারিত হইয়াছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সাধ্য ও সাহস নাই। মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়াই সম্ভব; কিন্তু সে বিচারে এখন কি প্রয়োজন? হয় তো ভগবদ্বাক্যের পরি-পালনে কালব্যাজ সম্ভব, কিন্তু মহারাজ মানসিংহের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপাল্য। জগৎসিংহ বলিলেন, "চল মথুরাসিংহ, আর অনর্থক বিলম্বে কি ফল? আমার সৈন্য ও অনুচরগণ জাহানাবাদে দারুকেশ্বর-তীরে পড়িয়া আছে। তাহার কি ব্যবস্থা হইবে?"

মথুরাসিংহ বলিল, "আমি তাহার উপায় করিতেছি।"

সৈনিকগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া মথুরাসিংহ যথোপযুক্ত আদেশ দিল। সে দল ছাড়িয়া গড়মান্দারণের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া যুবরাজ বলিলেন, "তুমি যদি গড়মান্দারণ হইয়া যাও, তাহা হইলে সেখানে যাহাকে হউক বলিবে, জগৎসিংহ পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদর্শনে পাটনা গিয়াছেন।" তাহার পর মথুরাসিংহকে বলিলেন, "তবে সৈন্যগণকে দুই ভাগ হইতে বল। আমাকে বোধ হয়, উভয় দলের মধ্যে যাইতে হইবে, আর তুমিও বোধ হয় আমার পার্শ্বে যাইবে।"

মথুরাসিংহ বলিল, "যুবরাজ, এ অধম মহারাজের দাস মাত্র। আদেশ পালন করাই আমাদের কার্য্য।"

তৎক্ষণাৎ মথুরাসিংহের আদেশমতে সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং এক ভাগ জগৎসিংহের অগ্রে ও অপর ভাগ পশ্চাতে গমন করিল। মথুরাসিংহ স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া জগৎসিংহের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

কোথায় তিলোত্তমা? গত কল্য সায়ংকালে তোমার হৃদয়দেবতা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এত শীঘ্রই যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহা কে জানিত? জগৎসিংহ, অচিরকালপূর্ব্বে বাতায়নমুখে সেই শিশিরসিক্ত কমলিনীর ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায়, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, রবিকরক্লিষ্ট কিশলয়ের ন্যায় সেই যে ম্লান বিশুষ্ক মুখখানি দর্শন করিয়াছ, সেই সাক্ষাৎই কি তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ? সেই বিগলিত-বেশা নবীনার বালারুণ-প্রদীপ্ত সেই শোভাসন্দর্শন, সেই রোদন, সেই বিদায়, সেই প্রণাম, হায়! তাহাই কি তোমাদের প্রেমলীলার শেষ অভিনয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাধ।

শশক বিপদে পড়িয়া যখন পলাইবার উপায় না দেখে, তখন চক্ষু মুদিত করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া থাকে। নয়ন মুদিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না; মনে করে, অপরেও তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না! কুমার জগৎসিংহ যখন বুঝিলেন, পিতা কখনই এ বিবাহে মত দিবেন না, সুতরাং পিতাকে জানাইয়া বিবাহ করিতে হইলে কখনই বিবাহ ঘটিবে না, অথচ এ বিবাহ না ঘটিলে তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন তিনি গোপনে পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। ভাবিলেন, এ বৃত্তান্ত তাঁহার পিতা কখনই জানিতে পারিবেন না; ক্ষুদ্র শশকের ন্যায় জগৎসিংহ চক্ষু বুজিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিয়া রাখিলেন, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে, বিশেষ সুযোগ পাইলে, তিনি সমস্ত ঘটনা পিতৃচরণে নিবেদন করিবেন। অপত্যস্নেহের প্রাবল্যে যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না বুঝিয়া, পুত্রের কাতর আবেদনে নিশ্চয়ই সদয় পিতা কর্ণপাত করিবেন এবং নিশ্চয়ই সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইবে।

জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলা, অভিরাম স্বামী, যিনি যাহাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন না কেন, কোন ব্যাপারই মহারাজ মানসিংহের অবিদিত রহিল না। যখন জগৎসিংহ গড়মান্দারণে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গমধ্যে পাঠানহস্তে বন্দী হইলেন, তখনই সে সংবাদ মানসিংহ জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রণয়লীলা, অসময়ে দুর্গস্বামীর বিনানুমতিতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ, নিতান্ত অসাবধানতা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্তই মহারাজ সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন। পুত্রের উপর তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিল না। মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ব হইতেই বীরেন্দ্রসিংহ ও তাঁহার আত্মীয়গণের বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই তিনি নিতান্ত হীন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত মৌখিক আত্মীয়তা রক্ষা করাও মানসিংহের অভিপ্রেত নহে; পুত্রবধূরূপে সেই ঘৃণিত পরিবারের কন্যা গ্রহণ করা কখনই মহারাজের অনুমোদিত হইতে পারে না।

বহু বীরের সমক্ষে জগৎসিংহ পিতার নিকট সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, পাঁচ সহস্র সেনা লইয়া তিনি পাঠানদিগকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিবেন। মানসিংহ পুত্রের এই স্পর্দ্ধা ও সাহস দেখিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাসনানুরূপ সৈন্যাদি প্রদান করিয়া পাঠানদিগকে দূর করিবার ভার দিয়াছিলেন। পুত্র সেই গুরুতর ভার স্কন্ধে লইয়া স্বচ্ছন্দে যুবতী অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং তস্করের ন্যায় পরকীয় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গস্বামীর দুহিতার সহিত প্রণয়লীলায় প্রমত্ত হইয়াছেন,

এ সকল সংবাদ তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। যখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের তনয়ার সহিত আমোদনিরত জগৎসিংহ পাঠান-হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তখন পুত্রের উপর ক্রোধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। এই জন্য তিনি পাঠান-কুলকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন না। তিনি তখন এরূপ অধম সন্তানের কল্যাণ-কামনা অবৈধ বলিয়া মনে করিলেন।

বিমলার অস্ত্রাঘাতে কতলু খাঁর মৃত্যু হইল। মরণকালে তিনি জগৎসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন। মুক্তির পর তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পাঠান-দিগের প্রার্থনামত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মানসিংহ জানিতেন, তাঁহাকে হয় তো অচিরকাল-মধ্যে দিল্লীযাত্রা করিতে হইবে এবং তাঁহার সহকারী সৈয়দ খাঁও বর্ষা শেষ না হইলে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, সুতরাং সংপ্রতি যুদ্ধবিগ্রহ রীতিমত চলিবার সম্ভাবনা নাই। নানারূপ বিবেচনা করিয়া তিনি আপাততঃ সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইলেন। বিপুল উপহারাদি লইয়া পাঠান মন্ত্রী খাজা ইষা ও নবীন নবাব সুলেমান খাঁ ও ওস্মান খাঁ মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। মানসিংহের আদেশে রাজপুতসেনাগণ পাটনা যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। জগৎসিংহের উপর মহারাজ বিশেষ কোন কর্ম্মের ভার প্রদান করিলেন না। তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করাই মহারাজের অভিপ্রায়।

জগৎসিংহ পিতার বিরাগভাব অনুমান করিতে পারিলেন না, এমন নহে; তথাপি তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া তাঁহার অশ্ব-বল্গা-সংলগ্ন ব্রাহ্মণ-লিখিত লিপির অনুরোধপালনে যাত্রা করিলেন। পিতার আদেশ না লইয়া, তাঁহার চরণে কোন সংবাদ নিবেদন না করিয়া, তিনি সেই যাত্রায় গড়মান্দারণে তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, আয়েষা ও তাঁহার অনুগত লোকেরা উপস্থিত হইলেন, উৎসব ও আনন্দ যথেষ্ট হইল। কিন্তু প্রধান কর্ত্তব্য-পালনে জগৎসিংহ উদাসীন হইলেন। মহারাজ মানসিংহকে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইল না, তাঁহার অনুমতি বা আশী-র্ব্বাদ গ্রহণের কোন উদ্যোগ করা হইল না। পিতার অজ্ঞাতসারে শুভকার্য্য শেষ করা হইল বটে, কিন্তু কোন সংবাদই মহারাজের অগোচর রহিল না। তাঁহার বিরক্তির পরিমাণ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তিনি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু পুত্রকে রাজকীয় কোন কার্য্যের মন্ত্রণায় আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার প্রতি কোন সামান্য কার্য্য-সম্পাদনেরও ভারপ্রদানে বিরত হইলেন; তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ মানসিংহ হৃদয়-চুল্লীতে পুত্রের সম্বন্ধে বিজাতীয় অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন। সেই অনল যে যথাকালে ক্ষুদ্র জগৎ-সিংহকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম, ইহা সেই প্রেমমুগ্ধ সৌন্দর্য্যসন্দর্শন-নিরত যুবরাজের মনে উদয় হইল না।

দারুকেশ্বরতীর হইতে মহারাজের শিবির উঠি[illegible] পাটনায় চলিল। কুমার জগৎসিংহ সে ব্যবস্থা জ্ঞা[illegible] না ছিলেন, এমত নহে; তথাপি তিনি যথাসম[illegible] উপস্থিত হইয়া পিতা বা সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইলেন না; রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী হইয়াও তিনি কোন কর্ম্মের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাদি দারুকেশ্বরতীরে পড়িয়া রহিল। জগৎসিংহ ও তাঁহার সৈন্যাদি ব্যতীত আর সকলেই পাটনায় গমন করিল। মহারাজ মান-সিংহের ক্রোধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। এরূপ অবাধ্য, রাজকর্ম্মে উদাসীন সৈনিক, পুত্র হইলেও নিশ্চয়ই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য বলিয়া তিনি অবধারণ করিলেন।

জগৎসিংহের চিত্ত পিতার বিরাগভয়ে একবারও অবসন্ন বা ব্যাকুল হয় নাই কি? একবারও হয় নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? বহু সময়েই জগৎসিংহ পিতার বিরক্তির ভাব অনুমান করিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। বহু সময়েই এই বিরক্তির পরিণাম তাঁহার পক্ষে ভয়াবহ বলিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। জগৎসিংহের অপরাধ নিশ্চয়ই গুরুতর হইয়াছে; কিন্তু এরূপ অবস্থায় পড়িলে কাহারও অপরাধ ইহার অপেক্ষা লঘু হইতে পারে কি? যখন শিবির উঠিয়া যায়, তখন সেই অরণ্যমধ্যে ভগ্ন অট্টালিকায় তিলোত্তমা যা দশাপন্না, তাহা ফেলিয়া, সেই প্রাণাধিকা সুন্দরীর পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কেহই সহজে অন্য কর্ত্তব্যের সেবায় নিশ্চিন্তচিত্ত হইতে পারে না। তাহার পর বিবাহ পিতার অনভিমতে,

বিশেষতঃ বীরেন্দ্রসিংহের বংশের সহিত বিবাহবন্ধন-বিষয়ে মহারাজ কখনই সম্মতি দিবেন না জানিয়া, গোপনে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করা নিতান্ত গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু যে সুন্দরীর জন্য হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছে, যাহাকে লাভ করিতে না পারিলে জীবন-ধারণের প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে, যাহার চিন্তা ব্যতীত কার্য্যান্তরের ধারণা করিতে চিত্ত ভুলিয়া গিয়াছে, সেই ভালবাসার সামগ্রী লাভ করিবার উৎসাহে প্রাণ যখন প্রমত্ত, তখন যে পথে চলিলে বাসনাসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, কে ইচ্ছায় সে পথ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিরোধ পথে গমন করিতে না চাহে ?

প্রত্যুত জগৎসিংহ এক দিনও সুন্দরী সন্দর্শন-বাসনায় আপনার কার্য্য-প্রণালী পরিচালিত করেন নাই। দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আক্রান্ত হইয়া আশ্রয়লাভ বাসনায় সন্নিহিত শৈলেশ্বর-মন্দিরে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় যে তৎকালে তাঁহার ভবিষ্যৎ মনোমোহিনী অবস্থিতি করিতেছেন, এ কথা তিনি জানিতেন না। তাহার পর দর্শন এবং দর্শনমাত্র মত্ততা। জগৎসিংহ সে মত্ততা পরিহার করিবার নিমিত্ত নানা প্রযত্ন পাইয়াছেন, সে চিন্তা—সে কল্পনা তিনি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। কে কবে এরূপ ঘটনার পর হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ সহজে হাসিয়া উড়াইতে পারিয়াছে এবং চিত্তক্ষেত্র হইতে সে প্রবল আকর্ষণের সমস্ত রেখা মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে ? তাহার পর জগৎসিংহ সেই মনোমোহিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া পক্ষান্তে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরায় উপনীত হইয়াছেন। পরিচয় শুনিয়া তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়া গিয়াছে। তিনি তখনই বুঝিয়াছেন যে সুন্দরীর সঙ্গলাভ তাঁহার অদৃষ্টে কখনই ঘটিবে না। বীরেন্দ্রসিংহের তনয়ার সহিত মানসিংহ-নন্দনের বিবাহ অসম্ভব। এই স্থলে জগৎসিংহের একটা বিষম ভ্রম হইল তিনি একবার—জীবনের মত শেষ একবারমাত্র সেই সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। ইহা তাঁহার অনভিজ্ঞতাজনিত ভয়ানক ভ্রম। এরূপ সাক্ষাতে প্রণয় যে শতগুণে বাড়িয়া উঠে, হতাশ প্রেমিকেরা ইহা বুঝিতে পারে না। অদর্শনে কালক্রমে প্রণয়-লালসা মন্দীভূত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দর্শনরূপ ইন্ধনসংযোগে প্রেমানল সতেজ হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহা না বুঝিয়াই অনভিজ্ঞ প্রেমিক একবার শেষ দর্শনের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়। এই শেষ দর্শনই অনেক স্থলে সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইয়া থাকে। জগৎসিংহের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল।

জগৎসিংহ আহূত হইয়া বিমলার সহিত গড়-মান্দারণ গিয়াছিলেন। দুর্গস্বামীর বিনানুমতিতে দুর্গে প্রবেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। বিমলা তাঁহার কানে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তিনি দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তবে কথা প্রসঙ্গে এই সময়ে বিমলা যে দুই একটি বাক্যের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া জগৎসিংহের ক্রোধ বা চিত্তবিকার হওয়া উচিত ছিল। বিমলাকে তিনি সুচরিত্রা নামে সম্বোধন করিলে, বিমলা বাধা দিয়া আপনাকে কুচরিত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক কুচরিত্রা বলিলে বড় ঘৃণিত অর্থই ব্যক্ত হয়। যখন দুর্গপ্রবেশের গুপ্তদ্বারের কথা উঠে, তখন বিমলা বলিয়াছিলেন, যেখানে চোর, সেখানেই সিঁধ। এ কথায় রাজপুত্রের বিরাগ হওয়া উচিত ছিল ; কেন না, 'চোর ও সিঁধ' কথায় গুপ্তপ্রণয়ের গুপ্ত উপায়ই সূচিত হইয়া থাকে। কুলনারীর পক্ষে এরূপ উক্তিসমূহ উচিত নহে বলিয়া রাজপুত্রের মনে হইলেই ভাল হইত। তিনি এ সকল বাক্য রহস্য-প্রবণা বিমলার সরল উক্তি বোধে মনের মধ্যে স্থান দেন নাই। বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শেষ সাক্ষাৎ ঘটিল। এরূপ শেষ দর্শনে যাহা হইয়া থাকে, এ স্থলে তাহাই হইল। উভয়েই উভয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অচ্ছেদ্য প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই তো তাঁহার প্রণয়-ব্যাপারের ইতিহাস। জগৎসিংহ বীর সৈনিকপুরুষ ও সম্রাট-কর্ম্মচারী ; সুতরাং অসময়ে তাঁহার এরূপ প্রণয়রঙ্গে প্রমত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু ঘটনা সকলই তাঁহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রণয়-রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনেতৃরূপে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত তিনি প্রার্থী ছিলেন না ; ঘটনাপুঞ্জ তাঁহাকে অসম্ভাবিত উপায়ে সেই মঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছিল। সেই মদিরার মোহন আবেশ একবার আক্রমণ করিলে কোন্ বীর তাহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন ?

মানসিংহ এত কথা জানিতেন কি ? বোধ হয়, কোন ব্যাপারই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না ; তথাপি তিনি পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অগ্রে প্রভুর কার্য্যসাধন, তাহার পর তিনি স্বকীয় সুখ, আমোদ বা স্বার্থের চিন্তা—এইরূপই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যসেবক অম্বরেশ্বর এইরূপ মনে করিয়াই জগৎসিংহের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ নানাপ্রকারে সেই বিরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এ কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

তাহার পর প্রভুর বিনানুমতিতে প্রায় মাসাবধিকাল শিবিরে সুদূরে অবস্থান জগৎসিংহের পক্ষে মানসিংহের চক্ষুতে ক্ষমার অতীত অপরাধ বলিয়া অবধারিত হইল। বিরাগের চরম সীমায় উপনীত মহারাজ মানসিংহ এই অপরাধীকে সজীব অবস্থায় এবং তাহা অসম্ভব হইলে মৃতাবস্থায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। পার্শ্বচর পদস্থ ব্যক্তিগণ মহারাজের ক্রোধের অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

জগৎসিংহ শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির-সন্নিকটে বন্দী হইলেন। যে স্থানে তাঁহার প্রণয়াভিনয়ের আরম্ভ, সেই স্থানেই তাহার যবনিকাপাত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেমের পুরস্কার

পাটনা নগরে মহারাজ মানসিংহ বাহাদুরের দরবার-গৃহে অদ্য ভয়ানক জনতা। অদ্য যথাসময়ে তথায় এক কল্পনাতীত কাণ্ডের অভিনয় হইবে। অচিরকালমধ্যে তথায় এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন রাজকর্ম্মচারীর অপরাধের বিচার হইবে। অস্ত্রধারী রক্ষিগণ চারিদিকে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ইচ্ছা করিলে এই বিচার-সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র সৈনিকপুরুষ সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। নগরবাসী ভদ্রাভদ্র জনসমূহেরও অদ্য এই সভায় দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবার নিষেধ ছিল না; সুতরাং বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই জনসমাগমে সেই বিশাল দরবারগৃহের সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

যথাসময়ে নাগরা বাদিত হইল, বাদ্যধ্বনি ক্ষান্ত হইবামাত্র স্তুতিগায়কেরা মঙ্গল-গান সমাপন করিল। তাহার পর নকিব ফুকরাইয়া উঠিল। সমাগত দর্শকেরা উদ্গ্রীব হইয়া মহারাজের আগমনপথ চাহিয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ অম্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহ ধীর ও গম্ভীর পাদবিক্ষেপে স্বতন্ত্র দ্বার দিয়া সেই সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচর সেনাপতিগণ, সভাসদ্ ও পারিষদ্‌গণ তাঁহার অনুসরণক্রমে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদন উৎকণ্ঠায় সমাচ্ছন্ন, সকলেই যেন অদ্য না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইবে ভাবিয়া ভয়াকুল। মহারাজ মানসিংহ সমুচ্চ মঞ্চোপরি স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলেন; সেনাপতিগণ, সভাসদ্‌গণ ও পারিষদ্‌গণ তাঁহার উভয় পার্শ্বেই অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। সমাগত লোকেরা সভয়ে দেখিল, মহারাজের বদনে স্থিরতা ও ধীরতাব্যঞ্জক লক্ষণ প্রকটিত।

জনসমাগমে সভার সকল স্থান পরিপূর্ণ হইলেও তথায় অসাধারণ শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে বাক্য নাই, সন্নিহিত ব্যক্তির সহিত একটা কথা কহিতেও কাহারও প্রবৃত্তি নাই, সকলের নিশ্বাস ফেলিতেও সাহস নাই সকলেই চিন্তাকুল, সকলেই ম্রিয়মাণ।

মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া অকম্পিত গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন, "বন্দীকে আনয়ন কর।"

সভার ভাবতেই বিচলিত হইয়া উঠিল। সকলেরই বিষন্ন মুখ আর একটু কালিমাগ্রস্ত হইল; সকলেই উৎসুকভাবে প্রবেশদ্বারের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পরিমিত পদ-সঞ্চালন করিতে করিতে প্রহরিপরিবেষ্টিত বন্দী অবনতমস্তকে সেই সভাভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাবৎ লোক করুণ নয়নে সেই বন্দীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই বন্দী কুমার জগৎসিংহ।

বন্দী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"বন্দী জগৎসিংহ! তুমি বহুবিধ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ! তোমার অপরাধ আমি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। কতকগুলি অপরাধ পারিবারিক, আর কতকগুলি রাজকীয়। অদ্য তোমার সেই সমুদায় অপরাধের যথাবিহিত বিচার করিয়া তোমার উপর সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। তোমার রাজকীয় অপরাধসমূহ নিতান্ত গুরুতর হইলেও, বিচারকার্য্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, অগ্রে তোমার পারিবারিক অপরাধসমূহের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।"

অবনতমস্তক জগৎসিংহ আরও অবনত হইলেন।

এক জন প্রাচীন মোগল পারিষদ্ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মহারাজকে বিহিত বিনয় সহকারে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "অধীনের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, পারিবারিক অপরাধের আলোচনা সকলের শুনিবার প্রয়োজন কি? আমরা সকলে কেন এ সময়ে স্থানান্তরে যাই না?"

মানসিংহ বলিলেন, "না—কাহারও এ স্থান ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বন্দীর পারিবারিক অপরাধের সহিত তাহার রাজকীয় অপরাধের বিশেষ সংস্রব আছে এবং একের বিচারের উপর অন্যের বিচার নির্ভর করিতেছে।"

মোগল পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকিয়া মহারাজের আদেশ শুনিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "শুন বন্দী! অতঃপর তোমাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি তাহার সত্য উত্তর প্রদান না করিলে তোমার অপরাধ আরও গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

জগৎসিংহ সগর্ব্বে উত্তর দিলেন, "এ শাসন নিতান্ত অনাবশ্যক। জগৎসিংহ মিথ্যা কহিতে জানে না—প্রাণের ভয়েও সে মিথ্যা কহিতে অশক্ত।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি পাঠানগণ কর্ত্তৃক বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরমধ্যে রমণীগণের সহিত এক কক্ষে ধৃত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি পাঠানগণের হস্তে অবরোধকালে নবাব কতলু খাঁর পালিতা কন্যা আয়েষার হৃদয়ে প্রেমলালসা উত্তেজিত করিয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "মহারাজ! এ প্রশ্নের উত্তর একটু দীর্ঘ হইবে—ক্ষমা করিবেন। নবাব-পুত্রী আয়েষা আমার পরমহিতৈষিণী। এ অভাগা যে শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও অদ্য আপনার ন্যায়-বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছে, সে কেবল সেই নবাব-পুত্রী আয়েষার গুণে। আমি যখন অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর ও জ্বরবিকারে অজ্ঞান, তখন নবাব-নন্দিনী আয়েষা, মাতার ন্যায়, ভগ্নীর ন্যায় ও সখীর ন্যায় যত্নে অবিরত পরিচর্য্যা করিয়া, আমার আরোগ্য-সাধন করিয়াছেন। সেই দেবীকে আমি ভক্তি করি, অন্তরের সহিত তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে অকপট আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি। তাঁহার ন্যায় দেববালার প্রতি প্রেমের চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিতেও কখন এ অধম জনের সাহসে কুলায় না। তাঁহাকে পূজার পাত্রী ভিন্ন অন্য কোন ভাবে চিন্তা করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, একটা অসম্ভাবিত ঘটনায় আমি সহসা জানিতে পারিয়াছি, সেই গুণবতী নবাব-নন্দিনী এই অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি প্রেমাসক্ত। সেই সদয়হৃদয়া নবাব-তনয়ার হৃদয় না জানি কি অসীম যাতনার আবাসস্থল হইয়াছে মনে করিয়া, আমি অসীম কষ্ট ভোগ করিতেছি। তাঁহাকে প্রণয়োন্মত্ত করা দূরে থাকুক, যদি আমি তাঁহার অসীম প্রণয়ের একটুও প্রতিদান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সুখ, আনন্দ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উত্তেজনা করা দূরে থাকুক, যদি তাঁহার হৃদয় হইতে প্রেমাকর্ষণের চিহ্নমাত্র প্রক্ষালিত করিবার নিমিত্ত আমাকে অসাধ্যসাধনও করিতে হয়, আমি তাহাতেও কদাপি পশ্চাৎপদ হইতাম না।'

মানসিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, "বর্ত্তমান পাঠান নবাব ওস্মান খাঁর সহিত তোমার কোন দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "হাঁ মহারাজ! আয়েষার প্রণয়ই তাহার কারণ। নবাব বলেন, 'এ সংসারে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হইতে পারে না, অতএব যুদ্ধে হয় তুমি মর, না হয় আমি মরি।' আমি তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বলি, আমি আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নহি; সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন, 'তুমি না হইলেও আয়েষা তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, অতএব তুমি বধ্য।' এ সকল কথা নবাব কখনই অস্বীকার করিবেন না। তিনি আমাকে পদাঘাত না করিলে আমি কখনই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম না।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নবাবপুত্রীকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া থাক কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "পুনঃ পুনঃ লিখি না, একবার লিখিয়াছিলাম।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি অকারণে আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "গিয়াছিলাম। এ দেশ হইতে বিদায়কালে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের প্রার্থী হইয়াছিলাম।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কখন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "একবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

মানসিংহ বলিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইলে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে বলিয়া আয়েষা তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "ঐরূপ একটা কারণেই তিনি আমার সহিত সাক্ষাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে।"

মানসিংহ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এখনও বলিতে চাহ, তুমি নবাব-পুত্রীর প্রতি আসক্ত নহ? তুমি কখন তাঁহাকে প্রেমের উৎসাহ দেও নাই? তিনিই তোমার প্রতি অনুরাগিণী?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "হাঁ মহারাজ! ঐ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। বিশ্বাস করা না করা মহারাজের ইচ্ছাধীন।"

মানসিংহ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্র-সিংহের তনয়া তোমার উপপত্নী কি না?"

জগৎসিংহ বিচলিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার শরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। স্থির স্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি ভূপাল, শাসন-পালনের কর্ত্তা, প্রভু এবং আমার পিতা; সুতরাং প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সমুচিত উত্তর দিতে আমি অশক্ত। কিন্তু অন্য কেহ ভ্রমে বা পরিহাসেও এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি এতক্ষণ তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। বীরেন্দ্র-সিংহের কন্যা আমার সহধর্ম্মিণী—পবিত্র মন্ত্রানুষ্ঠান সহকারে পরিগৃহীতা ধর্ম্মপত্নী।"

মানসিংহ ভয়ানক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "নরাধম, রাজপুত-কুল-কলঙ্ক ঘৃণিত কীট! এই পাপকথা আমার সমক্ষে স্বীকার করিতে তোর রসনা খসিয়া পড়িল না, ক্ষোভে লজ্জায় তোর প্রাণ আলোড়িত হইল না? বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তোর ধর্ম্মপত্নী! যে বীরেন্দ্র বারিবাহকরূপে আমার পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এক পরিচারিকার সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, যে বীরেন্দ্র আমার তাড়নায় এক ব্যভিচারিণী শূদ্রীর বিমলা-নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা তোর শ্বশুর; আর সেই শূদ্রীতনয়া বিমলা তোর ধর্ম্মপত্নীর বিমাতা। কাহার কথা বলিব? তোর এই ধর্ম্মপত্নী এক জারজা নারীর গর্ভসম্ভবা। আর সেই পরম সন্ন্যাসী,—যিনি শশিশেখররূপে সংসারে অশেষ অনর্থ উৎপাদন করিয়া এখন অভিরাম সাজিয়াছেন, তিনি তোমার ধর্ম্মপত্নীর মাতামহ। তিনি প্রবাসগত—প্রতিবাসিপত্নীর গর্ভোৎপাদন করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন; কাশীতে বহু শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়াও তিনি সাহায্যকারিণী শূদ্রকন্যার ধর্ম্মনাশ করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ এক্ষণে পরম জ্ঞানী! ধিক্ তোর বিবেচনায়! তুই এই সকল হীন ও জঘন্য লোককে আত্মীয়-জ্ঞান করিয়া এক সামান্য জমীদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্। তুই তাহাকে উপপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলে হয় তো তোর অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতাম। পিতার অমতে, পিতার আশীর্ব্বাদ বা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, যে পুত্র এরূপ নিকৃষ্ট বংশের সহিত কুটুম্বিতার বন্ধন সংঘটিত করিতে পারে, সে পিতার পরিত্যজ্য। আজি হইতে জগৎসিংহ আমার পুত্র নহে। তুই কোন স্থানে আপনাকে মানসিংহের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিলে, নিশ্চয়ই তোর জীবনদণ্ড হইবে।"

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্ অবস্থায় সভয়ে মহা-রাজের এই আদেশ শ্রবণ করিল। মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "অতঃপর তোর রাজকীয় অপরাধের কথা। তুই বাদশাহের এক জন চিহ্নিত কর্ম্মচারী ও ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি হইয়াও অনায়াসে তস্করের ন্যায় নিশাকালে দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতসারে অপরের দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলি।"

জগৎসিংহ নিরুত্তর—অধোমুখ; মানসিংহ বলিলেন, "পঞ্চসহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া এবং পাঠান-গণকে দূর করিবার ভার লইয়া, তুই কেন সে কার্য্যে অবহেলা করিয়া স্বীয় সুখের চেষ্টায় নারী-লাভের প্রত্যাশায় ফিরিয়াছিলি?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, "পাঠানদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর তুই কেন আপনার সৈন্য-সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিস্ নাই?"

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার বলিলেন, "সৈন্য ও সেনাপতিগণ যখন শিবির

তুলিয়া যাত্রা করিয়াছেন, তুই কেন আমার আদেশানুসারে সে সময়েও সে সঙ্গে মিলিত হইস্ নাই ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার বলিলেন “কোনরূপ বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং বাদশাহের কোন কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া তুই স্বাধীনভাবে কেন কালপাত করিতেছিলি ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ বলিলেন, “বল্ দুরাত্মা, এরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে কোন্ শাস্তি বিহিত ? প্রাণদণ্ড তোর উপযুক্ত শাস্তি।”

সেই মোগল পারিষদ আবার দণ্ডায়মান হইয়া অতীব বিনয় সহকারে মহারাজকে সেলাম করিয়া বলিলেন, “হুজুর অভয় দেন, একটা নিবেদন করি—যুবরাজ আপনার পুত্র—”

মানসিংহ বজ্র-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, “কে বলে ঐ হতভাগা কুক্কুর আমার পুত্র ? আমার পুত্র হইলে কখন এমন রাজদ্রোহী, প্রভু-অবমাননাকারী, কর্ত্তব্যে অনাসক্ত হইত না। পুত্রত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমি অগ্রে পারিবারিক অপরাধের বিচার করিয়াছি ; সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ হতভাগ্যের সহিত পুত্রত্বের শেষ হইয়াছে।”

মোগল বলিলেন, “ভাল, আপনি ধর্ম্মাবতার, ভাবিয়া দেখুন, যুবরাজ নিতান্ত তরুণ-বয়স্ক।”

মহারাজ কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “শোন্ দুরাত্মন্, প্রাণদণ্ড ব্যতীত তোর অপরাধের সমুচিত শাস্তি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি তোর তরুণ বয়সের অনুরোধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডমাত্র অন্য ব্যবস্থা করা হইল। রক্ষিগণ, এই হতভাগ্যের বেশভূষা খুলিয়া লও, ইহাকে আমার সম্মুখে ও এই সভার সমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, তাহার পর এই নরাধমকে সর্ব্বসমক্ষে কারাবাসে লইয়া যাও।”

আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। জগৎসিংহ ঘৃণিত বন্দীর বেশ ধারণ করিলেন। লৌহ-শৃঙ্খলে তাঁহার হস্তপদ নিবদ্ধ হইল। চারিদিকে অস্ফুট হাহাকার ও দীর্ঘনিশ্বাস-শব্দ উঠিল ; সেনাপতিগণ অধোমুখ হইলেন, বৃদ্ধগণের চক্ষুতে জল আসিল। রক্ষিগণ বন্দী সহ প্রস্থান করিল। সভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বার্ত্তাবহ

যে সৈনিক দারুকেশ্বর-তীরে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মথুরাসিংহের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া একাকী গড়মান্দারণ অভিমুখে অশ্ব চালিত করিয়াছিল, সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর সম্মুখে বিকটবেশধর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে দেখিতে পাইল। গজপতি কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে অশ্বারোহী জগৎসিংহের সহিত আলাপ করিয়া একটি রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিয়াছিলেন। পুনরায় অন্য এক অশ্বারোহী বীর দেখিয়া তাঁহার সহজেই মনে হইল, অদ্য তাঁহার সুপ্রভাত ; এ ব্যক্তির সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিলে নিশ্চয়ই কিছু লাভ হইবে। তিনি অশ্বারোহীর অভিমুখে ফিরিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “আল্লা মহাদেব হুজুরের ভবিষ্যৎ ঠিক রাখুন।”

অশ্বারোহী সৈনিক এই আশ্চর্য্য-বেশধর ব্যক্তির মুখে আশ্চর্য্য ভাষায় আশ্চর্য্য আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সে এই ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে অশ্বকে ধীরে চালাইল ; দিগ্‌গজ পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনারা কি জাতি ?”

দিগ্‌গজ চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর দিলেন, “স্বামীজীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এ কথার যথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না।”

অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি কথা ? জাতির কথা আর এক জনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেন বলিতে পারিবেন না ?”

দিগ্‌গজ বলিলেন, “আমি ঠিকই আছি বটে, কিন্তু আমার জাতির কথাটা এখনও ঠিক হয় নাই।”

সৈনিক মনে করিল, লোকটা পাগল, ইহার সহিত কথায় সময় কাটিবে মন্দ নয়। বলিল, “বড় আশ্চর্য্য কথা। কিসে কি হইল ?”

দিগ্‌গজ বলিলেন, “আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ ছিলাম, তাহার পর শুনিতেছি, আমি মুসলমান হইয়াছিলাম। তাহার পর হিন্দু হইবার জন্য যাহা করিতে হয়, সব করিয়াছি। এখন জাতি-সম্বন্ধে আমাকে কি বলিতে হইবে, তাহা স্বামীজী ঠিক করিয়া না দিলে বলিতে পারিব না।”

সৈনিক কথাটা বুঝিতে পারিল—জিজ্ঞাসিল, “স্বামীজী কে ?”

“আমার অধ্যাপক।”

সৈনিক আবার বিস্ময়সহ জিজ্ঞাসিল, "আপনার অধ্যাপক! বয়স তো আপনার কম বুঝিতেছি না। এখনও কি আপনি ছাত্র?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "বয়স আমার অতি অল্প। আশ্‌মানী বলিয়াছে, আমি এখনও বালক। সে কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে।"

সৈনিক আবার জিজ্ঞাসিল, "আশ্‌মানী কে?"

দিগ্‌গজ একটু চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "জানি না কে?"

"আশ্‌মানী স্ত্রীলোক, না পুরুষ?"

দিগ্‌গজ আবার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় স্ত্রীলোক।"

সৈনিক বুঝিল, লোকটার বুদ্ধি কিছু কম। এরূপ লোক পাইলে সকলেরই রহস্য করিতে ইচ্ছা হয়। সে আবার জিজ্ঞাসিল, "কিসে আপনি স্থির করিলেন, আশ্‌মানী স্ত্রীলোক?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "সে মেয়েমানুষের মত কাপড় পরে, মাথায় খোঁপা বাঁধে, গায়ে গহনাও পরে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া আমি ঠিক করিয়াছি, সে স্ত্রীলোক।"

সৈনিক জিজ্ঞাসিল, "তাহার মুখে দাড়ি-গোঁফ আছে কি?"

"না।"

"ইহাতেও বুঝা যায়, আশ্‌মানী স্ত্রীলোক।"

দিগ্‌গজ একটু ভাবিয়া বলিল, "তা ঠিক বুঝা যায় না। বাঙ্গালা দেশের অধ্যাপকমাত্রের দাড়ি-গোঁফ নাই। এই উড়ের দেশের পুরুষের দাড়ি-গোঁফ তো নাই, বাড়ার ভাগ মাথায় খোঁপা বাঁধার মত মস্ত চুল।"

"আপনি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, আশ্‌মানী কোন অধ্যাপক নহেন তো?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "মহাশয়, কথাটা বলিয়াছেন মন্দ নয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত আশ্‌মানীর চেহারা কতকটা মিলে। তা ছাড়া আশ্‌মানীর ব্যবহারাদি অধ্যাপকের মত।"

সৈনিক কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসিল, "কিরূপ?"

"তিনি আমাকে সর্ব্বদা তাড়না করেন, আবার বড় ভালবাসেন। আমি কি করিব না করিব, তাহার ব্যবস্থা তিনিই দেন। আমাকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লন। আমার সহিত সুখ-দুঃখের অনেক কথা কহেন।"

"আপনাকে পাঠ বলিয়া দেন না?"

"না। সে বোধ হয় আমারই দোষ! আমি তাঁহাকে দেখিলেই সব ভুলিয়া যাই, পড়া-শুনার কথা মনে পড়ে না। পাঠ চাহিবার সময় পাই না।"

সৈনিক বলিল, "আমি বুঝিয়াছি, আশ্‌মানী স্ত্রীলোক। আপনি আমার সহিত এতক্ষণ রহস্য করিতেছিলেন। এই আশ্‌মানী আপনার প্রণয়িনী।"

দিগ্‌গজ লাফাইয়া উঠিলেন। এত জোরে, এত ঊর্দ্ধে তিনি উঠিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার গলার রুদ্রাক্ষমালা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি তাহা কুড়াইয়া না লইয়াই সৈনিকের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "বলেন কি? আমি ঐ কথাই মনে করি; কিন্তু অন্য লোকেও কি মনে করে যে, তিনি আমার ভালবাসার মেয়েমানুষ?"

সৈনিক একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই লোকে ঐরূপ মনে করে। তাহা না হইলে আমি একটু কথা শুনিবামাত্র বুঝিলাম কেন যে, তিনি আপনার প্রণয়িনী?"

দিগ্‌গজ ব্যস্ততা সহ মালা তুলিয়া আনিয়া সৈনিকের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি দৈবজ্ঞ? আপনি এ কথা ঠিক বলিতেছেন তো? আমি এবার দুর্গে গিয়া অনায়াসে তাঁহাকে প্রণয়িনী বলিয়া ডাকিতে পারিব তো?"

সৈনিক বলিল, "আমি ঠিক বলিতেছি, তিনি আপনার প্রণয়িনী। আপনি স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া আদর করিবেন। আমি অনেক দিন গুরুর নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছি। আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার এক মনোমোহিনী আছেন। তাঁহার নামের প্রথম অক্ষর 'আ' আর শেষ অক্ষর এতক্ষণ ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু আপনি এক্ষণে কাছে আসায় আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আপনার প্রণয়িনীর নামের শেষ অক্ষর 'নী'।"

দিগ্‌গজ পরমানন্দে কহিলেন, "এতদিনে ভগবান্ আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আপনার ন্যায় দৈবজ্ঞ মহাশয়ের মুখে শুনিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, আশ্‌মানী আমার প্রণয়িনী সন্দেহ নাই। আচ্ছা, আপনি একটু ভাল করিয়া আমার কপালের পানে চাহিয়া দেখুন দেখি, যেখানে আমার প্রণয়িনীর নামের অক্ষর লেখা আছে, তাহার এ দিকে ওদিকে আর কোন অক্ষর আছে কিনা—দেখুন দেখি ভাল করিয়া।"

গজপতি কপালটা একবার ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল। সৈনিক বলিল, "আছে; কিন্তু "আ" আর "নী" যেমন স্পষ্ট, তেমনি আর কিছুই নহে, সেগুলা গায়ে পড়া।"

গজপতি বলিলেন, "আপনি আমার বিশেষ উপকার করিলেন। আপনি কোথায় চলিয়াছেন?"

"আপাততঃ আমি গড়মান্দারণে যাইব। তাহার পর অন্য দিকে যাইবার প্রয়োজন আছে।"

"গড়মান্দারণ তো আসিয়াছেন। এই বাগানের ও-পারেই গড়। এখানে কাহার খোঁজে দরকার?"

সৈনিক বলিল, "দরকার বিশেষ কিছু নয়; কেবল দুর্গে একটা খবর দেওয়া মাত্র।"

গজপতি বলিলেন, "তা আসুন আমার সঙ্গে। আমি প্রথমেই দুর্গে যাইব। সেখানেই আমার আশ্‌মানী থাকেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া কোথাও যাইব না।"

সৈনিক বলিল, "দুর্গের সকলের সঙ্গেই কি আপনার আলাপ আছে?"

গজপতি সগর্ব্বে বলিলেন, "বিশেষ। দুর্গের যিনি এখন কর্ত্তা, তিনি আমার অধ্যাপক অভিরাম স্বামী; দুর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বময়ী, তিনি আমার ঘৃতভাণ্ডার; আর দুর্গে যাঁহার তুলনা নাই, তিনি আমার গোড়ায় 'আ' শেষে 'নী'।

সৈনিক বলিল, "তাহা হইলে আপনি একটা সামান্য সংবাদ দয়া করিয়া দুর্গে জানাইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে। আপনার গোড়ায় 'আ' আর শেষে 'নী'র দ্বারা সংবাদ পাঠাইলে চলিবে।"

গজপতি বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে। আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। আপনি যখন বলিয়া দিয়াছেন, আশ্‌মানী আমার প্রণয়িনী, তখন হইতে আমার সাহস ভরসা কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কি, বলিব? আমি এখনই গিয়া খবর দিব। কথাটা কি আপনি বলুন।"

সৈনিক বলিল, "আপনি দয়া করিয়া বলিবেন যে, কুমার জগৎসিংহ বন্দী হইয়াছেন।"

গজপতি কাঁপিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "কেন বন্দী হইলেন? কে বন্দী করিল?"

সৈনিক বলিল, "কেন বন্দী হইলেন, তাহা আমরা জানি না। মহারাজ মানসিংহ বাহাদুরের আজ্ঞায় আমরাই বন্দী করিয়াছি।"

দিগ্‌গজ একটু চিন্তা করিল। ভাবিল, যুবরাজ যখন বন্দী হইয়াছেন, তখন আর সকলেরও যে সে দশা হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? বীরেন্দ্রসিংহ যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনও ক্রমে দুর্গের সমস্ত লোক বন্দী হইয়াছিল। বৃথা গঙ্গাস্নান, গঙ্গাতীরে বাস, তীর্থদর্শন করিয়া আসিলাম। আবার হয় তো মুসলমান হইতে হইবে। যাহারা যুবরাজকে বন্দী করিয়াছে, এই ব্যক্তিও তাহাদের এক জন। এ অগ্রে আসিয়াছে; আর সকলে পরে আসিতেছে। এক্ষণে ইহার সঙ্গ ছাড়িয়া পলায়ন করাই সৎপরামর্শ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার সংবাদ আমি দুর্গে জানাইব। আপনি এখন যেখানে যে কার্য্যে যাইতেছেন, সেখানে যাইতে পারেন।"

দিগ্‌গজ ক্রমেই সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। সৈনিক তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। কিয়দ্দূর সরিয়া যাওয়ার পর দিগ্‌গজ দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক একবার পশ্চাতে চাহেন, আবার দৌড়ান। পদচালনায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা আছে। আর এক দিন বিমলার সহিত রাত্রিকালে আসিতে আসিতে ভূতের ভয়ে গজপতি এইরূপে পলাতক হইয়াছিলেন।

সৈনিক এ বিষয়ে লক্ষ্য করিল না। যাহার যখন পড়্‌তা মন্দ হয়, তখন সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। জগৎসিংহ বন্দী, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞাপালন না করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, এ কথা সৈনিক বুঝিত। সুতরাং তাঁহার খবর বলিবার জন্য দুর্গে যাইয়া সময় নষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। আর এরূপ অবস্থায় যুবরাজের সংবাদ গড়মান্দারণে দেওয়া উচিত কি না, তাহাও সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। হয় তো এই সংবাদ বহন করিয়া আনার জন্য মহারাজের বিচারে সে অপরাধী ও দণ্ডার্হ হইতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া সে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সংবাদ দিতে যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিল না। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে সংবাদ-বাহক করিয়া ও দুর্গস্থ লোকদিগকে জানাইতে বলিয়া সে ধর্ম্মের দ্বারে খালাস হইল।

গড়ের সীমার পথ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এক পথ গড়ের মধ্যে গিয়াছে, আর একটি শৈলেশ্বর-মন্দিরের দিকে গিয়াছে, আর একটি বর্দ্ধমানের দিকে এবং চতুর্থটি পুরীর অভিমুখে গিয়াছে। সৈনিকপুরুষ গড়ের ভিতরে যে পথ গিয়াছে, সে দিকে অগ্রসর না হইয়া, যে পথ পুরীর অভিমুখে

গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিল। তাহার অশ্ব কশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া বেগে ধাবিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রেমের মদিরা

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে দুর্গে আসিয়া উপনীত হইল এবং আর কোন দিকে না গিয়া আশমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরদ্বারে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সাহস ও অধিকার থাকিলে সে হয় তো তাহাও করিত। সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদে ও নিতান্ত ব্যস্তভাবে সহসা তাহাকে এই স্থানে সমাগত দেখিয়া দ্বার-রক্ষক নিতান্ত বিরক্ত হইল এবং তাহাকে সে স্থান হইতে দূর হইয়া যাইতে বলিল।

দিগ্‌গজ বলিলেন, "ভাই, রাগ করিতেছ কেন? আমার নিকট অতি নিগূঢ় সংবাদ আছে। সেই সংবাদ এখনই জানান আবশ্যক।"

দ্বারপাল বলিল, "জরুরী খবর থাকে, তুমি আমাকে বল না কেন?"

"তোমাকে সে কথা বলিবার নহে। একই লোকের কানে সে কথা বলিব। তোমার গোঁফ-দাড়ি আছে, তুমি কাছা দিয়া কাপড় পর, তোমার খোঁপা নাই। তুমি কি আমার অধ্যাপক যে, তোমাকে সংবাদ বলিব?"

"তবে কি তোমাকে অন্দরে লইয়া যাইলে, তুমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া তোমার খবর বলিবে? তুমি এখান হইতে সরিয়া পড়।"

গজ। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে এখানকার লোক, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?

দ্বার। তুমি কখনই এখানকার লোক নহ। এখানকার কোন্ লোককে আমি চিনি না? আর এখানকার কোন লোক হইলে সে কখনই অন্দরের দরজায় আসিয়া গোল করিতে সাহস করিত না। তুমি নিশ্চয়ই কিষ্কিন্ধ্যার লোক।

গজ। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জান না; গড়মান্দারণে আমাকে জানে না, এমন লোক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা, তুমি অভিরাম স্বামীকে জান না?

দ্বার। তাঁহাকে জানি না? তুমি কি পাগল? তাঁহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ?

গজ। তিনি আমার অধ্যাপক। আমি তাঁর প্রধান ছাত্র।

দ্বারপাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তা তোমার এরূপ বেশ কেন?"

গজ। সে অনেক কথা ভাই, আর এক দিন তোমাকে বলিব। এখন এই পুরের মধ্যে আমার আশমানী আছেন। আমার নিকট যে জরুরী খবর আছে, তাহা আমি তাঁহাকেই বলিব।

দ্বার। আশমানী আছে বটে, কিন্তু সে তোমার কি রকম?

গজ। সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নাই। হয় তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া দেও, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেও, আর না হয়, আমাকে এই স্থান হইতে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে দেও।

দ্বার। দাঁড়াও, আমি কোন লোকের দ্বারা আশমানীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি।

দিগ্‌গজ বলিল, "আমি দাঁড়াইতে পারিব না, যাহা হয়, শীঘ্র কর। আমার সংবাদ বড়ই জরুরী; বিলম্বে বড়ই বিপদ।"

দ্বারপাল একটু চিন্তা করিল। বুঝিল, এ গড়মান্দারণের লোক বটে। ইহাকে হঠাৎ তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি চেষ্টা দেখিতেছি।"

যখন দ্বারপালের সহিত গজপতির এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, তখন অন্তঃপুরের এক প্রচ্ছন্ন বাতায়ন-পার্শ্বে যবনিকার অন্তরালে এক প্রৌঢ়া বিধবা নারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে না পাইলেও, তিনি দ্বার-সমীপে নবাগত ব্যক্তি হাত-মুখ নাড়িতে নাড়িতে যে ভঙ্গী করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন।

সেই বিধবা নারী বিমলা। বিমলার দেহের সে উজ্জ্বলতা ও কোমলতা নাই; বর্ণের সে চম্পকতুল্য মনোহারিত্ব নাই; ওষ্ঠাধরে সে তাম্বূলরাগ নাই; লোচনে পূর্ব্বের ন্যায় কজ্জলরেখা নাই; তাহাতে মন্মথশররূপী সে কটাক্ষ নাই; কেশের সে নিবিড় কৃষ্ণতা নাই, তাহাতে বেণী বা কবরী নাই; দেহের কুত্রাপি কোন ভূষণ নাই; স্বর্ণসূত্র-সমন্বিত বস্ত্রে তাঁহার শরীর সমাবৃত নাই; বক্ষে মুক্তা-রচিত কাঁচলি নাই, বিমলার পূর্ব্ব-শোভা ও সমৃদ্ধির কিছুই

নাই। বয়সে না হইলেও বাহতঃ বিমলা বৃদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার যে অলৌকিক লাবণ্য ও শোভাময় যৌবনসম্পদ্ কালবিজয়ী বলিয়া লোকের মনে হইত, তাহা এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট, বিশুষ্ক ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, দেহ কাতর ও অবসন্ন, গতি কম্পিত ও বিচলিত, ভাবভঙ্গী সংযত ও সাবধান। বিলাসময়ী বিমলা এখন শুভ্র বেশধারী; হাস্য ও কৌতুকময়ী বিমলার ওষ্ঠাধর এখন রবিকর-প্রতপ্ত কুসুম-কলিকার ন্যায় ম্লান। হাস্য ও আনন্দ সে প্রিয়নিবাস হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে; রহস্য, রসিকতা ও বিদ্রূপ চিরদিনের জন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। হায় শোক! এ সংসারে তুমি কি অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই সতত না ঘটাইতেছ!

বিমলা প্রথমে দ্বার-সমীপে সমাগত সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সুপরিচিত রসিকরাজ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, যাহার সহিত তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস করিবেন মনে করিয়াছিলেন, যে রসিক-শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে 'ঘৃতভাণ্ড' নাম দিয়া রসজ্ঞতার চমৎকার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল এবং যে ভুবনমোহন পুরুষের সহিত প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু আশ্‌মানীর সহিত তাঁহার সময়ে সময়ে ঈর্ষ্যা-কলহ ঘটিত, সম্মুখস্থ অসঙ্গত পরিচ্ছদধারী পুরুষ নিশ্চয়ই সেই নটবর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে হইল, হায়, সে নির্দ্দোষ আনন্দের দিন আর ফিরিবে না!

এই সময়ে আর এক শ্যামবর্ণা, ঈষৎ স্থূল-কলেবরা, প্রৌঢ়বয়স্কা কামিনী বিমলার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই নারী আশ্‌মানী।

আশ্‌মানী বলিল, "আর মথুরার পথপানে চাহিয়া চাহিয়া কেন মরিতেছ সখি? সে শঠ নটবর গজপতি আর ফিরিবে না।"

বিমলা বলিলেন, "এ প্রণয়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া আটকাইয়া রাখা কি কুব্জার কাজ? আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন আবার আসিয়াছে।"

আশ্‌মানী বলিল, "সত্য না কি? আহা! এমন দিন কি আর হইবে?"

বিমলা বলিলেন, "দেখ আসিয়া।"

আশ্‌মানীকে টানিয়া বিমলা আপনার স্থানে আনিলেন এবং স্বয়ং একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন, "ঐ দেখ দেখি, সেই মনচোরা নাগর কি না?" আশ্‌মানী একটু দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও মা, সেই বিটলে বামুনই বটে! এত দিন পরে ও কোথা হইতে আসিল? ও মা, ও কি সাজ?"

বিমলা হাসিতে হাসিতে আশ্‌মানীর চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "বিরহ-বিহ্বলে রাধে, সকল কথাই কি ভুলিয়াছ? গোপীকার প্রাণধন যে এখন মথুরার রাজা। ও যে রাজবেশ!"

আশ্‌মানী বলিল, সে কথা যাউক, ও হতভাগা এত দিন পরে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল?"

বিমলা বলিলেন, "সে কথা জানা আবশ্যক। তুমি কোন উপায়ে জানিয়া আইস, গজপতি কেন আসিয়াছে, কেনই বা দ্বারবানের সহিত গোল করিতেছে।"

আশ্‌মানী প্রস্থান করিল এবং নিম্নতলে অবতরণ করিয়া লচমনি নাম্নী দাসীকে ডাকিয়া হইল।

তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারের পার্শ্বস্থ একটা শূন্য-কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটা অন্ধকার, সেখানে বসিবারও কোন স্থান নাই। আশ্‌মানী সেইখানে দাঁড়াইয়া লচমনিকে বলিল, "দরজায় যে একটা নেড়া-মাথা লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, তুমি জানিয়া আইস, সে কি চাহে।"

লচমনি বলিল, "তুমি নিজে যাও না কেন?"

আশ্‌মানী বলিল, "ও যে আমার নাগর; আমি যে এখন মানে আছি, হঠাৎ যাইব কেন?"

লচ্‌মনি অনেক দিন দুর্গে আছে। সে আশমানীর অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে। রসিকতা ও রহস্যশাস্ত্রে সেও নিতান্ত অপণ্ডিতা নহে। ভাবিল, মন্দ রঙ্গ নহে, বলিল—"মরণ আর কি! যদি তোমার নাগর আমি কাড়িয়া লই?"

আশ্‌মানী বলিল, "সাধ্য কি? তুই তো তুই, স্বয়ং গিন্নীঠাকুরাণী আসিয়াও আমার কিছু করিতে পারেন নাই। দয়া করিয়া আমি তাঁহাকে একদিন চন্দ্রাবলী হইতে দিয়াছিলাম। মানময়ী রাধিকা আমিই আছি, আমিই থাকিব।"

লচমনির বয়স বেশী নয়; বোধ হয়, আশ্‌মানীর অপেক্ষা দুই এক বৎসর কম হইতে পারে। গায়ের বর্ণটাও আশ্‌মানীর অপেক্ষা ফরসা; সুতরাং সে একবার আপনার দেহের দিকে চাহিয়া, সহজেই আশ্‌মানীর সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে, এইরূপ

ভর্ৎসনা করিল। বলিল, "এত গরব ভাল নয়; শেষে কাঁদিয়া মাটী ভাসাইতে হইবে। আমি যাইতেছি।"

লচ্‌মনি যখন দ্বার-সন্নিধানে আসিল, তখন গজপতি কাতরভাবে দ্বারবান্‌কে বলিতেছেন, "ভাই, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ? যদি আমাকে আশ্‌মানীর সহিত দেখা করিতে না দাও, তাহা হইলে আমি এই স্থানে গলায় দড়ি দিব! তোমার তাহাতে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা, সকল পাপই হইবে।"

দ্বারবান্ জিজ্ঞাসা করিল, "এত পাপ হইবে কেন?"

দিগ্‌গজ বলিল. "দেখ, বাল্যকাল হইতেই আমার অধ্যাপকেরা আমাকে গরু বলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং গোহত্যা, বুঝিলে? আমি ব্রাহ্মণকুলের প্রদীপ, সুতরাং ব্রহ্মহত্যা তো সহজেই বুঝিতেছ। আর আমার বড় ভয়; এই জন্য আমার এক সহাধ্যায়ী ছাত্র বলে, ও মেয়েমানুষ, উহার কোন সাহস নাই। আর আমি সহজেই কাঁদিয়া ফেলি, এ জন্যও লোকে আমাকে স্ত্রীলোক বলে; সুতরাং স্ত্রীহত্যা বুঝিলে? একবার মাছ কিনিতে বাজারে গিয়াছিলাম, মেছুনী পাটার উপর মাছের ভাগ সাজাইয়া বসিয়া আছে; পাটায় দশ বারো ভাগ মাছ আছে। আমি একটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া সকল ভাগই গামছায় তুলিতেছি দেখিয়া সে বলিল, 'কর কি ঠাকুর?' আমি বলিলাম, 'কেন, মাছ লইতেছি।' সে বলিল, 'এক পয়সা দিয়াছ, এক ভাগ লও, বেশী তুলিতেছ কেন?' আমি বলিলাম, 'কেন, এক পয়সায় সব ভাগগুলা নয়? মেছুনী আমার গায়ে একটু জল ছিটাইয়া দিয়া মাছ কাড়িয়া লইল, আর বলিল, 'আহা কিছু জানেন না, মায়ের পেটে আছেন।' তাহা হইলে ভ্রূণহত্যাও বুঝিলে?"

এইরূপ সময়ে লচ্‌মনি সেই স্থানে দর্শন দিয়া বলিল, "কে হে রসিক পুরুষ, চিনিতে পার?'

দিগ্‌গজ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন; এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন। এ সুন্দরীর সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল, এরূপ মনে পড়িল না। কিন্তু একটা স্ত্রীলোক তাঁহাকে রসিক পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিল, অথচ তিনি তাঁহাকে চিনিতেও পারিলেন না, ইহা নিতান্ত অরসিকের ব্যবহার। বলিলেন, "তোমায় চিনি চিনি করি, তোমায় চিনিতে না পারি, সুন্দরী, তুমি কে বট হে?"

তখন লচমনি মুখখানা নিতান্ত ভার করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এ কথা মনে থাকিল। জানি আমি, অবিশ্বাসী পুরুষ-জাতিকে না বুঝিয়া মন-প্রাণ দিলেই শেষে কাঁদিতে হয়। আমার মন-প্রাণ চুরি করিয়া শেষে তোমার এই কথা?"

দিগ্‌গজ অনেক ভাবিয়াও মন-প্রাণ চুরির কথা কোনমতেই মনে করিতে পারিলেন না;—বলিলেন, "আমি জীবনে কখনও ভাঙ্গা পাথরের বাটিও চুরি করি নাই। আমি চোর নহি, একথা গড়মান্দারণের সকল লোকই জানে। তুমি অন্যায় করিয়া আমাকে চোর বলিলে হইবে কেন? তুমি সন্ধান করিয়া দেখ, তোমার মন-প্রাণ আর কোথায় পড়িয়া আছে—আমি কখনই লই নাই।"

লচ্‌মনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শেষে ঐ কথা সকলেই বলে। তা বেশ ভাই, আমি এখন যাই।"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "যাইও না সুন্দরী, যাইও না। আমি তোমাকে চিনি বই কি! তুমি চিনাইয়া দিলেই আমি চিনিতে পারিব। যদি আমাকে চোর বলিলে তোমার সন্তোষ হয়, তবে আমি চোরই বটি। এখন তুমি কৃপা করিয়া আমার একটু উপকার কর।"

লচ্। বল, কি করব?

দিগ্‌গজ যুক্তকরে বলিলেন; "আশমানীকে একটা জরুরী কথা বলিবার আবশ্যক আছে। যদি তুমি ভাই দয়া করিয়া তাহার উপায় করিয়া দেও।"

লচমনি বলিল, "বড় দায় পড়িয়াছে! তুমি আশ্‌মানীকেই ভালবাস, আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ, চিনিতেও পারিলে না। আমি এখন সেই আশ্‌মানীকে তোমার কাছে আনিয়া দিব? পোড়া কপাল!"

লচমনি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গজপতি কাতরভাবে তাহার বস্ত্রাগ্র ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "দোহাই তোমার, তুমি রাগ করিয়া আমার গলায় পা দিয়া মারিও না, একবার দয়া করিয়া আশ্‌মানীকে ডাকিয়া দেও। আমি তোমারই দাস। চিরদিন তোমার কেনা গোলাম হইয়া থাকিব।"

লচমনি বলিল, "এ কথা তোমার মনে থাকিবে কি? চিরদিন আমার দাস হইয়া থাকিবে, আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে, কখনও আমার কথার অন্যথা করিতে পাইবে না, প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি আশ্‌মানীকে ডাকিয়া দিতেছি।"

তখন দিগ্‌গজ বলিলেন, 'আমি আমার এই শিখায় হাত দিয়া, রুদ্রাক্ষ-মালায় হাত দিয়া, অধিক কি, তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি, আমি তোমার আজ্ঞাধীন দাস, এ কথার কখনও অন্যথা হইবে না।"

তখন লচমনি হাসিয়া বলিল, "তবে আইস।"

লচমনির সহিত দিগ্‌গজ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান্ এবার কোন আপত্তি করিল না। সেই অন্ধকারে ঘরের নিকটস্থ হইয়া লচমনি দেখাইয়া দিল, এই ঘরে আশ্‌মানী আছে।

গজপতি ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "এঃ! এ যে বড় অন্ধকার।"

লচমনি বলিল, "ভিতরে যাও, তুমি গেলেই ঘর আলো হইবে।"

দিগ্‌গজ আর একটু প্রবেশ করিয়া আশমানীকে দেখিতে পাইল। আনন্দে সে লাফাইয়া উঠিল। হাসিতে তাহার মুখগহ্বর এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আশ্‌মানী বলিল, "ভূত যে! এতদিন কোথায় ছিলে ভূত?"

গজপতির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য আশ্‌মানীকে দেখিলেই উথলিয়া উঠে। এতদিন পরে প্রণয়িনীকে দেখিতে পাইয়া একটা শ্লোকের দ্বারা সম্ভাষণ না করা উচিত নহে বিবেচনায় বলিলেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

ব্রাহ্মণ আশ্‌মানীকে একটা প্রণাম করিলেন। আশ্‌মানী বলিল, "পোড়া কপাল! আমাকে বুঝি প্রণাম করিতে হয়?"

রসিকরাজ বলিলেন, "হয় বই কি! যখন পায়ে মাথা ঘষিতে হয়, তখন প্রণাম কি বড় কথা?"

আশ্‌মানী বলিল, "তোমাকে এত রসিক করিয়া ছাড়িয়াছে কে? এত দিন ছিলে কোথা?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে আইস; এখানে অনেক বিপদ।"

আশ্‌মানী বলিল, "কিসের বিপদ? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইবে?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "আমি যেখানে খুসী, সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব। তুমি আমার প্রণয়িনী কি না, বল।"

আশ্‌মানী বলিল, "সে কথা কি বার বার মুখে বলিতে হয়? আমি যে তোমার কি, তাহা সকলেই জানে।"

গজপতি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। সে কথা সকলেই জানে। এক দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত জ্যোতিষীর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনিও এ কথা জানেন। তবে তুমি কেন না আমার সঙ্গে যাইবে?"

আশ্‌মানী বলিল, "কে বলিতেছে, সঙ্গে যাইব না? আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি কখনই তেমন ভালবাস না।"

গজপতি বলিলেন, "কে তোমাকে এ কথা বলিল? যে এ কথা বলিয়াছে, সে মিথ্যাবাদী। আমাদের মন ভাঙ্গাভাঙ্গি করাইবার জন্য নিশ্চয় মিথ্যাকথা রটাইয়াছে। আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তাহার প্রমাণ আমার শরীরে লেখা আছে। জ্যোতিষী মহাশয় আমার কপাল দেখিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে তোমার নামের প্রথম অক্ষর 'আ' আর শেষ অক্ষর 'নী' লেখা আছে। এমন ভালবাসা কেহ কখনও কোথায় দেখিয়াছে কি?"

আশ্‌মানী বলিল, "এ সকল মিথ্যা কথা। তুমি যদি আমাকে একটু ভালবাসিতে, তাহা হইলে এত দিন আমাকে ছাড়িয়া কখনই বিদেশে থাকিতে না।"

গজপতি বলিলেন, "আশ্‌মানী প্রাণেশ্বরি, কপালে আমার তোমার নাম লেখা রহিয়াছে। এ কথা অবিশ্বাস কর যদি, তবে তুমি দেখ, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।"

দিগ্‌গজ অনেকখানি নত হইয়া আশ্‌মানীর চক্ষের সমক্ষে আপনার কপাল স্থাপন করিলেন; —জিজ্ঞাসিলেন, "দেখিতে পাইতেছ?"

আশ্‌মানী বলিল, "হাঁ, দেখিতেছি বটে; কিন্তু যে অক্ষর তুমি বলিতেছ, তাহা দেখিতেছি না। আমি দেখিতেছি, তোমার কপালে স্পষ্টরূপে লেখা রহিয়াছে "গাধা।"

গজপতি বলিলেন, "তাহাও থাকিতে পারে; কেন না, আমি তোমার গাধা বটে। তুমি আমাকে চরাও ফিরাও, মোট বহাও, আমাকে লইয়া যাহা খুসী, তাহাই কর। এক্ষণে আর বিলম্বে কাজ নাই; শীঘ্র আমার সঙ্গে চল। এখানে ভয়ানক বিপদ্।"

"কি বিপদ্?"

"বীরেন্দ্রসিংহের ব্যাপার আবার উপস্থিত।"

"সে কি?"

"যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন।"

আশ্‌মানী চমকিতা হইল; সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে বলিল?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "যাহারা বন্দী করিয়াছে, তাহারাই বলিয়াছে।"

"কাহারা বন্দী করিয়াছে ?"

"মহারাজ মানসিংহের লোক।"

"কোথায় বন্দী করিয়াছে ?"

"পথে।"

আশ্‌মানী বড়ই চিন্তাকুল হইল। এ কথা যে অসম্ভব নহে, তাহা সে অনুমান করিল। তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সত্য বলিতেছ তো ?"

দিগ্‌গজ বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার নিকট মিথ্যা বলিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। আমি এ কথা ভাল রকম জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাবিতেছ কি ? যখন যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন, তখন সেবারকার মত এবারও দুর্গের সকলেই বন্দী হইবে। আমি তোমার জন্যই ভাবিতেছি। আইস, এই বেলায় আমরা পলাইয়া যাই।"

আশ্‌মানীর মন তখন বড়ই অস্থির হইয়াছে। বিমলাকে এ সংবাদ জানাইবার জন্য সে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছে। গজপতিকে তখন বিদায় করা তাহার আবশ্যক। বলিল, "বেশ কথা। পলাইয়া যাওয়াই সৎপরামর্শ। তুমি এখন যাও, জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা পলাইয়া যাইব।"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি, অত বিলম্ব করিতে সাহস হয় না। যদি ইহার মধ্যে বিপদ ঘটিয়া যায় ?"

আশ্‌মানী বলিল, "তাহার উপায় আমি করিব, তুমি এখন যাও। তোমার আশ্রমে থাকিও। আমি শুনিয়াছি, বেলা দেড় প্রহরের সময় মহারাজের লোকেরা এই দুর্গ ঘেরাও করিবে।"

দিগ্‌গজ কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বল কি ? তবে—তুমি, যাহা হয় করিও। আমি এখন যাই।"

আশ্‌মানী বলিল—"তুমি পলাও, আমি ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে জুটিব।"

গজপতি একলাফে ঘরের বাহিরে আসিলেন। সেখানে লচমনি দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "তবে বঁধু, আমাকে ফেলিয়া কোথা যাও ?"

সে গজপতির চাপকানের প্রান্ত চাপিয়া ধরিল। দিগ্‌গজ বলিলেন, "ফেলিয়া যাইতেছি না, এখনই আসিব। তুমি এখন ছাড়—ছাড়—"

চাপকানের অনেকখানি লচমনির হাতে রহিয়া গেল। গজপতি পলায়ন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবিবেচনা

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ-বাহিত সংবাদ অচিরে দুর্গের সর্বত্র প্রচারিত হইল। জগৎসিংহের এই বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণে আত্মীয়গণের উৎকণ্ঠার সীমা থাকিল না। দিগ্‌গজকে নিকটে ডাকিয়া অভিরাম স্বামী নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে বেশী কথা কিছুই বলিতে পারিল না। অবশেষে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অভিরাম স্বামীর আদেশে একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী সৈন্য অশ্বারোহণে পাটনার পথে যাত্রা করিল। ইত্যবসরে আত্মীয়গণ কর্ত্তব্য অবধারণে ব্যাপৃত হইলেন।

সন্ধ্যার পর অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মুখ বিমর্ষ ও চিন্তার কালিমায় সমাচ্ছন্ন। সকলেই নীরব।

প্রথমে বিমলা কথা কহিলেন,—জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে উপায় ?"

অভিরাম স্বামী অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মনে পড়ে বিমলা, শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজের সহিত তোমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর যখন তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলে, সে দিনকার সকল কথা তোমার মনে পড়ে কি ? অধিক দিনের কথা নয়, এই কুটীরে এই স্থানে দাঁড়াইয়া তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলে।"

বিমলা বলিলেন, "মনে পড়ে। সে দিনকার সকল কথাই মনে পড়িতেছে।"

আমি তখন বলিয়াছিলাম, "এ বিবাহে মানসিংহ সম্মত হইবেন কেন ? তুমি তাহার উত্তরে বলিলে, 'যুবরাজ স্বাধীন।' একথা তোমার মনে আছে ?"

বিমলা অধোমুখে বলিলেন, "আছে।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "সেই স্বাধীনতার এই ফল। যুবরাজ কখনই স্বাধীন নহেন। তাঁহার পিতা ধনে, মানে, পদে, প্রতিষ্ঠায়, বলে ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে জগৎসিংহের কোন অধিকার নাই। তাহার পরে

মানসিংহের সহিত যুবরাজের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। সুতরাং তিনি স্বাধীন নহেন। আরও দেখ, তিনি সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত। সে কার্য্যে অবস্থানকালে তাঁহার কোন বিষয়েই স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।"

বিমলা বলিলেন, "সে কথা এখন বুঝিতেছি; কিন্তু তখন এ কথা বুঝিলেই বা কি হইত? এ প্রেমের স্রোত নিরুদ্ধ করিতে আমাদের সাধ্য ছিল না।"

অভিরাম স্বামী একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বিমলা, তুমি বালিকাও নহ, এরূপ ব্যাপারে অনভিজ্ঞাও নহ। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া তোমার উচিত ছিল। আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, অঙ্কুরেই এ বাসনা ছিন্ন করা আবশ্যক। তুমি আমার সে কথা গ্রাহ্য কর নাই; তাহার পরিণাম এক্ষণে ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। জানি না, অতঃপর কতদূর কি হইবে।"

বিমলা বলিলেন, "আপনি সর্ব্বদা তিলোত্তমাকে দেখিতে পান না। আমি নিয়ত তাহার নিকট অবস্থান করি। আমি তখন বেশ বুঝিয়াছিলাম, এরূপ মিলন না ঘটিলে তিলোত্তমা চিরদুঃখিনী হইবে।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমি ইহা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও পারিতেছি না এবং পরে যে বুঝিতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। প্রথম দর্শনে—ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে একবারমাত্র সহসা দর্শনে যে প্রেম জন্মে, তাহা কখনই প্রগাঢ় হইতে পারে না। তাহা কেবল লালসাজনিত ক্ষণিক মোহমাত্র। তাহার উত্তেজনা বড়ই প্রবল হয় এবং তাহা মনুষ্যকে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলে বটে, কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধার সেই সময় নৌকা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলে সকল বিপদ ও আশঙ্কা কাটিয়া যায়। অসঙ্গত অসম্ভব প্রবৃত্তির স্রোত সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্ধ না করিলেই তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠে এবং ক্রমে কূল আক্রমণ করিয়া সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়। তুমি এ সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞা, এ জন্য আমি তোমার উপর সুব্যবস্থার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

বিমলা অধোমুখে উত্তর দিলেন, "আমি সাধ্যমত সুব্যবস্থাই করিয়াছি। যাহাতে সকল সুখময় ও আনন্দময় হয়, তাহারই উপায় করিয়াছি।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমাদের এখন ঘোরতর বিপদের ও উৎকণ্ঠার সময় অপ্রিয় অতীত প্রসঙ্গের আলোচনা না করাই উচিত। তথাপি যখন কথাটা উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে বিশেষ কোন হানি হইবে না। তুমি এই ব্যাপারের মূল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে যে সুব্যবস্থা করিয়াছ, তাহার কোন অংশ আমার অবিদিত নাই। আমি তাহার সর্ব্বত্র তোমার দারুণ অবিবেচনা, অসাবধানতা ও নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেখিতে পাইতেছি।"

বিমলা অধোমুখ ও নীরব। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "সত্য চিরদিনই অপ্রিয়। এই দুঃখের সময়ে তোমাকে অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়া বেদনা দিতে আমি ইচ্ছা করি না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি ফিরিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সে আলোচনায় ফল ছিল; কিন্তু এক্ষণে সে অতীত ব্যাপারের বিচার কেবল কষ্টেরই কারণ।"

বিমলা বলিলেন, "আমি প্রাণপণে তিলোত্তমার হিতসাধন করিয়া আসিতেছি। তিলোত্তমা আমার দ্বিতীয় জীবন। আমার জীবনের সকল সুখই এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এ জীবন আর এক দিনও রাখিবার প্রয়োজন নাই; তথাপি যে এখনও বাঁচিয়া আছি, সে কেবল তিলোত্তমাকে সুখী দেখিয়া, সংসার ত্যাগ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আমার অদৃষ্টের দোষে তিলোত্তমা সকল প্রার্থনীয় সুখের অধিকারিণী হইয়াও আবার অকূল পাথারে ভাসিয়াছে, আবার শোকে ও চিন্তায় মৃতকল্প হইয়াছে। আমার এ দুঃখ কে বুঝিবে? কাহাকেই বা আমার প্রাণের অবস্থা জানাইব? আমি যাহার চিন্তায় এত ব্যাকুল, আমার অবিবেচনার ও বুদ্ধির দোষে তাহার অশুভ কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অপ্রিয় হইলেও এ কথা শুনিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আপনি দেখাইয়া দেন, আমি কোথায় কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "পূর্ব্বাপর ঘটনাসমূহ তোমার অবিদিত ছিল না; তোমার জানা ছিল, মানসিংহ পুত্রের সহিত বীরেন্দ্র-তনয়ার বিবাহ-ব্যাপার কখনই ঘটিতে পারে না। ইহা জানিয়া তিলোত্তমাকে স্পষ্টভাবে ও সরল কথায় এ আশা নির্ম্মূল করিবার উপদেশ দেওয়া তোমার উচিত ছিল। সে উপদেশ কোন সুফল প্রসব না

করিলেও তুমি তিলোত্তমার বিমাতা, একমাত্র রক্ষয়িত্রী,—তোমার কর্ত্তব্য পালন করাই তোমার পক্ষে বিধেয় ছিল। তুমি তোমার সে কর্ত্তব্য একবারও পালন কর নাই। পনর দিন পরে পুনরায় যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় একবার প্রসঙ্গক্রমে তিলোত্তমাকে এ কথা বলিয়াছিলে বটে, কিন্তু তাহাও দৃঢ়তার সহিত বল নাই। প্রথম দিন হইতেই এ কথা পুনঃ পুনঃ তিলোত্তমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। এ কথা সত্য নয় কি?"

বিমলা নিরুত্তর। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যুবরাজ শৈলেশ্বর-মন্দিরে তোমাদের পরিচয় না পাইয়াই চলিয়া যাইতেন; কিন্তু পক্ষান্ত পরে পুনরায় সেই স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয়-প্রদানের ব্যবস্থা করা তোমার উচিত হয় নাই। সেই প্রথম সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ হইলে শ্রেয়ঃ হইত; ইচ্ছা পূর্ব্বক দ্বিতীয় সাক্ষাতের প্রতিজ্ঞা করা তোমার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই। আমি জানি, তুমি ও আশ্‌মানী আমার শিষ্য গজপতির সহিত মৌখিক রহস্যাদি করিয়া থাক; কিন্তু সে বর্ব্বর সেই সকল রহস্য নিতান্ত মৌখিক বলিয়া মনে করে না। সেই গজপতিকে সঙ্গে লইয়া নিশীথে শৈলেশ্বর-মন্দিরে গমন করা তোমার উচিত হয় নাই। সে কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুরক্ত। সে দিন তোমরা বিবিধ প্রকার বাক্যে ও ব্যবহারে তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলে; পথে সঙ্গীতাদি লালসাবর্দ্ধক ব্যাপারেরও অভাব হয় নাই। সে পশুতুল্য নির্ব্বোধ পুরুষ সহজেই তোমার প্রতি কোন না কোন অত্যাচার করিলেই পারিত। এ সকল আচরণ কুল-কামিনীর পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কেমন, এ সকল কথা সত্য নয় কি?"

বিমলা নিরতিশয় লজ্জা পাইলেন। তিনি নিরুত্তর। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "মন্দিরে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎকালে যখন জানিতে পারিলে, তিনি তিলোত্তমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তিলোত্তমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হওয়া উচিত হয় নাই। সেই স্থানেই এই ব্যাপারের উপসংহার করিলেই ভাল হইত। তাহা না করিয়া তুমি সেই রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ এবং তোমার ক্ষমতা ও অধিকারের কথা বিস্মৃত হইয়া, অনেক গর্হিত ব্যবহার করিয়াছ। দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতসারে তুমি এই যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে এক জন যুবা মোগল-সেনাপতিকে অনায়াসে দুর্গমধ্যে লইয়া গিয়াছ। তুমি দুর্গ-স্বামীর পরিণীতা পত্নী সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ আচরণের অধিকার তোমার কখনই থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকের এ স্বাধীনতা কখনই শোভা পায় না এবং তাহা অনেক অনর্থের হেতু-ভূত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে তোমার কোন উত্তর আছে কি?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ নীরব। অভিরাম স্বামী বলিলেন "তাহার পর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা কোন জননী, কোন বিমাতা, কোন পরিচারিকা, কোন পরিচিতা স্ত্রীলোক, অধিক কি, কোন গণিকাও করিতে সাহস করে না। তুমি অনায়াসে অবিবাহিতা কন্যার সুসজ্জিত ও সুবাসিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাহার প্রতি অত্যাসক্ত, তরুণ বয়স্ক রাজপুত্রকে প্রবেশ করাইয়াছ। এ অপরাধের—এ স্বাধীনতার—এ অবিবেচনার কথা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। তোমারই অসাবধানতায় সেই দিন দুর্গ পাঠানের হস্তগত হইল এবং তাহারই ফলে তোমার বৈধব্য ঘটিল; সঙ্গে সঙ্গে অশেষ অনর্থের উদ্ভব হইল। বিমলা, আমি তোমাকে তিরস্কার করিতেছি না। তিরস্কার বা অনুযোগের এ সময় নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এই ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার কোন আচরণই সঙ্গত হয় নাই।"

তখন বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃচরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি, আমি অতিশয় গর্হিত ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কোন প্রতীকার সম্ভব নহে। অধুনা আমাদের উপায় কি, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

অভিরাম স্বামী বিমলাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন, "উপায়ের চিন্তা আমি সমস্ত দিনই করিতেছি। আমি যে দূত প্রেরণ করিয়াছি, তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপায় অবধারণ করা অসম্ভব। একমাত্র নির্ব্বোধ গজপতির মুখে সামান্যমাত্র সংবাদ শুনিয়া কোন বিষয় বুঝা যাইতেছে না। মহারাজের ক্রোধ

কত দূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে, কি উপায় আমাদের অবলম্বনীয়, তাহা স্থির করিতে পারিব।”

বিম। দূত কয়দিনে ফিরিয়া আসিতে পারে?

অভি। কল্যও আসিতে পারে। যদি পাটনা পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হয়, তাহা হইলে আট দশ দিন বিলম্বও হইতে পারে।

বিম। আট দশ দিন বিলম্ব করিতে হইলে না জানি কি বিপদ্‌ই ঘটিবে। তিলোত্তমা আজই মৃতকল্প হইয়াছে; আট দশ দিন এ যাতনা সহিয়া সে বাঁচিবে কি?

অভি। তুমি তিলোত্তমাকে বিশেষ সাহস ও ভরসা দিবে। আমি কল্য প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিব।

বিম। মহারাজার সহিত যুবরাজের পিতা পুত্র সম্বন্ধ। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাক্ষাৎ হইলে পুত্রের মুখে বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না কি?

অভি। কেমন করিয়া সে আশা করিব? বীরের ক্রোধ পুত্র বা আত্মীয়-বোধে নিরস্ত না হইতেও পারে।

বিম। এ ক্রোধের পরিণাম কি হইতে পারে বলিয়া আপনি আশঙ্কা করেন?

অভিরাম স্বামী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “তোমরা নারী—সব কথা বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা না করিলেই তোমাদের ভাল হয়।”

বিম। যদি বিশেষ অনিষ্ট-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে প্রতীকারের চেষ্টা করাই উচিত। মহারাজ মানসিংহ আপনাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আপনি এই সময়েই পিতাপুত্রের মনান্তর দূর করিবার নিমিত্ত মধ্যস্থরূপে উপস্থিত হইলে হয় না?

অভি। আমার মধ্যস্থতায় এ ব্যাপারে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না। তোমরা মনে কর বটে, মহারাজ মানসিংহ আমাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি জানি, ভক্তি-শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, তিনি আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। আমাদিগের কাহারও উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। এ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অন্য লোকের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে এবং সে চেষ্টা মানসিংহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির নিকট করিতে হইবে। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল, তোমরা দুর্গে যাও। কল্য প্রাতে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

বিমলা ও আশমানী গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিভাবে অভিরাম স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিরহিণী

দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। পাটনা পর্য্যন্ত গমন করিয়া যুবরাজের দুর্দ্দশার সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ তাবৎ লোক শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছে।

যে দিন দূত এই বার্ত্তা বহন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, সেই দিন তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করিয়া অভিরাম স্বামী দুর্গসংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যবস্থায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বিষয়-ব্যাপার যাহাতে সুনির্ব্বাহিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া, সেই দিনই তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন। লোক-সমক্ষে তিনি তীর্থযাত্রার কথাই প্রচার করিলেন। সুতরাং সাধারণে তাহাই বুঝিল। কিন্তু বিমলা অন্যরূপ বুঝিলেন। তিনি জানিলেন, অভিরাম স্বামী উপস্থিত শোচনীয় কাণ্ডের কোন প্রতীকার চেষ্টায় দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

তিলোত্তমা—দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা তিলোত্তমা! এ দারুণ শেল বুকে পাতিয়া ধরিবার ক্ষমতা তোমার নাই কি? এ কঠোর যাতনা ধীরতার সহিত সহ্য করিবার সামর্থ্য তোমার নাই কি? এ বিপদ্‌বাত্যা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্র তুমি শান্তভাবে অতিক্রম করিতে পারিবে না কি?—না। তিলোত্তমা এ আঘাতে একান্ত অবসন্ন হইয়াছেন; এই তীব্র যাতনা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যথিত ও কাতর করিয়াছে; এ দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিবার শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহার নাই। বিচ্ছেদবিধুরা দুঃখিনী অধোবদনে ভূ-শয্যায় পতিতা।

সেই প্রকোষ্ঠ। যে প্রকোষ্ঠে হৃদয়েশ্বরের সহিত অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে, হিতৈষিণী বিমলার অনুকম্পায় তিলোত্তমার প্রথম মিলন হয়, যে প্রকোষ্ঠে সেই সরলহৃদয়া সুর-সুন্দরী চিরদিনের নিমিত্ত জগৎসিংহের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, যে প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রাণেশ্বর অনবরত অসিচালনায় পর শত্রুর

অস্ত্রাঘাতে সংজ্ঞাশূন্য ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাশায়ী হন, যে প্রকোষ্ঠে তিলোত্তমা ও বিমলা কারোপম পাঠানগণের হস্তে বন্দিনী হন, সেই বহুবিধ সুখ ও দুঃখের স্মৃতি-উদ্দীপক সেই প্রকোষ্ঠে তিলোত্তমা শয়ানা। নিকটে সেই পর্য্যঙ্ক। যে পালঙ্কের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে একদিন অসাবধানভাবে নানা বিষয় লিখিতে লিখিতে তিনি কুমার জগৎসিংহের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আপনার এই অসাবধানতা উপলব্ধিজনিত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বার বার খট্টার সেই কাষ্ঠাংশ প্রক্ষালিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াও মনে করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বের নাম সুস্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে, সেই পর্য্যঙ্ক। যে পর্য্যঙ্কে প্রাণেশ্বর জগৎসিংহের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কত সুখের কল্পনায় তিলোত্তমা প্রমত্ত হইয়াছেন, কত আনন্দসাগরে ভাসিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে সেই পর্য্যঙ্ক। দশ দিন পূর্ব্বে জীবিত-নাথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া উৎকণ্ঠায় রজনী অতি-বাহিত করিয়াছেন এবং উষার শীতল সমীরসংস্পর্শে ঈষৎ নিদ্রার আবেশ আসিলে তাঁহার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া প্রাতঃকালে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই সাধের শয্যাচ্ছাদিত সুখময় পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে তিলোত্তমা শয্যায় নিদ্রিতা।

বাতায়ন হইতে অশ্বারূঢ় বীরপতির সহিত সেই সাক্ষাৎ, সেই বিদায়, সেই রোদন, সেই প্রণাম। দশ দিন হইয়া গেল, আর তিনি ফিরেন নাই। কেবলই কি ফিরেন নাই? ফিরিবার আর সম্ভাবনা নাই। তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী—যাবজ্জীবন তাঁহাকে এই দশায় কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ মানসিংহের এই আদেশ—পিতার আজ্ঞায় পুত্রের এই কঠোর শাস্তি! কে এ ব্যবস্থার অন্যথা করিতে পারে? ভারতবর্ষে এমন ক্ষমতা কাহার আছে যে, মানসিংহের বিরুদ্ধে কথা কহে।

হায়! কয় দিনের সুখ তিলোত্তমা! সেই শৈলেশ্বরমন্দিরে জগৎসিংহের মোহনরূপ প্রথম দর্শন। তাহার পর পক্ষব্যাপী নিদারুণ দুশ্চিন্তা। পক্ষ পরে কিয়ৎকালের নিমিত্ত হৃদয়বল্লভের সহিত আলাপ; সঙ্গে সঙ্গে অচিন্তনীয় বিপদ্। পাঠানগৃহে বাস, সতীত্ব, ধর্ম্ম, জীবন ও পবিত্রতা-নাশের নিরন্তর আশঙ্কা। অসম্ভাবিত উপায়ে ওসমানের অঙ্গুরীয়-সাহায্যে মুক্তিলাভ। কারাগারে যুবরাজের সেই শেলোপম কঠোর বাক্য—'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা! এখানে কেন? আয়েষার কৃপায় মুক্তি; সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মনস্তাপ হেতু ভয়ানক পীড়া—মরণাপন্ন দশা। আবার অভিরাম স্বামীর আহ্বানে জগৎসিংহের দয়া—অনুগ্রহ—চরণে স্থানদান, এত কষ্ট—অসহনীয় যাতনাপরম্পরাভোগের পর সেই প্রার্থিত পুরুষরত্নের সহিত পবিত্র চির-সম্মিলন! কিন্তু হায়! কয় দিনের সুখ! সুখের প্রথম সোপানেই এই বাধা! বহু যত্নার্জ্জিত, আয়াসলব্ধ রত্ন বক্ষে ধারণ করিতে না করিতেই এই ভয়ানক দুর্গতি। সে সাধের সৌধ সহসা ভস্মীভূত হইল! নিরীহ তিলোত্তমা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় কাতর। হায়! কয় দিনের সুখ।

তিলোত্তমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। অবেণী-সংবদ্ধ নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি ধূলায় লুটাইতেছে; সেই স্বর্ণকান্তি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে; দেহে মলা, অঙ্গ ভূষণ-হীন, চক্ষুতেও জল নাই। তিলোত্তমা অধোমুখে ভূ-শয্যায় শয়ানা।

তিলোত্তমা ভাবিতেছেন, বিপদ্ সংসারে অনেক হয়; কিন্তু অনেক বিপদেরই প্রতীকারও তো সম্ভব। এ ঘোর বিপদের কি কোন প্রতীকার নাই? বসিয়া রোদন করা, ভাবিয়া দিন কাটান, শুইয়া শোকের যন্ত্রণা-ভোগ, ইহাতে কাহার কি উপকার? আমার জীবনের জীবন লৌহশৃঙ্খলনিবদ্ধ হইয়া কারাগারে; আর আমি ঘরে শুইয়া কষ্ট পাইতেছি; তাঁহার ক্লেশের অপেক্ষা বহুগুণে কষ্ট-ভোগ করিতেছি। কিন্তু তাহাতে কি কাজ হইতেছে। এরূপ উদ্বেগে ফল কি? যথাসাধ্য প্রতীকারের উপায় চিন্তা করা উচিত। অতঃপর তাহাই করিব।

তিলোত্তমা উঠিয়া বসিলেন, ডাকিলেন, "কে আছ এখানে?"

এক জন দাসী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিল। তিলোত্তমা বলিলেন, "যে পেটিতে আমার দোয়াত, কলম, কাগজ থাকে, তাহাই আন।"

দাসী লেখ্য-সামগ্রী পূর্ণ একটি পেটিকা আনিয়া তিলোত্তমার সম্মুখে স্থাপন করিল এবং জিজ্ঞাসিল, "গা মুছাইয়া দিব কি? চুলগুলি গুছাইয়া দিব কি? চিলিমচি, ডাবোর, জল আনিব কি? কাপড় ছাড়িবেন কি?"

তিলোত্তমা বলিলেন, "এখন দরকার নাই, মা কোথায়?"

তিলোত্তমা 'মা' বলিলে বিমলাকে বুঝায়। বীরেন্দ্রসিংহের স্বর্গলাভের পর বিমলার প্রকৃত পরিচয় সকলে জানিতে পারিয়াছে। পরিচারিকার পরিচয়ে বাস করিলেও তিনি যে বীরেন্দ্রসিংহের

পরিণীতা মহিষী, এ কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে। কতলু খাঁর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গড়-মান্দারণে ফিরিয়া আসার পর সকলেই তাঁহাকে মা, রাণী মাতা প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিতেছে। বিমলা বলিয়া তাঁহাকে আর কেহ ডাকিতে সাহস করে না। স্বয়ং তিলোত্তমাও তাঁহাকে মা ভিন্ন আর কোন বাক্যে সম্বোধন করেন না। তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন, "মা কোথায়?"

দাসী উত্তর দিল, "তিনি উপরের বারান্দায় বসিয়া আশমানীর সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া দিব কি?"

তিলোত্তমা বলিলেন, "না। তুমি এখন যাও। মাকে বলিও, এখন তাঁহার আসিবার প্রয়োজন নাই। অল্পক্ষণ পরেই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব।"

দাসী আনন্দে প্রস্থান করিল। চারিদিন পরে তিলোত্তমা আজি উঠিয়া বসিয়াছেন, কথা কহিয়াছেন, লেখার সরঞ্জাম লইয়াছেন, হয় তো লেখা-পড়াও কিছু করিবেন। শুভ সংবাদ। বিমলাকে এই আনন্দবার্ত্তা জানাইবার জন্য সে ধাবিতা হইল।

তিলোত্তমা কাগজ, কলম ও দোয়াত লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা পাঠ করিলেন,—

"নবাবনন্দিনি,—

"বড়ই কঠোর সংবাদ দিবার জন্য তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। মনে পড়ে তোমার? সেই দিন বিবাহ-রাত্রিতে তুমি বসুন্ধরার যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে হৃদয়মধ্যে রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলে, আমার কপালদোষে, তিনি আজ বন্দী—লৌহশৃঙ্খলে নিবদ্ধ—কারাগারবাসী। মহারাজ মানসিংহ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া সেই গুণময়কে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

"বিপদে পড়িলে লোকে আত্মীয়-স্বজনের কথা আগে মনে করে। তোমার সহিত আমার দুই দিনের পরিচয়। কিন্তু তাহাতেই বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের পরমাত্মীয়। তাই বুঝিয়াছি বলিয়াই এই দুঃখের সংবাদ তোমার নিকট পাঠাইতেছি।

"সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ার অল্পকাল পরেই তুমি যুবরাজকে এক পত্র লিখিয়াছিলে। সে পত্র যুবরাজ অতি মূল্যবান সম্পত্তিবোধে সাবধানে ও সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বার বার সে পত্র আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। এখনও সে পত্র রত্ন-পেটিকার মধ্যগত হইয়া আমার নিকট রহিয়াছে।

"সে পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে, 'যদি কখনও অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তাহা হইলে আয়েষাকে স্মরণ করিবে।' রাজপুত্র এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বার বার আয়েষাকে স্মরণ করিতেছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

"যুবরাজ তোমার প্রেমাস্পদ, এ কথা বোধ হয়, তুমি আর এখন কাহারও নিকট লুকাইতে চাহিবে না; কত লতিকাই সহকারকে আশ্রয় করে; কে তাহাকে তাড়ায়? এক আশ্রয়ে অনেকেই গলা জড়াজড়ি করিয়া নাচে, খেলে, সুখের বাসা পাতিয়া লয়।

"আমি বুঝিয়াছি, তুমি রমণীরত্ন—এ সংসারে তোমার তুলনা নাই। আমার ভাগ্য যে, তোমার ন্যায় দেবীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। তুমি নিষ্কাম প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি।

"যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তোমাকে পত্র লিখিবার নিমিত্ত যুবরাজকে তুমি অনুমতি দিয়াছ। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকিলে তিনি যে নিশ্চয়ই তোমাকে পত্র লিখিতেন, তাহার ভুল নাই।

"বর্ত্তমান বিপদে তুমি কি করিবে বা করিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি না; সে সম্বন্ধে তোমাকে আমি কোন কথা বলিতেছি না। এ জগতে যাঁহারা রাজপুত্রের কল্যাণ কামনা করেন, তুমি বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। এই জন্য তোমার নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য এ পত্র লিখিলাম।

"অন্য কোন সুখ-দুঃখের সংবাদ জানাইবার সময় এ নহে।

"যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে যখন ইচ্ছা আমাকে পত্র লিখিও, সাক্ষাতের প্রয়োজন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সে সম্বন্ধে তুমি যাহা ব্যবস্থা করিবে আমি তাহারই সুযোগ করিয়া লইব। ইতি

দুঃখিনী
তিলোত্তমা"

পত্র পাঠ করিয়া তিলোত্তমা তাহার উপর শিরোনাম লিখিলেন—"নবাব-নন্দিনী আয়েষা।" আর এক পার্শ্বে লিখিলেন,—"গড়মান্দারণ হইতে।"

যথানিয়মে পত্র মোহরাঙ্কিত ও সূত্রনিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর সেই পত্রহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষমধ্যে দুইবার পরিভ্রমণ করিলেন। সহসা একবার স্থির হইয়া আপন মনে বলিলেন, "কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে, কল্যই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে।"

যাহারা চিরদিন শান্ত, সুশীল, নিরীহ ও পরাজ্ঞাবহ, তাহারা কখন কখন অবস্থাবিশেষে পড়িয়া সহসা স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মময়তা, একাগ্রতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় প্রদান করে। ইতিহাসে ও লোকসমাজে এতাদৃশ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। কেন সহসা মানবচরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ্‌গণের বিচার্য্য। ধীরা, বিনম্রস্বভাবা, সতত পরমুখাপেক্ষিণী তিলোত্তমা সহসা দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধা হইলেন।

পত্রিকা-হস্তে তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নূতন নবাব

উড়িষ্যার স্বর্ণগড়ের দুর্গে পাঠানগণ এখন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। খাজা সোলেমান খাঁ ও খাজা ওসমান খাঁ—পরলোকগত নবাব কতলু খাঁর এই পুত্রদ্বয় এবং পালিতা কন্যা আয়েষা প্রভৃতি পুরমহিলাগণ এখন নিশ্চিন্তভাবে স্বর্ণগড়ে অবস্থান করিতেছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাততঃ সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে।

পরলোকগত নবাব কতলু খাঁর দুই পুত্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সোলেমান ও ওস্‌মান উভয়ের মধ্যে রাজ্য সম্বন্ধে পাছে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় মহারাজ মানসিংহকৃত সন্ধি অনুসারে বৃদ্ধ মন্ত্রী খাজা ইষার হস্তে রাজ্যপরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী স্বকীয় কর্ত্তব্য অতীব সাবধানতার সহিত নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষতা হেতু কোন দিকেই অসন্তোষ প্রকাশের কোন অবসর থাকিতেছে না, সকলই সুনির্ব্বাহিত হইতেছে।

সকলই ভাল চলিলেও মনুষ্য-হৃদয় দুরাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় আঘাতে অনেক সময়েই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক অসন্তোষের উৎপাদন করিয়া অনেক অনাগত যাতনাকে ডাকিয়া আনে। নবাব কতলু খাঁর দুই পুত্রের প্রকৃতি একান্ত বিভিন্নভাবাপন্ন। নির্ব্বিবাদে উৎকৃষ্ট সুরাসেবন ও সুন্দরীকুলের সংসর্গে কালপাত করিতে পারিলেই সোলেমান জীবনের সকল প্রয়োজন সফল হইল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি আপনার বাসনানুরূপ পদার্থ-সমূহে পরিবৃত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে কালপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুজ ওস্‌মান এই সকল ইন্দ্রিয়সুখের অন্বেষণ নিতান্ত নীচ কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া, বীরের হৃদয় প্রাপ্ত হইয়া এবং পাঠান-নরপতির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অসিচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়া নারীগণের মধ্যে সুরাপহৃত-চেতনাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা নিতান্ত হীনতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ওস্‌মান নিতান্ত মানসিক ক্লেশে কালপাত করিতেছিলেন। মোগলগণ এখন ভারতের সম্রাট; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে ওস্‌মানের হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি বিবেচনা করিতেন, দিল্লীর সিংহাসনে পাঠানগণই সুলতান ছিলেন; কুতুবউদ্দীন স্বীয় বাহুবলে হিন্দুগণের হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ করেন এবং অমিতপ্রতাপে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল বাবর বাহুবলে পাঠান ভূপতিকে বিচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সেই মোগলেরাই যে ভারতবর্ষের ন্যায়সঙ্গত ও অবিসংবাদিত ভূপতি, এরূপ বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই। পাঠানগণের স্বত্ব মোগলগণের পূর্ব্বাগত। ভাগ্যদোষে পাঠানগণ এখন হীনদশাপন্ন হইলেও, পুনরায় ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে তাহাদের উন্নত অবস্থা না ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হীনাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা বা তাহার প্রতীকারের কোন উপায় না করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ওস্‌মান মনে করিতেন।

বর্ত্তমান সন্ধির ব্যবস্থায় এই বীরের হৃদয় একদিনও প্রসন্ন ছিল না। মহারাজ মানসিংহের দ্বারা সম্প্রতি যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়া ওস্‌মান মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন, কোথায় কবে সন্ধি-বন্ধন চিরস্থায়ী হয়? বর্ত্তমান সন্ধির নিয়ম পাঠানের দোষেই হউক আর

মোগলের দোষেই হউক, নিশ্চয়ই অচিরে ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইহাই ওস্‌মানের স্থির বিশ্বাস ছিল। নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু, চারিদিকে নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাব, যুদ্ধার্থ মানসিংহের প্রভৃত আয়োজন ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সন্ধি করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কারণ অন্তরিত হইলেও সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এরূপ কখনই সম্ভাবিত নহে।

ওস্‌মানের অন্তরে যে অসন্তোষ বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর অশান্তির আর এক প্রবল কারণ আয়েষা। সেই লাবণ্য-প্রতিমা তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি সে সুন্দরীর কৃপার অধীন হইয়াছে; কিন্তু সেই ভূলোক-দুর্লভ নারী তাঁহার নহেন, তিনি প্রতিদিন তাঁহাকে আপনার হৃদয়ে স্বল্পমাত্র স্থান দানে অশক্ত। যে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল শাসনে ওস্‌মানের হৃদয় নিয়ত উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, যে দুরাশার অদম্য উত্তেজনায় তিনি ভারতের সিংহাসনলাভের কল্পনায় প্রমত্ত হইতেও কুণ্ঠিত হন না, সে সকল বাসনাই আয়েষার অণুমাত্র অনুগ্রহের সহিত অবিলম্বে বিনিময় করিতে তিনি প্রস্তুত। তথাপি সে সুন্দরী তাঁহাকে প্রাণে স্থান দিতে অক্ষম। হতাশ প্রেমিকের এ অন্তর্জ্বালা অসহনীয়।

কে সে আয়েষা?—কতলু খাঁর পালিতা কন্যা। আয়েষা নবাব সাহেবের কাশ্মীরী বেগম সাহেবার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আয়েষার ছয় মাস বয়সের সময় তাঁহার জননী সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামী সেই শিশুকন্যাকে আপনার সহোদরার নিকট প্রেরণ করেন। অল্পকাল পরে আয়েষার পিতাও শমনসদনে গমন করেন। কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীনা আয়েষার কোন অভাবই থাকিল না। নবাব কতলু খাঁ এই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে বড়ই স্নেহের নয়নে দর্শন করিলেন। বেগম সাহেবার আর সন্তান ছিল না। তিনি এই সুকুমারীকে আপন কন্যাজ্ঞানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবাব সাহেবের আরও অনেক পুত্রকন্যা থাকিলেও আয়েষার প্রতি তাঁহার মমতা এতই বাড়িতে লাগিল যে, আয়েষা তাঁহার ঔরস-সন্তানদিগের অপেক্ষা অধিক কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকিলেন। আয়েষাকে সাধারণে নবাবপুত্রী বলিয়াই জানিল। স্বয়ং আয়েষাও আপনাকে কাশ্মীরী বেগম সাহেবার গর্ভোৎপন্ন নবাব-নন্দিনী বলিয়াই জানিলেন।

ওস্‌মান ও আয়েষা প্রায় সমবয়স্ক। নবাব-অবরোধে এই বালক-বালিকা একত্র আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক করিতে করিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আয়েষার রূপ অতুলনীয়, শিক্ষা ও সাহস সুবিখ্যাত, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অসাধারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত ওস্‌মান সেই সুন্দরীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বাল্যকালের সেই অনুরাগ যৌবনের সমাগমে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। ওস্‌মান ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে আয়েষার দাস হইয়া উঠিলেন।

নবাব কতলু খাঁ মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে, স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, আয়েষাকে এরূপ ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আয়েষা যেরূপ ধনশালিনী হইয়াছিলেন, কতলু খাঁর আর কোন ঔরস-কন্যার তাহার অনুরূপ বিত্ত ছিল না। কতলু খাঁ জীবনকালে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরী বেগম সাহেবা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ওস্‌মান এই সুন্দরীর প্রতি একান্ত প্রণয়ানুরাগী। আয়েষার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারাদির আলোচনায় তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নবীনাও ওস্‌মানের প্রতি আসক্ত। প্রত্যুত আয়েষা সর্ব্বান্তঃকরণে ওস্‌মানের সুখ-দুঃখে যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহাতে সহজেই মনে হইত, ওস্‌মানের হৃদয়হারিণী এই মোহিনীও ওস্‌মানকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আয়েষার অনুরাগ যে ভ্রাতৃস্নেহের সীমা অতিক্রম করে নাই, ওস্‌মানকে স্নেহময় অগ্রজ জ্ঞান করিয়া আয়েষা অবিচলিত চিত্তে তাঁহাকে ভালবাসিতেন, এ কথা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। নবাব ও বেগম মনে করিয়াছিলেন, আয়েষার স্বাধীন বিত্ত যথেষ্ট রহিল, অতঃপর যদি ওস্‌মান তাঁহার পাণি-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আয়েষার সুখ-সৌভাগ্য সম্পূর্ণ হইবে। এইরূপ সময়ে নবাব সাহেবের লোকান্তরে গতি হইল।

আয়েষার প্রণয় কতদূর প্রগাঢ়, তাহা ওস্‌মান জানিতেন। ওস্‌মান আপনার আন্তরিক প্রেমের কথা কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্ত করিতে না করিতে আয়েষা সুস্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁহার প্রতি স্বীয় হৃদয়ভাব বুঝাইয়া দিতেন। আয়েষার মুখের সেই সকল কথা শেলের ন্যায় ওস্‌মানের

হৃদয় বিদ্ধ করিত। তিনি নীরবে সেই দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতেন।

এইরূপ যাতনা-ক্লিষ্ট ওস্মান একাকী অপরাহ্ন-কালে স্বর্ণগড়ের দুর্গমধ্যস্থ এক বিস্তৃত কক্ষে বসিয়া আছেন। এক দিকে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল দংশন, আর এক দিকে নিষ্ফল প্রণয়ের তীব্র যাতনা। ওস্মান নিদারুণ ক্লেশে জীবনকে ভারভূত বলিয়া মনে করিতেছেন। সহসা নকিব ফুকরাইয়া উঠিল। ওস্মান উঠিয়া কক্ষের প্রবেশ দ্বারে গমন করিলেন। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মন্ত্রী ইষা খাঁ সমাগত হইলেন। ওস্মান তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ ইষা খাঁও বিহিত বিধানে ওস্মানকে প্রভুর ন্যায় সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ে আসনে উপবিষ্ট হইলে ওস্মান জিজ্ঞাসিলেন, "কি অভিপ্রায়ে আপনার আগমন হইল? নূতন সংবাদ কি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "জগৎসিংহের কারাদণ্ডের সংবাদ বোধ হয় নবাব সাহেবের অবিদিত নাই?"

ওস্মান বলিলেন, "সে সংবাদ আমি পাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "একটু আছে বলিয়া আমার মনে হয়। সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহ আমাদের সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন এবং যে সন্ধি অনুসারে এখনও উভয় পক্ষ কার্য্য করিতেছেন, আমি জ্ঞাত আছি, ইহা আকবরশাহের অনুমোদিত নহে। মানসিংহের এই সন্ধি আকবর অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না সত্য; কিন্তু ইহা যখন তাঁহার সন্তোষজনক হয় নাই, তখন তিনি ইহার অন্যথা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবেন না, এমন নহে।"

ওস্মান বলিলেন, "জগৎসিংহের অবরোধের সহিত এ ব্যাপারের কি সম্বন্ধ আপনি অনুমান করিতেছেন?"

মন্ত্রী বলিলেন, "একটু আছে বলিয়া আমি অনুমান করি। জগৎসিংহ যখন আমাদের হস্তে বন্দী ছিলেন, তখন বোধ হয়, আমাদের ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ অসন্তোষের কোন কারণ ঘটে নাই, আমি মনে করি, তিনি আমাদের উপর বিরক্ত না থাকাই সম্ভব। সকল কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদিগের সহিত শত্রুতা ঘটাইতে তাঁহার ইচ্ছা না হইবার আরও কারণ থাকিতে পারে।"

কি মনে করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী কথার শেষভাগ মুখ হইতে বাহির করিলেন, ওস্মান তাহা বুঝিতে পারিলেন জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার আসক্তি স্মরণ করিয়াই যে ইষা খাঁ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তাহা ওস্মানের বুঝিতে বাকী থাকিল না। তাঁহার হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। অতি কষ্টে হৃদয়ভাব সংবৃত করিয়া ওস্মান কহিলেন, "আপনার অভিপ্রায়, জগৎসিংহ আমাদের অনুকূল থাকিলে এবং আকবরের নিকট আমাদের সম্বন্ধে হিতজনক মতামত প্রকাশ করিবার অবসর পাইলে, এ সন্ধি ঠিক থাকিতে পারে। জগৎসিংহ কারাগারে থাকিলে আমাদের হিতচেষ্টা করিবার সুযোগ পাইবে না। কেমন, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায় নহে?"

বৃদ্ধ সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দিলেন, "অধীন এইরূপ মনে করে।"

ওস্মান কহিলেন, "আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও আমাদের পিতৃতুল্য সম্মানভাজন; সুতরাং আপনাকে কোন তিরস্কার করিতে আমাদের অধিকার নাই; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সন্ধির দ্বারা আমাদের কি লাভ হইয়াছে? আমার বাহুবলে দেহের শোণিত ও রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলাম। সেদিনও ধারপুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর সমগ্র মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের সীমা পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার হইয়াছিল। সন্ধির বলে সেই নব-বিজিত রাজ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু জগন্নাথের মন্দির ও সমস্ত পুরী জেলা মোগলদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এরূপ সন্ধি নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। আকবর যদি ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে আমি ক্ষোভের কোন কারণ দেখিতেছি না তো।"

বৃদ্ধ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি সে সম্বন্ধে নবাব সাহেবের সহিত কোন তর্ক করিব না; কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি, সম্প্রতি আমরা দুর্ব্বল।"

ওস্মান বলিলেন, "সত্য, আমরা সম্প্রতি মানসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত বলশালী নহি। আপনি সে অভাব দূর করিবার কোন চেষ্টা করিতেছেন কি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "আপনার অবিদিত নাই, আভ্যন্তরিক রাজকার্য্যের নানাপ্রকার সুব্যবস্থায়

আমাকে এতই মনঃসংযোগ করিতে হইয়াছে যে, অন্য কোন চিন্তার আমার এখন অবসর নাই।”

ওস্মান বলিলেন, “আপনি রাজকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকুন। এ প্রবীণ বয়সে যুদ্ধ-বিগ্রহ আপনার আর ভাল না লাগিবারই কথা। সন্ধি ও শান্তি এ সময়ে আপনার প্রধান প্রার্থিত অবস্থা হওয়াই সম্ভব। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি বর্ত্তমান সন্ধি কেবল অপমানজনক বলিয়াই মনে করিতেছি। সুযোগ পাইলে এই ঘৃণাজনক সন্ধি-বন্ধন পদদলিত করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আমি ক্ষান্ত হইব না। সে জন্য যে কিছু আয়োজন আবশ্যক, আমি অতঃপর তাহার ব্যবস্থা করিব এবং সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হইলে আপনার নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইব।”

ইষা খাঁ বলিলেন, “সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমি এক্ষণে বলিব না। আমার আপাততঃ আরও বক্তব্য আছে। মহারাজ মানসিংহ শীঘ্র পুরী আগমন করিবেন।”

“উত্তম। কাফেরগণ কুৎসিৎদর্শন কাষ্ঠখণ্ডকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে। মোগল-শ্যালক মানসিংহও কি ঈশ্বর-পূজার অভিপ্রায়ে পুরী আসিতেছেন?”

মন্ত্রী। সম্ভব। তিনি বিশেষ সমারোহে আসিবেন।

ওস্। ইচ্ছা তাঁহার। যখন সন্ধিসূত্রে আমরা পুরী ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন সেখানে বাঙ্গালার সুবেদার মানসিংহই সমারোহে আসুন অথবা বাঁকুড়ার দরিদ্র প্রজা ভিক্ষা করিতে করিতেই আসুক, আমাদিগের তাহাতে কি?

মন্ত্রী। আমাদের তাহার সহিত একটু সম্বন্ধ আছে। মহারাজকে পুরী যাইতে হইলে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের অধিকারের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

ওস্। তিনি সচ্ছন্দে যাইবেন, রাজপথ অবাধ। তিনি কেন, সকলেই সে পথ দিয়া অনায়াসে যাইতে পারেন।

মন্ত্রী। সে সময়ে আমাদের একটু কর্ত্তব্য আছে।

ওস্। কি?

মন্ত্রী। তিনি আমাদের অধিকারে আসিলে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য।

ওস্মানের মুখ যেন একটু মেঘাচ্ছন্ন হইল জিজ্ঞাসিলেন। “কেন?”

মন্ত্রী। আমরা তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ। তাঁহাকে সম্মান না করিলে বাদশাহের অপমান হইবে। মানসিংহ বাদশাহের প্রতিনিধি।

ওস্। কিরূপ সম্মান দেখাইতে হইবে?

মন্ত্রী। আমাদের অধিকারের সীমা পর্য্যন্ত আপনাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে হইবে।

ওস্মান আসন ত্যাগ করিয়া, কিয়ৎকাল কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিলেন। তাহার পর সহসা বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “এ অপমান বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। সত্য বটে, মানসিংহ একজন জগৎবিখ্যাত বীর; সত্য বটে, মানসিংহের বাহুবলে আকবরের এত গৌরব, সত্য বটে মানসিংহ আকবরের কুটুম্ব; সত্য বটে, মানসিংহ একজন করপ্রদ রাজা, তথাপি সে আকবরের দাস। আমরা অদ্য হীনবল হইলেও স্বাধীন নরপতি আকবরের সমকক্ষ। আমরা ঘটনাচক্রে দুর্ব্বল হইয়াছি বটে, তথাপি এ কাল পর্য্যন্ত আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই আসিতেছি। জয়-পরাজয়ের কথা ছাড়িয়া দিউন; কিন্তু কোন কারণেই আমরা কখনই কাহারও পদানত হই নাই। এখনও উড়িষ্যায় আমরা স্বাধীন রাজা। এ অবস্থায় আকবরের একজন প্রতিনিধির পাদুকা বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে আমরা কখনই প্রস্তুত নহি।”

মন্ত্রী কহিলেন, “এ সম্বন্ধে মহারাজের এক পত্র আছে।”

তিনি কাবার মধ্য হইতে এক পত্র বাহির করিয়া ওস্মানের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই—“মহারাজ মানসিংহ স্বধর্ম্ম-পালনের জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন। তিনি ভরসা করেন, উড়িষ্যার নবাবদিগের অধিকারে প্রবেশ করিলে নবীন নবাবদ্বয় তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।” পত্র ইষা খাঁর উদ্দেশে লিখিত।

ওস্মান পত্রপাঠ করিয়া তাহা মন্ত্রীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন;—বলিলেন, “এ পত্রের যেরূপ উত্তর প্রদান আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা আপনাকে কল্য জানাইব। মানসিংহের এ সাহস বড়ই বিরক্তিজনক।”

খাজা ইষা খাঁ বলিলেন, “আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি। বিদায়কালে একটা কথা আমি নবাব সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।”

“বলুন”।

“মহারাজ মানসিংহ মোগল-পাঠানে যে সন্ধি

স্থাপন করিয়াছেন, তাহা জগৎসিংহের উদ্‌যোগেই হইয়াছিল। এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আর এক কথা, সম্প্রতি সে সন্ধির বলে আমরা উৎকলে স্বাধীন অধিকার লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদিগকে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে, মহারাজ মানসিংহের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিতে হইয়াছে, যথেষ্ট উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার প্রদত্ত খেলোয়াৎ অঙ্গে ধারণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত হইতে হইয়াছে। আমরা বিধিমতে মহারাজ মানসিংহের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, উড়িষ্যায় স্বাধীন অধিকার ভোগ করিতে পাইয়াছি। এ সকল কথা এত শীঘ্র না ভুলিলেই ভাল হয়।"

ওস্‌মান বলিলেন, "সে কথা আমি একবারও ভুলি নাই; সে কলঙ্কের কথা আমার প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ কুকীর্ত্তি শীঘ্রই লুপ্ত হইবে।"

খাজা ইষা খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "যত দিন অন্যরূপ অবস্থান্তর না ঘটিতেছে, তত দিন মহারাজ মানসিংহকে বাদশাহের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। তাহার অন্যথা হইলে আবার বাদশাহের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আমরা এখন কোনরূপ বিরোধ করিতে অক্ষম। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন। আমার দেহের অবস্থা ভাল নহে, বার্দ্ধক্য ও পীড়া উভয় কারণেই আমি কাতর। বোধ হয়, আর অধিক দিন আমি বাঁচিব না। যতদিন আছি, তাহার মধ্যে নবাবদিগের অবস্থান্তর দেখিতে না হইলেই সুখী হইব। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সমুচিত শিষ্টাচারাদির পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

ধীরে ধীরে চিন্তাক্লিষ্ট ওস্‌মান সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মানসিংহের লিপি—আদেশসূচক পরোয়ানা বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, পাঠানগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে কি কেবল পাঠানদিগের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে? মোগলগণ কি এই সন্ধির দ্বারা একটুও উপকৃত হয় নাই? আমাদিগের সহিত যুদ্ধে কি মানসিংহের ক্ষতি হইতেছিল না? স্বর্গীয় নবাব ধারপুরের যুদ্ধে মানসিংহকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা জগৎসিংহকে হাতে পাইয়া নিপাত করিলেও করিতে পারিতাম। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে মানসিংহের অনেক সময় নষ্ট হইত। সেই সময়ের মধ্যে আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিলে আমরা সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিতে না পারিতাম, এমন কথা কে বলিতে পারে? সহসা নবাব বাহাদুরের মৃত্যু হইল। আমরা সহসা-সংঘটিত এই বিপদে নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম।

সে সময় যুদ্ধ উচিত নহে বলিয়াই সন্ধি করা হইল। পাঠানগণ ভীত হইয়া কখনই সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হয় নাই। রণে তাহারা কখনই অক্ষমতা প্রদর্শন করে নাই; মোগলদিগের সৈন্যনাশে তাহারা কখনই ক্ষান্ত হয় নাই। মানসিংহের পুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে পিতৃ শিবিরে যাইতে দিয়া তাহারা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এরূপ স্থলে তাহাদের প্রতি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়া এবং তাহাদের বশ্যতা অবলম্বনে তাহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া মানসিংহ ভাল করেন নাই। এরূপ পত্র না লিখিয়া তিনি যদি লিখিতেন, 'নবীন নবাবেরা আমাদিগের আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সুখী হইব', তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা উপঢৌকনাদিসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম এবং তাঁহার সহিত প্রীতিবর্দ্ধনের প্রয়াস করিতাম।

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় প্রপীড়িত ওস্‌মানের চরণদ্বয় যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে বহন করিয়া অন্তঃপুরের একদেশে লইয়া চলিল। ওস্‌মান ভাবিতে লাগিলেন, "না, তাহা হইবে না; আমার অগ্রজ তো বিষয়ব্যাপারে উদাসীন। তিনি কোথাও যাইবেন না; আমিও যাইব না। এ পক্ষ হইতে কোন এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমাদের

অধিকারে প্রবেশস্থলে মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবে; আবশ্যক হইলে তাঁহার খাদ্য-দ্রব্যাদির সংকুলান করিয়া দিবে। উপঢৌকনাদি কিছুই দেওয়া হইবে না।"

অন্যমনস্ক ওস্মান চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোন্ দিকে, কোথায় ও কি অভিপ্রায়ে তিনি গমন করিতেছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। গর্ব্বিত মানসিংহের পুত্রকে হাতে পাইয়া বিনাশ না করা অন্যায় হইয়াছে। আয়েষা তাহার প্রতি অনুরাগিণী সত্য বটে, সে আয়েষার প্রতি আসক্ত নহে; কিন্তু তাহাতে আমার লাভ কি? তাহার জীবন থাকিতে আয়েষা কখনই তাহাকে ভুলিবে না। সে মরিলে আয়েষা তাহাকে ভুলিতে পারে এবং তখন সেই সুন্দরীর হৃদয়ে আমার স্থান হইতে পারে। জগৎসিংহ আমার শত্রু, তাহাকে বন্দী করিয়াও সজীব ছাড়িয়া দিয়াছি; দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ঘটনাক্রমে তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিয়াছি কি? না— না—কখন না। জগৎসিংহ আমার পরম শত্রু। সে নয়নে না পড়িলে আয়েষা কখনই তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইত না। সে না মরিলে আয়েষার অনুরাগ কখনই হ্রাস হইবে না। ছলে হউক, বলে হউক, জগৎসিংহকে বিনাশ করাই আমার ব্রত।

"ওস্মান!"—সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে রমণী কণ্ঠে শব্দ হইল, "ওস্মান!"

ওস্মানের সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি শব্দাগমের অভিমুখে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনতিদূরে এক প্রৌঢ়বয়স্কা সজীব দেবী-প্রতিমা। তিনিই নবাব কতলু খাঁর কাশ্মীরী বেগম—ওস্মানের বিমাতা—আয়েষার মাতা। দর্শনমাত্র অতীব ভক্তির সহিত ওস্মান তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। বেগম সাহেবা কহিলেন, "তোমারই কথা আমি এখন ভাবিতেছি। অদ্য তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইব স্থির করিয়াছিলাম। তুমি অন্দরে আসিলে তোমাকে আমার নিকট পাঠাইবার জন্য তোমার জননীকে বলিয়া রাখিয়াছি।"

ওস্মান সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, "আমায় প্রতি কি আজ্ঞা?"

বেগম সাহেবা উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন, "এমন করিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিব কিরূপে? বড় কঠিন বিষয়; তোমাকে ধীরভাবে শুনিতে হইবে। গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত আর কেহই কোন বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিতে পায় না, ইহাই নবাব-অন্দরের নিয়ম। তোমাকে আমি গর্ভের সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করি; আমার কক্ষে বসিয়া কয়টি প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

ওস্মান একটু চিন্তিতভাবে কহিলেন, "আপনি আমার বিমাতা হইলেও চিরদিনই আমি আপনাকে গর্ভধারিণী জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। আপনি আয়েষার মাতা; সে জন্য আমারও পূজার পাত্র। মহালের মধ্যে প্রবেশ করা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু আপনার আজ্ঞা হইলে, আমাকে কক্ষের মধ্যেও প্রবেশ করিতে হইবে।"

বেগম সাহেবা কহিলেন, "আইস পুত্র! আমি অনুমতি করিতেছি, ইহাতে নিয়ম-লঙ্ঘনের দোষ হইবে না। আর বাবা, নিয়মাদির এখন তুমিই কর্ত্তা। আইস।"

অবনতমস্তকে ওস্মান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বেগম সাহেবা অদূরে এক গালিচার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আয়েষা সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।"

ওস্মানের হৃদয় একটু দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল;—বলিলেন, "বলুন।"

বেগম সাহেবা কহিলেন, "তোমার স্মরণ হয় কি না, বলিতে পারি না, আয়েষা পিতৃব্য-পরিত্যক্ত প্রভূত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। সে একটা রাজার দৌলৎ।"

ওস্মান। বহুকাল পূর্ব্বে এরূপ একটা কথা শুনিয়াছিলাম; এখন তাহা ভাল মনে হয় না।

বেগম। বহুকাল পূর্ব্বে বটে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আয়েষার পিতৃব্য মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। আয়েষাকে তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী স্থির করিয়া পঞ্জাবের সুবেদার তোমার পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং আয়েষার পক্ষ হইতে তত্তাবৎ দখল লইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। স্বর্গীয় নবাব সাহেব আয়েষাকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারিলেন না; তিনি এখান হইতে লোক পাঠাইয়া সেই সমস্ত বিষয়-বিভবের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের পক্ষের যে লোক সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন,

আয়েষা এখন প্রাপ্তবয়স্কা। এখন তিনি মালিকরূপে হাজির না হইলে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যবস্থার কর্ত্তা তুমি। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, স্থির কর।

ওস্‌মান। এ সকল সংবাদ আপনি কেমন করিয়া পাইলেন?

বেগম। উজীর সাহেবের নিকট দূত আসিয়াছে।

ওসমান। আমি জানি, আয়েষা মহদ্বংশের কন্যা। আপনার ভাই কি কাজ করিতেন?

বেগম। আমার ভাই পঞ্জাবের সেনাপতি ছিলেন। আর যে ভ্রাতার সম্পত্তি আয়েষা পাইয়াছে, তিনি জায়গীরদার ছিলেন। আয়েষার মাতা সুবাদারের কন্যা।

ওস্‌মান। তাহা হইলে বুঝিতে হইতেছে, আয়েষার জননী মোগল ও পিতা পাঠান ছিলেন। এরূপ বিরূদ্ধ ঘটনা কিরূপে ঘটিয়াছিল মা?

বেগম। এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায়। বড় লজ্জার কথা; ছেলের কাছে আপনাদের প্রণয়ের কথা বলিতে মাথা কাটা যায়। তোমার পিতা পাঠান, আর আমি মোগল-কন্যা, এরূপ ঘটনা কিরূপে ঘটিল বাবা?

ওস্‌মান। সে কথা বুঝিলাম, কিন্তু আয়েষা এখন স্বর্গীয় কতলু খাঁর কন্যা হইয়াছেন। পাঠান-তনয়াকে, বিশেষতঃ কতলু খাঁর কন্যাকে মোগল সুবেদার বিষয় দখল করিতে দিবে কেন?

বেগম। সে বিষয়ে কোন ব্যাঘাত হইবে না। আয়েষার পিতা আকবর বাদশাহের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে বাদশাহের ফারমান লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। আয়েষা প্রকারান্তরে আকবরেরও পরিচিতা। বাদশাহ-দরবারে ও অন্দরে অনেকেই পরোক্ষভাবে আয়েষাকে জানেন।

ওস্‌মান। এক্ষণে আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন?

বেগম। আমি কিছু ইচ্ছা করি না; তুমি যাহা ব্যবস্থা করিবে, তাহাই হইবে। তবে তোমাকে বলা উচিত, আয়েষা পঞ্জাব যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

ওস্‌মান। কেন?

বেগম। তাহার শরীর ইদানীং ভাল হইতেছে না। এবার বাঙ্গালাদেশ হইতে আসার পর পিতার মৃত্যুহেতু শোকে হউক বা অন্য কোন কোন কারণেই হউক, আয়েষা সতত চিন্তাকুলা। দেখিতেছি, আয়েষার আহারে অপ্রবৃত্তি, বসন-ভূষণের পারিপাট্যে অমনোযোগ, সদা অপ্রফুল্ল ভাব। তাহার শরীরও শুষ্ক—মলিন হইতেছে। আয়েষা বলিতেছে, কিছু দিনের জন্য পঞ্জাবে যাইবার অনুমতি পাইলে সে এখন সুখী হয়। বোধ হয়, স্থান-পরিবর্ত্তনে তাহার শরীরের উপকার হইতে পারে।

ওস্‌মান। বড়ই চিন্তার কথা। আয়েষার বিষয়-বিভবের ব্যবস্থা যেরূপে হউক, করিলেও করা যাইতে পারিত। কিন্তু আয়েষা স্বয়ং এ স্থানত্যাগের অভিলাষিণী। মা, আয়েষা এ পুরী হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে সকলই অন্ধকার হইয়া যাইবে।

বেগম। তুমি আয়েষাকে বড় ভালবাস। স্বর্গীয় নবাব সাহেব আর আমি কতদিনই সাধ করিয়াছি, তোমাদের শুভমিলন দেখিয়া নয়ন জুড়াইব। নবাব স্বর্গে গিয়াছেন, অভাগী এখনও আছে। সে সাধ এখনও মিটিল না। কিসে কি হইল জানি না; দেখিতেছি আয়েষার এই ভাব, তুমিও সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত—অন্যমনস্ক। তুমি আর মহলের মধ্যে প্রবেশ কর না; যে আয়েষাকে সতত দেখিতে চাহিতে, তাহারও কোন সন্ধান লও না; তোমাদের এই ভাব আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট দিতেছে।

ওস্‌মান। মা, আমার কোন অপরাধ নাই; আমি আয়েষার জন্য জীবনপাত করিতে সতত প্রস্তুত। কিন্তু মা, বলিব কি, আয়েষা হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়াছে; সে আগুনে সে আপনি পুড়িবে, আমাকে পোড়াইবে, আর আপনাকেও সে জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। সে কথা এখন থাকুক। আয়েষার অসুস্থতার কথায় আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। কোথায় আয়েষা? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

বেগম। এক ঘড়ি পূর্ব্বে এখানেই ছিল। বোধ হয় এখন বাগানের ঘরে গিয়াছে। পঞ্জাব গমন সম্বন্ধে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা আমাকে কখন বলিবে?

ওস্‌মান। আমি আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনের ভাব জানিয়া আপনার নিকট

আমার অভিপ্রায় নিবেদন করিব। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

ওস্মান উত্থিত হইয়া এবং বিমাতার চরণে যথারীতি সম্মান বর্ষণ করিয়া ধীরে ধরে বৃক্ষ-বাটিকার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কালসর্প

উদ্বেগ-বিষ-জর্জ্জরিত ম্রিয়মাণ ওস্মান ধীরে ধীরে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। কোথায় আয়েষা? বাপীতটে সোপানাবলীর উপর তাঁহার প্রিয় বিশ্রামস্থান; কিন্তু সেখানে তো আয়েষা নাই। লতাকুঞ্জে শিলাসনে আয়েষা অনেক সময়ে একাকিনী বসিয়া থাকেন; কিন্তু কৈ, সেখানেও তো সে রূপের লতিকা এখন নাই। চম্পকবৃক্ষমূলে পাষাণ-আসনে উপবেশন করিয়া আয়েষা অনেক সময় বিশ্রাম করেন, কিন্তু কৈ, সেখানেও তো সে চম্পকবর্ণা নবীনা শোভা ছড়াইতেছে না। বিশাল বকুল-পাদপ-সমীপে অনেক সময় আয়েষা একাকিনী অবস্থান করেন; কিন্তু কৈ, সেখানেও তো সে সজীব অতুল ফুল ফুটে নাই। গোলাপ-কাননে কখন কখন আয়েষা গমন করিয়া পুষ্পচয়ন করেন; কৈ, সেখানেও তো সেই সকল কুসুমের শোভা-হারিণী সুন্দরী এখন নাই। তবে কোথায় আয়েষা?

কোন দিকেই কোন লোক নাই। চিন্তিত-চিত্তে ওস্মান উদ্যানমধ্যস্থ প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এক জন বাঁদী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং অতীব সম্মানসহকারে কুর্ণিশ করিয়া নিবেদন করিল, "নবাব-কন্যা এই ঘরে আছেন।"

ওস্মান অতি সাবধানে ভূপৃষ্ঠে পদ স্থাপন করিতে করিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া দুই পা পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। আয়েষা একাকিনী—শিথিলবসনা নিদ্রিতা। এরূপ অবস্থায় সে কক্ষে প্রবেশ করা অবৈধ বোধে হটিয়া আসিলেন, কিন্তু কি শোভা! সেই মর্ম্মর-প্রস্তরসমাচ্ছন্ন সুবিস্তৃত কক্ষে একটি মকমলের উপাধানে মস্তক-স্থাপন করিয়া ভূ-শয্যায় আয়েষা নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিশ্বের সকল শোভা, সৃষ্টির যাবতীয় রমণীয়তা, বিধাতার অপরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল, সকলই যেন নিদ্রিতা সুন্দরীর দেহে মিলিত হইয়া রহিয়াছে! সুন্দরী ম্লান, কথঞ্চিৎ বিশুষ্ক। তাহাতে কি আয়েষার সৌন্দর্য্যের কিছু লাঘব হইয়াছে?—না। দিবাকরের প্রখর আলোকের অপেক্ষা সুধাংশুর ম্লান সুস্নিগ্ধ রশ্মি যেমন অধিকতর রমণীয়, নাতিস্বচ্ছ আচ্ছাদনের অন্তরালে অবস্থিত সমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক যেমন অতিশয় নয়ন-বিনোদন, আয়েষার রূপরাশিও সেইরূপ একটু শুষ্কতার আবরণে অধিকতর শোভা বিকাশ করিতেছে। সুষুপ্তা সুন্দরীর কি মোহিনী ভঙ্গিমা!

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই ওস্মান বিগলিতবেশা শোভাময়ীকে দর্শনমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর একবারমাত্র হৃদয়-রাজ্ঞীর মাধুর্য্য-রশ্মি না দেখিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিতে তাঁহার সাধ্য হইল না। তিনি দ্বারের বাহিরে থাকিয়াই আয়েষার নিদ্রাচ্ছন্ন ভুবনমোহন কলেবর দর্শন করিবার নিমিত্ত নয়নসঞ্চালন করিলেন।

ও কি? আয়েষার বুকের উপর ও কি? নবীনার ঘন-কৃষ্ণ কেশ-রচিত বেণীর ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র ও কি পদার্থ আয়েষার দেহের এক দিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে? ওস্মান সেই পদার্থের এক দিক্ মাত্র দেখিতে পাইলেন। সে দিকের কিয়দংশ শ্বেত-পাষাণের উপর নিপতিত, পদার্থ ভূপৃষ্ঠে হইতে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে সুন্দরীর বক্ষো-দেশের উপর দিয়া দেহের অপর দিকে গিয়াছে। অপর দিক্ ওস্মানের চক্ষুতে পড়িল না। পদার্থ সূক্ষ্মাগ্র হইলেও ক্রমশঃ স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এ কি সামগ্রী? রজ্জু—কেশরজ্জু কি? এমন ভাবে আয়েষার বক্ষের উপর রজ্জু কেন বিন্যস্ত রহিয়াছে? ওস্মান বড়ই চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। শোভ ও সৌন্দর্য্যদর্শন-স্পৃহা তিরোহিত হইয়া গেল। আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; ত্বরিত দূরে চলিয়া আসিলেন। বাঁদী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; ওস্মান তাহাকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন।

বাঁদী নিকটে আসিলে ওস্মান কহিলেন, "নবাব কন্যা নিদ্রিতা, আমি ঘরের মধ্যে যাইতে পারিলাম না। তুমি সাবধানে ঘরের মধ্যে যাও, কোন শব্দ না হয়, দেখিয়া আইস, নবাব কন্যার বুকের উপর কি আছে। শীঘ্র আসিবে, আমি বড় চিন্তিত রহিলাম।"

বাঁদী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল

এবং তৎক্ষণাৎ সভয়ে প্রত্যাগত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! কি হইবে? নবাবকন্যা একটু নড়িলেই সর্ব্বনাশ ঘটিবে! তাঁহার বুকের উপর প্রকাণ্ড কালসর্প!"

ওস্মান ক্ষণেক বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিলেন; তাহার পর চরণের পাদুকা খুলিয়া বাঁদীকে বলিলেন, "তুমি স্থির থাক; কোন শব্দ করিও না।"

নিঃশব্দে ওস্মান গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ যমোপম কালসর্প আয়েষার পৃষ্ঠ, বামপার্শ্ব ও বক্ষোদেশ অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আয়েষার বাম পা একটু বিচলিত হইলে, তিনি একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে, তখনই সে কৃতান্ত ফণা বিস্তার করিয়া আয়েষার সুকোমল কলেবরে দংশন করিবে। কি ভয়ানক!

এখনও ওস্মান স্থিরবুদ্ধি। তিনি স্থির করিলেন, সর্পদংশনে আয়েষার জীবনের শেষ হইবে। বিষের জ্বালায় ছটুফট্ করিতে করিতে ভুবনের সাররত্ন মহাপ্রস্থান করিবে। বিধাতার এই অতুলনীয় বস্তুর এইরূপে জীবনাবসান হইবে! ওস্মান তাহা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিবে? অসম্ভব—অসম্ভব। যদি এই অস্বাভাবিক উপায়ে জীবলীলার পরিসমাপ্তি বিধাতার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে ওস্মানের কঠোর প্রাণ প্রস্থান করুক; তাহার পর যাহা হয় হইবে।

অতি সতর্কতায় ওস্মান সেই কালোপম ভুজঙ্গের পুচ্ছদেশে হস্ত প্রদান করিলেন এবং চক্ষুর নিমিষে হস্তোত্তোলন করিয়া পিছাইয়া আসিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কালসর্প যেন বৈদ্যুতিক শক্তিবলে বিচলিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফণা বিস্তার করিয়া আবর্ত্তিত হইল। ওস্মান আর একটু দাঁড়াইলেন। সর্প ফণা তুলিয়া ওস্মানকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে ভয়ানক শব্দ এবং সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম যুগল জিহ্বা বার বার নিঃসারিত হইতে লাগিল। ওস্মান দেখিলেন, সর্প আয়েষার নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া আসিয়াছে। তখন তিনি সুশিক্ষিত অহিতুণ্ডিকের ন্যায় কৌশলসহকারে দংশনসম্ভাবনা-বিরহিত দূর স্থানে থাকিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে সাপকে আরও দূরে সরাইয়া আনিলেন। তাহার পর সমুচিত সুযোগ বুঝিয়া অত্যদ্ভুত নিপুণতার সহিত সহসা সর্পের মুণ্ড আপনার দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। এই কথাগুলি বলিতে যত সময় গেল, কার্য্যে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও সময় লাগিল না। সর্প আপন শরীর দ্বারা ওস্মানের দক্ষিণ বাহু সবলে বেষ্টন করিতে লাগিল। অঙ্গুলিসন্নিহিত স্থান হইতে বাহুমূল পর্য্যন্ত সমস্ত হস্ত বহু বেষ্টনে সর্প-দেহাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ওস্মান সেই অবস্থায় জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং সর্পবেষ্টিত দক্ষিণ-বাহুর সঙ্গে সঙ্গে বামবাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "খোদা, তোমার মহিমা কে জানে! তুমি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা আয়েষার ন্যায় ভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের উপায় করিয়া দিলে, ইহা তোমার অপার করুণা।"

সর্পের পেষণে ওস্মানের বাহুতে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন।

দ্বারসমীপে সেই বাঁদী দাঁড়াইয়া এই সকল ভয়ানক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! ধন্য আপনি! কিন্তু এখন উপায়? সাপ কিরূপে হাত হইতে ছাড়াইতে হইবে?"

ওস্মান কহিলেন, "ছাড়াইবার উপায় নাই। এখন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে না পারিলে ছাড়ান হইবে না।"

বাঁদী বলিল, "কাহাকে ডাকিব? আপনি কেমন করিয়া ছাড়াইবেন? আপনার ডাহিন হাত তো বদ্ধ।"

ওস্মান কহিলেন, "তা হউক, বোধ হয় আমি বাম হস্তেই ছুরি দিয়া সাপ কাটিয়া ফেলিতে পারিব। কাহাকে ডাকিতে হইবে না, অপর এখানে কেই বা আসিবে? বেগমেরা এ কাণ্ড দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িবেন। তুমি আমাকে সাবধানে একখানি ছুরি আনিয়া দিতে পার? কেহই যেন জানিতে না পারে। খুব হুঁসিয়ার! শীঘ্র যাও।"

বাঁদী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল। সর্পের পেষণ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল।

ছুরি লইয়া বাঁদী ফিরিয়া আসিল। ওস্মান বলিলেন, "এ কাণ্ড তোমার দেখিয়া কাজ নাই।

তুমি ঘরের মধ্যে নবাবকন্যার নিকটে যাও। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিলেও যেন তিনি এ সকল কথা জানিতে না পারেন।"

বাঁদী বলিল, "যে আজ্ঞা। কিন্তু আমি আর একটু জাহাঁপনার নিকটে থাকিলে হইত না? আমার দ্বারা কোন কাজের দরকার হইবে না কি?"

ওস্মান কহিলেন, "বোধ হয় আর কোন দরকার হইবে না। যদি কোন প্রয়োজন হয়, আমি তোমাকে ডাকিব। তুমি নবাবকন্যার নিকট যাও। তাঁহার যেন শীঘ্র ঘুম না ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গিলেও তিনি যেন এ সকল ব্যাপারের কোন সংবাদ জানিতে না পান।"

বাঁদী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু নবাব সাহেব কি প্রকারে বাহুকে নাগপাশমুক্ত করেন, তাহা দেখিবার কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে পারিল না। দ্বারের ভিতর দিয়া সাবধানে ওস্মানের কার্য্য সে দর্শন করিতে লাগিল।

সবিশেষ দক্ষতার সহিত বাম হস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া ওস্মান সর্পদেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে অতি ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার। তাহার বিস্তারিত বিবরণে প্রয়োজন নাই। সর্প-শরীর বহু স্থানে বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু কোন খণ্ডই দেহের সহিত নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র হইল না। পাছে জামার আস্তিন ভেদ করিয়া ছুরিকার তীক্ষ্ণাগ্র তাঁহার দেহে সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ওস্মান কোন কর্ত্তনস্থান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। সর্পের রুধিরে তাঁহার পরিচ্ছদের কোন কোন স্থান রঞ্জিত হইল। খণ্ড খণ্ড সর্পদেহ পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়া মালার ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। তখনও সেই সকল খণ্ডের কোন কোনটা ভয়ানক ভাবে নড়িতে লাগিল। ওস্মান দাঁড়াইয়া ছিলেন। সর্পদেহ ঝুলিতে ঝুলিতে ক্রমে ভূমিস্পর্শ করিল; সকল অংশ কাটা হইল, কেবল মুখের নিকট কিয়দংশ বাকী রহিল। ওস্মান হাতের ছুরি নিঃশব্দে ভূতলে রক্ষা করিয়া বাম হস্ত দ্বারা সর্পের দোদুল্যমান ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ ধারণ করিলেন। তাহার পর বহুদূরস্থিত একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া বিপুল শক্তিসহকারে উভয় হস্তস্থিত সর্প তথায় নিক্ষেপ করিলেন। সেই স্থানে নিপতিত দেহ-সংলগ্ন সর্পমুণ্ড ছট্‌পট্‌ করিতে লাগিল এবং বার বার বদন ব্যাদন করিতে লাগিল। অহিরাজের এই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা আপাততঃ অনাবশ্যক বুঝিয়া, ওস্মান উত্তমরূপে হস্তাদি প্রক্ষালন করিবার বাসনায় সরোবরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তিরস্কার

নবাবকন্যা আয়েষার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাঁদী তাঁহার সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে অঙ্গের বসনাদি যথাবিন্যস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সমস্ত স্থির হইলে গোলাপসিক্ত অঙ্গোচা লইয়া আসিল। আয়েষা তাহাতে মুখ মুছিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মতিয়া, তুমি এখানে কতক্ষণ আছ?"

মতিয়া বলিল, "যতক্ষণ হুজুর এখানে আছেন, আমি ততক্ষণই এখানে আছি।"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কে যেন আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। তাহার দেহ কি শীতল! তুমি কি আমার গায়ে হাত দিয়াছিলে মতিয়া?"

"আজ্ঞা না।"

"এ ঘরে আর কেহ আসিয়াছিলেন কি?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"কে আসিয়াছিলেন?"

"নবাব সাহেব।"

আয়েষা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি? নবাব সাহেব আসিয়াছিলেন? আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার দেহ ভাল করিয়া আচ্ছন্ন ছিল না, এ অবস্থায় কেন তিনি এখানে আসিলেন? কোথায় তিনি?"

মতিয়া সভয়ে বলিল, "সকল কথা বলিতে আমাকে নিষেধ আছে। জাঁহাপনা বোধ হয় এখনও বারান্দায় থাকিতে পারেন।"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সেই ঈষৎ বামহেলিত গ্রীবা ক্রোধ হেতু বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয় আশু নিদ্রাভঙ্গ এবং ক্রোধজন্য একটু রক্তাভ দেখাইতে লাগিল। ঈষৎ-দীর্ঘ দেহ যেন একটু চঞ্চল বোধ হইতে থাকিল। রাজরাজমোহিনীর কি অপরূপ শ্রী হইল! তিনি বলিলেন, "সকল কথা বলিতে নিষে, আছে! তবে

কি তিনি ইতর ব্যক্তির ন্যায় ঘৃণিত অভিপ্রায়ে নিদ্রাকালে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন? তবে তিনিই কি আমার অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন? আইস তুমি, চল,—কোথায় তিনি?"

কুপিতা অভিমানিনী আয়েষা চঞ্চল চরণে বাহিরে আসিলেন। মতিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। বারান্দায় ওস্‌মান নাই। আয়েষা বলিলেন, "এখানে নবাব সাহেব নাই; মতিয়া, দেখ তুমি, কোথায় তিনি।"

মতিয়া একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইল, ওস্‌মান হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া সরোবরের চত্বরে উপবেশন করিয়াছেন। সে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "জাঁহাপনা সরোবরতীরে।"

আয়েষা সেই দিকে চলিলেন। হয় তো একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবে, এ সময়ে তাহার উপস্থিত থাকা অনুচিত বোধে মতিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ওস্‌মান দূর হইতেই আয়েষার অলঙ্কার-শিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নবাবনন্দিনী আর একটু নিকটে আসিলে, প্রথমে কি বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবেন, মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন কথাই বলিতে হইল না। আয়েষা আর একটু নিকটস্থ হইয়া ক্রোধ-বিকম্পিত ও উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "নবাব সাহেব, তোমার এই কাজ? আমি নিদ্রিতা, শিথিল-বসনা, একাকিনী। তুমি এ অবস্থায় কেন আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ? আমি তোমাকে চিরদিন মহচ্চেতা, হীনকার্য্যে অশক্ত, মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি। তুমি কেন আজি আমার বিনা অনুমতিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীচতার পরিচয় প্রদান করিলে?"

ওস্‌মান অধোমুখে ধীরস্বরে বলিলেন, "আমাকে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সেখানে যাই নাই।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "তোমার ব্যবহার উত্তম। কোনরূপ দায়ে পড়িয়াও অন্তঃপুরে নিদ্রিতা নারীর কক্ষে একাকী প্রবেশ করিতে তোমার অধিকার নাই। কেবল প্রবেশ করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই; তুমি আমার অঙ্গ-স্পর্শ করিয়াছ। ধিক্ তোমাকে!"

ওস্‌মান বলিলেন "আয়েষা, তুমি আমাকে অকারণ অসঙ্গত তিরস্কার করিতেছ। তুমি যে সকল গর্হিত আচরণের কথা বলিতেছ, তাহা সম্পাদন করিতে ওস্‌মান চিরদিনই অশক্ত।"

আয়েষা বলিলেন, "এখনও মিথ্যা কথা কহিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? এখন তুমি স্বয়ং নবাব—পুরীর মধ্যে তোমার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি পুরমহিলাগণের উপর এরূপ অত্যাচার করিবে, ইহাই যদি স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, নবাব সাহেব, তোমার পাপে এই রাজ্য-সম্পদ্ সকলই রসাতলে যাইবে।"

ওস্‌মান অধোমুখে বলিলেন, "আয়েষা, তুমি আমাকে অকারণে তীব্র তিরস্কার করিয়া নিদারুণ মর্ম্মব্যথা দিতেছ। আমি তোমাকে নিদ্রিত ও অসাবধান দেখিয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তোমার বাঁদী দ্বারে ছিল। সে সমস্ত কথা জানে। কিন্তু পরে নিতান্ত দায়গ্রস্ত ও নিরুপায় হইয়াই আমাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তখন তোমার অঙ্গস্পর্শ করা দূরে থাকুক, তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতেও আমার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। তোমার তিরস্কারে আমার অন্তর দগ্ধ হউক, অথবা তোমার অবিশ্বাসে আমার জীবন যন্ত্রণার আলয়ই হউক, যে দায়ে পড়িয়া আমাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমি কখনও ব্যক্ত করিব না; তোমার বাঁদীকে তাহা বলিতে বার বার নিষেধ করিয়াছি। আয়েষা তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া এবং নীচকার্য্যে সক্ষম মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ দিয়াছ। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তোমার এই অবিশ্বাসে ও দুর্ব্বাক্যে আমার মর্ম্মগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; কবরের মৃত্তিকায় না মিশিলে এ হৃদয়জ্বালা বোধ হয় কখনও শীতল হইবে না।"

ওস্‌মান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

আয়েষা বলিলেন, "ওস্‌মান, আমার বাক্যে তুমি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার অন্যকার এই ব্যবহারে বড়ই ক্লেশের উদয় হইয়াছে। এ রহস্য ব্যক্ত না করিলে তোমাকে চিরদিন কষ্ট পাইতে হইবে এবং তোমার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্র পুরুষকে অবিশ্বাসী জ্ঞান করিতে হইল বলিয়া আমাকেও

যাবজ্জীবন অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ওস্মান, কেন তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে, এ কথা এখনই তোমার ব্যক্ত করা আবশ্যক।"

ওস্মান অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "যাহা জীবনে ব্যক্ত করিব না মনে ছিল, তোমার উৎপীড়নে অনিচ্ছায় তাহা ব্যক্ত করিতেই হইতেছে। তবে আইস আয়েষা, আমার সঙ্গে আইস।"

ওস্মান অগ্রসর হইলেন, আয়েষা তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। যেখানে সেই খণ্ডীকৃত সর্প নিপতিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ওস্মান বলিলেন, "দেখিতেছ আয়েষা, ইহা কি?"

আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "এ যে ভয়ানক কালসর্প। কে ইহাকে ধরিয়া এরূপে কটিল? এখনও মাথাটা নড়িতেছে যে! ওঃ কি ভয়ানক!"

ওস্মান বলিলেন, আমি তোমার মাতার মুখে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য আর কোন কোন বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলাম। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তোমাকে একাকিনী ও নিদ্রিতা দেখিয়াই আমি দ্বার হইতে ফিরিয়া আসি। তোমার দেহের উপর এই সর্প শয়ন করিয়া ছিল। আমি ভাল করিয়া দেখি নাই, এ জন্য সর্প কি অন্য কোন পদার্থ, স্থির করিতে না পারায় তোমার বাঁদীকে ভাল করিয়া দেখিতে বলি। যখন তাহার মুখে কালসর্পের কথা শুনি, তখন আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। তুমি একটু অসাবধান হইলেই সর্পাঘাত ঘটিবে, এ চিন্তায় আমি তখন উন্মাদপ্রায় হই। তখন আমি নিরুপায় হইয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার পর আমাকে এই সর্প ধারণ করিয়া তাহার এই দশা করিতে হইয়াছে। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে হইয়াছিল, ইহা অতি তুচ্ছ বিষয়, এ জন্য এ কথা কখন তোমাকে জানাইতে বাসনা ছিল না, কিন্তু তোমার অবিশ্বাসরূপ তীক্ষ্ণ বিষের জ্বালায় সকল কথা বলিতে হইল। আয়েষা, যে তোমাকে ভালবাসে, সে কখনই ইতর হইতে পারে না।"

তখন আয়েষা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "ধন্য ভগবান্! তোমার করুণার সীমা নাই। তুমি যে আজ ভয়ানক বিপদ্ হইতে ওস্মানের মহামূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" তাহার পর সজল-নয়নে ওস্মানের নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ওস্মান ভাই, তুমি এই সামান্যা নারীর জন্য আপনার এই কর্ম্মময় জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলে, বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ। এখন বুঝিতেছি, এই সর্পই আমার দেহ বেষ্টন করিয়াছিল; আমি নিদ্রার আবেশে মনে করিয়াছি, কেহ হয় তো আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে। ওস্মান, আমার প্রতি চিরদিনই তোমার দয়ার সীমা নাই। আমি না বুঝিয়া তোমাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি। ভাই, দয়া করিয়া আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে কি?"

আয়েষা সাশ্রুনয়নে ওস্মানের চরণে পড়িলেন। অতি যত্নে ওস্মান সেই সুন্দরীকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা! তোমার দুর্ব্বাক্য যাহার কর্ণে মধুবর্ষণ করে, সে তোমার তিরস্কার শুনিয়াও রাগ করিতে অশক্ত; সুতরাং ক্ষমার কথা তুমি কেন বলিতেছ? কিন্তু আয়েষা, তুমি যে আমাকে ভ্রমেও অবিশ্বাসী চরিত্রহীন, নীচস্বভাব বলিয়া মনে করিয়াছ, আজ আমি, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিব!"

আয়েষা নীরবে, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওস্মান বলিতে লাগিলেন, "তুমি একদিন—মনে পড়ে আয়েষা, বঙ্গদেশে, আমাদের স্কন্ধাবারে, কারাগারের মধ্যে জগৎসিংহের প্রতি তোমার হৃদয়নিহিত প্রবল প্রেমের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলে। আমি নীরবে তোমার সেই শেলোপম বাক্য বুক পাতিয়া সহিয়াছিলাম; আজিও নীরবে সেই জ্বালা সহিয়া আসিতেছি। আয়েষা, আজি আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার দুর্ব্বাক্যসমূহের প্রতিবাদচ্ছলে আমার প্রেমের কথা ঘোষণা করিব। সমস্ত কথা শুনিয়া হয় তুমি আমাকে নিদারুণ ঘৃণার নয়নে দর্শন কর, না হয় আমাকে ভাগ্যবান্ মানবগণের অগ্রগণ্য কর। তোমার হস্তে আমার জীবন ও মরণ, সুখ ও দুঃখ ন্যস্ত রহিয়াছে।"

আয়েষা নীরব—অধোমুখ। ওস্মান বলিতে লাগিলেন, "শুন আয়েষা, আমি যদি অত্যাচারী, অবিশ্বাসী, কলুষিতস্বভাব হইতাম, তাহা হইলে তোমার এ তিরস্কার আমাকে কখনই শুনিতে হইত না। আমি ছলে হউক, বলে হউক, তোমাকে কোন্ দিন আমার ভোগের সামগ্রী করিয়া লইতাম। পিতা তোমার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির

করিয়াছিলেন, তোমার মাতা তোমার সহিত অদ্যাপি আমার বিবাহ না হওয়ায় দুঃখিতা ; সুতরাং তোমাকে বলপূর্ব্বক আমি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তিই আমার নিন্দা করিত না। কিন্তু আমি সে পথে একদিনও চলিবার ইচ্ছা করি নাই কেন ? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। এত ভালবাসি যে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তোমার চিত্তের অপ্রসন্ন ভাব থাকিতে তোমাকে মহিষী করিতেও আমার সাধ্য নাই!"

আয়েষা অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "তুমি চিরদিনই আমার প্রতি একান্ত কৃপাবান্।"

ওস্মান বলিলেন, "আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। এক্ষণে তোমার কোন উত্তর শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার কথা শুনিয়া যাও। আমি এখন নবাব ; এই পুরমধ্যে আমার আজ্ঞা অখণ্ডনীয় ; আমার বাক্য প্রতিবাদ-সম্ভাবনা-বিরহিত। যদি তোমার দেহমাত্র আমার প্রয়োজন হইত, যদি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পাইলেই আমি চরিতার্থ হইতাম, তাহা হইলে, আয়েষা, সে জন্য আমাকে ঘৃণিত চোরের ন্যায় সুযোগ ও অবসর খুঁজিয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতে হইবে কেন ? আমি ইচ্ছা করিবামাত্র বলপূর্ব্বক সর্ব্বজনের জ্ঞাতসারে তোমার দেহ লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতে পারিতাম। আমি ভ্রমেও সেরূপ কল্পনা করি নাই কেন ? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। ভালবাসায় অত্যাচার সম্ভবে কি ? তোমার হৃদয়-হীন দেহে, প্রণয়-হীন সঙ্গ-সুখে, আসক্তিহীন সাহচর্য্যে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার ভালবাসা গভীর—প্রগাঢ়—অনন্ত।"

আয়েষা বলিলেন, "তুমি দেব-স্বভাব, একথা অন্যে যত জানুক বা না জানুক, আমি তাহা বিশেষ-রূপে জানি। আমি তাহা জানি বলিয়াই আজি তাহার ব্যভিচার অনুভব করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম।"

ওস্মান বলিতে লাগিলেন, "কথার এখনও শেষ হয় নাই। আমার পিতার কত মহিষী, তাহার উপর আবার অসংখ্য উপপত্নী। নবাব বাদশাহ-দিগের পক্ষে এরূপ সঙ্গিনীর প্রাচুর্য্য গৌরব ভিন্ন নিন্দার কথা নহে। আমার বিবাহযোগ্য বয়স অনেকদিন ছাড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি আমি বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হই নাই কেন ? কেবল তোমাকে লাভ করিবার আশায় ওস্মান এ বয়সেও কুমার। যদি তোমাকে না পাই, বুঝিব, চির-কৌমার্য্য আমার অদৃষ্টের বিধি-নিয়োজিত ব্যবস্থা। জগতে রূপসী ও গুণবতী নারীর অভাব নাই, কিন্তু আয়েষা, আর কোন মহিলাকে মহিষী করিবার কল্পনা করা দূরে থাকুক, কাহারও প্রতি নেত্রপাত করিতেও আমার বাসনা হয় না। তোমার রূপে আমার নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছে, তোমার গুণে আমি মাতোয়ারা হইয়া আছি, তোমার প্রতি ভালবাসায় আমি পাগল হইয়া পড়িয়াছি।"

আয়েষার নয়ন হইতে মুক্তাফল সদৃশ অশ্রু ঝরিয়া ধরণী সিক্ত করিতে লাগিল। ওস্মান বলিতে লাগিলেন, "আরও শুন। আমার জ্যেষ্ঠ বিলাস-সাগরে ভাসমান। রূপসী রমণীগণমধ্যে তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন। সুরা তাঁহার অদম্য ভোগ-লালসানলে ঘৃত সংযোগ করিতেছে। তাহাতে বিষয়-ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রকাশিত হইলেও তাঁহার অন্য কলঙ্ক নাই। তোমার নিষ্ফল প্রেম-পিপাসায় জীবনকে অসার মরুভূমিতে পরিণত না করিয়া, আমার অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আমাকে জ্যেষ্ঠের পদাঙ্কানুসরণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কি ঘৃণিত মন্ত্রণা! যে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার ঐ মাধুর্য্যময়ী রূপরাশি যাহার হৃদয়ে অঙ্কপাত করিয়াছে, যে তোমাকে বিধাতার শুভ-সময়জাত অসাধারণ সৃষ্টি বলিয়া বুঝিয়াছে, তোমার পুণ্যময়, সর্ব্বগুণের আধারস্বরূপ মূর্ত্তি যাহার অন্তরে অনপনেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে কি কখন পাপে প্রমত্ত হইতে পারে ? নীচ-সংসর্গে, ঘৃণিত ভোগে নিমজ্জিত হইয়া সে কি কখন তোমাকে ভুলিবার কল্পনা করিতে পারে ?"

আয়েষা নীরব—অধোমুখ। তাঁহার লোচননিঃসৃত বারি তখনও ভূ-পৃষ্ঠ আর্দ্র করিতেছে। ওস্মান তখন জানু পাতিয়া আয়েষার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। একদিকে সেই জীবন-বিহীন উৎকটদর্শন সর্পের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কলেবর, অন্য দিকে নারীকুলের রাজ্ঞী, সুন্দরীগণের শিরোমণি আয়েষা দণ্ডায়মানা। মধ্যস্থলে পরম শোভাময় বিশালবক্ষ, বীরশ্রেষ্ঠ ওস্মান অবনত-দেহে অবস্থিত। সেই অবস্থায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ওসমান কহিলেন, "আয়েষা, প্রাণেশ্বরি, হৃদয়দেবি, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, বল—বল—কৃপা করিয়া বল, আমার এই কর্ম্মময়, উৎসাহময় জীবনকে দগ্ধ করা কি তোমার উচিত ? আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত এইরূপ মর্ম্মপীড়ায়

প্রপীড়িত করা কি তোমার ধর্ম্ম? সুন্দরি, এ সংসারে প্রেমের কি পুরস্কার নাই? ভালবাসার কি প্রতিদান নাই? জীবনের সর্ব্বস্বদানেরও কি কোন মূল্য নাই?"

তখন আয়েষা অতি সমাদরে ওস্‌মানের হস্ত ধারণ করিলেন,—বলিলেন, "ওস্‌মান, তোমার ভালবাসা অতুলনীয়। এ সংসারে যে নারী তোমার ভালবাসা ভোগ করিয়াছে, সে ধন্যা হইয়াছে। যদি এ জগতে প্রেমের পুরস্কার থাকে, তাহা হইলে তাহা তোমারই প্রাপ্য। তুমি দেবতা, আমি অতি সামান্যা নারী। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম নিতান্ত অপাত্র-ন্যস্ত।"

আয়েষা নীরব হইলেন। ওস্‌মান বলিলেন, "বল, বল, প্রাণেশ্বরি, তোমার কথায় আমার হৃদয়ে অমৃতের উৎস ছুটিতেছে। চুপ করিও না; যাহা বলিতেছ, তাহা শেষ কর।"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন, "যদি আমার আত্ম-দান করিবার সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে, ওস্‌মান, আমি তোমার চরণে বিক্রীতা হইয়া থাকিতাম। কিন্তু হায়! কেন আমি মরি নাই? কেন ওস্‌মান, তুমি এ অভাগিনীকে সর্পের মুখ হইতে রক্ষা করিলে?"

আর কথা আয়েষা বলিতে পারিলেন না। বস্ত্র দ্বারা নয়নজল মার্জ্জন করিতে করিতে তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ওস্‌মান সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিলেন, 'সেই কথা। চিরদিনই সেই এক কঠোর বাক্য। আত্মহত্যা করিব না, রণক্ষেত্রে এ জ্বালার নিবৃত্তি করিব।'

অবনত-মস্তকে, কাতরভাবে হতাশ ওস্‌মান সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজলক্ষ্মী

মহারাজ মানসিংহ বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া পুণ্যতীর্থ পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শনে আগমন করিয়াছেন। সমুদ্রোপকূলে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁহার অবস্থানোপযোগী বহুসংখ্যক পটমণ্ডপাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রাবাসসমূহ নানা বর্ণে সুরঞ্জিত এবং রমণীয়দর্শন। মহারাজ ও তাঁহার পরিজনবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত যে সকল বস্ত্রাবাস বিরচিত হইয়াছে, তৎসমস্তের শোভা অতুলনীয়। সেই সকল মণ্ডপ বহুমূল্য বনাতে আবৃত, তাহার উপরিভাগ বিচিত্র স্বর্ণ-কলস এবং কেতনমালায় সুশোভিত। দাস-দাসী, শরীর-রক্ষক, অশ্বারোহী, হস্তিপ, গোলন্দাজ প্রভৃতি অনুচরগণের নিমিত্ত চারিদিকে বহুসংখ্যক বস্ত্রগৃহ বিরচিত হইয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতি অসংখ্য পশুর অবস্থানের নিমিত্ত যথাস্থানে যথাযোগ্য আবাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। নানা স্থানে নানারূপ ভাণ্ডার ও পাকশালা স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ-পরিমিত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া মহারাজের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছে। বিন্যাস-কৌশলে তাহা বহুদিন-নির্ম্মিত অট্টালিকা-সম্পন্ন একটি সুসমৃদ্ধ নগরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

মহারাজার সহিত তিন জন রাণী আসিয়াছিলেন। তাঁহারই এক জন যোধপুরসম্ভূতা উর্ম্মিলা। উর্ম্মিলা মহারাজ মানসিংহের প্রধানা মহিষী না হইলেও, প্রধানা প্রণয়ভাগিনী ছিলেন। মহারাজ মানসিংহের বহুসংখ্যক মহিষী। মহারাজকে বাদশাহের কার্য্যে নানা সময়ে নানা স্থানে ভ্রমণ ও গমন করিতে হইত। মহিষী-মণ্ডলীকে সর্ব্বত্র সঙ্গে লইয়া গমন করা সম্ভবপর হইত না; হইলেও মহারাজ সকলকে সঙ্গে লইতেন না। কিন্তু উর্ম্মিলা তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী। রণক্ষেত্র ও ক্ষণিক স্থানান্তর-বাস ব্যতীত উর্ম্মিলা আর সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় মহারাজার অবিচ্ছিন্না সহচরী ছিলেন। রাজ্ঞীগণের মধ্যে জগৎসিংহের জননী পদে, মর্য্যাদায় ও গৌরবে সর্ব্বপ্রধানা ছিলেন। কিন্তু তিনি মহারাজার সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে ভালবাসিতেন না; মহারাজও তাঁহাকে প্রণয় অপেক্ষা সম্মান, আদর অপেক্ষা ভয় করিয়া চলিতেন; এ জন্য মহারাজ বঙ্গদেশের সুবেদার হইয়া আসিলে জগৎসিংহের জননী তাঁহার সঙ্গে আইসেন নাই। পুরুষোত্তমে মহারাজার সহিত আর যে দুই মহিষী শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এ উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই।

এক সপ্তাহকাল মহারাজ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন স্থির হইয়াছে। দুই দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে মহিষীগণের সহিত মহারাজ মানসিংহ দেবমন্দিরে গমন করেন। তথায় স্নানাহ্নিক, পূজা, পাঠ প্রভৃতি সমাধা করিতে

প্রায় দেড় প্রহর বেলা হইয়া যায়। তাহার পর সহস্র সহস্র মুদ্রা ছড়াইতে ছড়াইতে মহারাজ ও তাঁহার আনুষাত্রিকগণ বস্ত্রাবাসে প্রত্যাগত হন। প্রতিদিনই মহারাজার নামে সঙ্কল্প করিয়া মহাসমারোহে জগন্নাথদেবের পূজা হয়। প্রতিদিন নানা দিগ্‌দেশাগত দরিদ্র ব্যক্তি মহারাজার ব্যয়ে উদর পূরিয়া ভোজন করে।

পাঠানদিগের সহিত সন্ধি অনুসারে পুরীর অধিকার বাদশাহের হস্তগত হইয়াছে। উড়িষ্যার অন্যান্য ভাগে পাঠানগণ নির্ব্বিবাদে শান্তি ভোগ করিতেছেন, পাঠানদিগের দ্বারা উড়িষ্যা-বিজয়ের পূর্ব্বে দেববংশীয় হিন্দুরাজগণ এই প্রদেশের নরপতি ছিলেন। সেই বংশীয় রামচন্দ্র দেব এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। পুরীর অধিকার হস্তগত হইবামাত্র মহারাজ মানসিংহ উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব ভূপালবংশীয় মহারাজ রামচন্দ্র দেবের হস্তে পুরীর শাসন ও কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিয়াছেন। সেই রাজা রামচন্দ্র সম্প্রতি মহারাজার সুখ-সৌকর্য্য ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনে এতই মনোযোগী হইয়াছেন যে, মহারাজার কোন অসুবিধা ঘটিতেছে না এবং তিনি রাজা রামচন্দ্রের গুণে মোহিত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

নবাব সোলেমান বা নবাব ওস্‌মান তাঁহাদের অধিকারমধ্যে প্রবেশকালে দূরে থাকুক, মহারাজার পুরী আগমনের পরও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, খাজা ইষা খাঁ-ও আইসেন নাই। তাঁহার নিকট হইতে পত্র লইয়া এক জন নবাবকুটুম্ব আসিয়াছিলেন। যে পত্র আসিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—'উড়িষ্যার নবাবেরা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় দুঃখিত। মহারাজ যে কয়দিন পুরীধামে অবস্থান করিবেন, তাহার মধ্যে কোন না কোন দিন নবাব ওস্‌মান খাঁ নিজ প্রয়োজনে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেও করিতে পারেন। মহারাজার যদি কোন পদার্থের অভাব বা প্রয়োজন হয়, জানিতে পারিলেই তাহার সঙ্কুলান করিয়া দিবেন।' পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহার পত্র পাঠ করিয়াও ওস্‌মান সন্তুষ্ট হন নাই। এ পত্র ওস্‌মানের অভিপ্রায়ানুসারে লিখিত। আগত নবাব-কুটুম্বের মুখে মহারাজ শ্রুত হইলেন যে, খাজা ইষা খাঁ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। একে প্রাচীন বয়স, তাহাতে কঠিন পীড়া; সুতরাং তাঁহার জীবনের বিশেষ আশা নাই।

পাঠানদিগের পত্র ও ব্যবহার কিঞ্চিৎ অসন্তোষ-জনক হইলেও মহারাজ মানসিংহ পুরীধামে পরমানন্দে কালপাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের অনেক আবিলতা ভাসিয়া গেল। প্রেম ও ভক্তি, দয়া ও শান্তি, অনুরাগ ও আকর্ষণ তাঁহার চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল করিয়া দিল। পাঠানদিগের পত্রের কথা স্মরণ করিয়া মহারাজ সম্প্রতি বিশেষ বিচলিত হইলেন না।

পুরী অবস্থানের তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের আরতি দর্শন করিয়া মহারাজ শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন এবং ধীরে ধীরে উর্ম্মিলা দেবীর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। বৃহৎ মণ্ডপ, কারুকার্য্যখচিত চন্দনকাষ্ঠের আবরণে পরিবেষ্টিত। মণ্ডপের ঊর্দ্ধভাগ স্বর্ণসূত্রসমন্বিত চিত্রাদিযুক্ত বস্ত্রে আবৃত; তলদেশ কাষ্ঠাচ্ছাদিত; তাহার উপর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি মনোহর গালিচা বিস্তৃত। এই অপূর্ব্ব বস্ত্রগৃহের মধ্যে রজত-পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিরচিত। যথোপযুক্ত স্থানসমূহে নানাপ্রকার আসন ও শোভন-সামগ্রী বিন্যস্ত। গৃহের নানা স্থানে অত্যুত্তম স্ফটিকসামাদানে বাতী জ্বলিতেছে। বিবিধ সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। মণ্ডপ জন-শূন্য।

মহারাজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যজনকারিণী ব্যজনী লইয়া আসিল এবং আর এক কিঙ্করী বারিপূর্ণ হৈমঘট লইয়া উপস্থিত হইল, স্বতন্ত্র এক দাসী তাম্বুল লইয়া আগমন করিল।

মহারাজ ক্লান্তভাবে শয্যায় পড়িয়া গেলেন,—জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাণী কোথায়?"

এক জন দাসী উত্তর দিল, "সূপকারিণীর নিকট মহারাজার ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছেন, এখনই আসিবেন।"

মহারাজ বলিলেন, "জল বা পানের এখন প্রয়োজন নাই। তোমরা যাইতে পার। একটু জোরে পাখা কর!"

তাম্বুল ও জলবাহিকা প্রস্থান করিল। ব্যজন-কারিণী জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।

মহারাণী উর্ম্মিলা সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রৌঢ়বয়স্কা, কিন্তু দেখিলে বয়স ত্রিশ

অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া কোনমতেই মনে হয় না। মহারাণী একটু খর্ব্বকায়া; কিন্তু বোধ হয়, দৈর্ঘ্য আর বেশী হইলে তাঁহার শোভার হানি হইত। দেহ স্থূল নহে, কিন্তু কোথাও অস্থির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয় না। শরীরের সর্ব্বত্র লাবণ্য ঢলঢল করিতেছে। পঞ্চবিংশবর্ষদেশীয়া যুবতীর দেহে যেমন লাবণ্য পরিদৃষ্ট হয়, মহারাণীর দেহ সেই লাবণ্যে সমুজ্জ্বল। শরীরের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়; হাত-পা দিয়া যেন রক্ত ফুটিয়া পড়িতেছে। চক্ষু এখনও যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল। ললাটে রেখামাত্র নাই। কেশরাশি কবরীবদ্ধ ও ঘনকৃষ্ণ। ভগবৎপ্রদত্ত এই রূপরাশি সংবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত মহারাণীর আর কোন কৃত্রিম আয়াস অবলম্বন না করিলেও ক্ষতি হইত না; কিন্তু উর্ম্মিলা দেবী তৎসম্বন্ধেও যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার কবরীর সহিত মুক্তামালা বিজড়িত; কবরীর উর্দ্ধভাগ হইতে বাম ললাটে হীরকখচিত ঝাঁপটা বিলম্বিত। কর্ণদ্বয়ে চুণি, পান্না ও মুক্তাসমন্বিত দুল, কণ্ঠে মহার্হ মুক্তামালা, প্রকোষ্ঠে মণিমালা-সমাবৃত ছন্দ, বাহুতে মনোহর বিজৌটা, দেহের অন্যান্য স্থানে যথোপযুক্ত ভূষণ, চরণে শব্দায়মান মঞ্জীর। তাঁহার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম সৌবর্ণ তাসের ঘাগরা, উর্দ্ধদেহে মৌক্তিকমণ্ডিত পীতবর্ণ কাঁচলি, তাহার উপর বিরলনিবিষ্ট কৃত্রিম হৈম-কুসুমসমাবৃত সুচিক্কণ ওড়না। উর্ম্মিলা দেবী হাস্যময়ী, প্রসন্নবদনা ও পরিহাসনিপুণা।

শোভা ও সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে মহারাণী উর্ম্মিলা সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি একাকিনী নহেন। তাঁহার পশ্চাতে আর এক সুন্দরী যুবতী অবনতবদনা, ধীর ও গতিমন্থরা।

পশ্চাতের নম্রবদনা নবীনাকে মহারাজ দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "কিয়ৎকাল এই ভুবনমোহিনীকে দেখিতে না পাওয়ার যে ক্লেশ, বোধ হয়, এক রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল।"

মহারাণী বলিলেন, "যে দুষ্ট খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া কেবল খেলা করিতেই চাহে, তাহাকে সাজা দেওয়াই উচিত। সেই সাজা দিবার জন্যই এত দেরী করিয়া আসিতেছি।"

মহারাজ বলিলেন, "কিন্তু সুন্দরি, যে ভাগ্যবান্ তোমার অধর-সুধা পান করিয়া অমর হইয়াছে, তাহাকে অন্য খাদ্য দিবার প্রয়োজন কি?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "যত বুড়া হইতেছ, ততই যে রস বাড়িয়া উঠিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "তাহারও হেতু আছে। তোমার যত বয়স বাড়িতেছে, ততই তুমি বুড়ী না হইয়া কুঁড়ি হইতেছ। কাজেই এ বয়সে এমন রসবতী কুঁড়ি দেখিয়া, রস আপনি কাণায় কাণায় হইয়া উঠে।"

মহারাণী দেখিলেন, মহারাজ ক্রমেই কথা বড় গাঢ় করিয়া তুলিতেছেন, তাই একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নবীনা মহারাজার নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইলেন। মহারাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "এ বালিকা কে?"

মহারাণী বলিলেন, "ইনি আমার বহুদিনের পরিচিতা এক বয়স্যার কন্যা। মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।"

নবীনা গলায় কাপড় দিয়া মহারাজের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। চক্ষু একটু জলভারাকুল হইল; কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না; তিনি আবার নিতান্ত নতমুখে মহারাণীর নিকট সরিয়া আসিলেন।

মহারাজ কহিলেন, "বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আকার প্রকার সকলই অতি সুন্দর। তুমি ইহাকে কোথায় পাইলে?"

মহারাণী বলিলেন, "মাতার সহিত ইনিও পুরুষোত্তম দর্শনে আসিয়াছিলেন। আজ মধ্যাহ্নে আমার বয়স্যা, কন্যা সঙ্গে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মাতা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কন্যাকে আমি দিই নাই। কিছুদিন সঙ্গে রাখিব স্থির করিয়াছি।"

মহারাজ বলিলেন, "বেশ স্থির করিয়াছ। বড় সুশীলা কন্যা। নিতান্ত কোমলস্বভাবা। বড় ভাগ্যবতীর ন্যায় লক্ষণযুক্ত। এ কন্যার বিবাহ হইয়াছে?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি মহারাজের নিকট একটা নালিশ করিব; কিন্তু আজ থাক, আর একদিন সে কথা হইবে।"

মহারাজ বলিলেন, "তোমার যেরূপ অভিরুচি। কন্যাকে যত্নে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছ তো?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "করিয়াছি।"

মহারাজ শয্যায় পড়িয়া বলিলেন, "ওঃ, বড় গরম।"

উর্ম্মিলা আর একজন ব্যজনকারিণী ডাকিবার

নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। সেই পর্য্যঙ্কপার্শ্বে আর একখানি পাখা পড়িয়া ছিল। নবীনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই পাখা লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ বলিলেন, "তুমি কেন মা, দাসীরা আসিতেছে। তোমার হাতে বেদনা হইবে।"

নবীনা অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "আপনার সেবা করিতে পাওয়া আমার ভাগ্য।"

মহারাজ উর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ কন্যার নাম কি ?"

মহারাণী বলিলেন, "রাজলক্ষ্মী।"

মানসিংহ বলিলেন, "বেশ নাম। বাস্তবিকই ইনি রাজলক্ষ্মী। এ লক্ষ্মী যাহার ঘরে গিয়াছেন, সে লক্ষ্মীযুক্ত রাজা হইবে, সন্দেহ নাই।"

দুই জন দাসী আসিল। মহারাজ বলিলেন, "মা, তুমি পাখা দেও, উহারা বাতাস করুক। তোমার কষ্ট হইবে।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "কষ্ট হইতেছে না। আপনার অসন্তোষ-ভয়ে পাখা ছাড়িয়া দিতেছি।"

রাজলক্ষ্মী আবার ধীরে ধীরে আসিয়া উর্ম্মিলার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে আহারের উদ্‌যোগ করা হইবে কি ? রাত্রি হইয়াছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা।"

উর্ম্মিলা দেবীর হাত ধরিয়া রাজলক্ষ্মী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মা, আজ্ঞা দিউন, আমি আহারের উদ্‌যোগ করিতে যাই।"

উর্ম্মিলা মহারাজের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাও তুমি। আমিও এখনই যাইতেছি।"

রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উর্ম্মিলার সহিত মহারাজ মানসিংহও ভোজনমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজলক্ষ্মী সমস্ত বিষয়েই অতিশয় সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

সেই দিন অবধি রাজলক্ষ্মী বিবিধ বিধানে মহারাজের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রাজলক্ষ্মীর সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজলক্ষ্মী যে কার্য্য করিতেন, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। সুতরাং শুশ্রূষার জন্য মহারাজ রাজলক্ষ্মীর উপরই নির্ভর করিতে লাগিলেন। তিন দিন পরে এমন হইয়া উঠিল যে, রাজলক্ষ্মী যে কর্ম্ম সম্পাদন না করিতেন, মহারাজ তাহাতে প্রীত হইতেন না এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় যে কার্য্য রাজলক্ষ্মী সম্পন্ন করিয়াছেন শুনিতেন, মহারাজ তাহাই উত্তম ও সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া লইতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ন্যায়পরতা

বৃদ্ধ, সুবিজ্ঞ, পাঠান-মন্ত্রী খাজা ইষা খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সামান্য জ্বর ও তৎসহ উদরাময় রোগে অতি অল্পকালমধ্যেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। সোলেমান ও ওস্‌মান নবাবদ্বয় খাজা ইষাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। অতিশয় সমারোহে প্রবীণ মন্ত্রীর সমাধি সম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহার স্থানে খিজর খাঁ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইলেন। নূতন মন্ত্রীর বয়স চল্লিশ অতিক্রম করে নাই; তিনি সাহসী ও সমরপ্রিয়। খিজর খাঁ নবাব ওস্‌মান খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত ওস্‌মানের অনেক বিষয়েই মতের ঐক্য হইত। এই জন্যই ওস্‌মান তাঁহাকে এই সম্মানিত পদ প্রদান করিলেন।

সোলেমান ও ওস্‌মান পরস্পর বিভিন্ন-ভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। খাজা ইষার পরলোকগমনের পর দুই নবাব পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন যে, অতঃপর রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত রাখার প্রয়োজন নাই; ওস্‌মান স্বয়ং সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সোলেমান বিষয়কর্ম্মে অনভিজ্ঞ এবং তিনি তাহার ভার গ্রহণে অনিচ্ছুক। ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকিতে পাইলে এবং তাহার উপকরণ সমস্ত অব্যাঘাতে প্রাপ্ত হইলেই তিনি চরিতার্থ হইবেন। ওস্‌মান রাজকীয় ব্যাপারের যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা কহিবেন না।

এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইল। ওস্‌মান খাঁর নামে রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা, শাসন ও পালন নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সহী ও নামসংযোগে রাজাজ্ঞাসমূহ প্রচারিত হইতে থাকিল।

এই সকল বার্ত্তা মহারাজ মানসিংহের গোচর করা হইল। পুরুষোত্তমে নবাব-দূত আসিয়া এই সকল সংবাদ বঙ্গ-বিহারের সুবেদারের গোচর করিয়া গেল। নবাব ওস্‌মানের প্রেরিত এক পত্রও সে মানসিংহকে প্রদান করিল। এই সকল

পরিবর্ত্তনের সংবাদ মানসিংহ অবিলম্বে দিল্লীতে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

মানসিংহ পুরুষোত্তমে এক সপ্তাহমাত্র থাকিবেন, স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু দশ দিন অতীত হইয়া গেল, এখনও তাঁহার শিবির উঠাইবার আদেশ প্রচারিত হইল না, অথবা সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কাহার নিকট কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শুনা গেল না।

রামচন্দ্রের সহিত মানসিংহের এ কয়দিন পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যার শাসনাদি বিষয়ের নানা কথার আলোচনা হইতেছে। তাঁহারা নির্জ্জনে আলাপ করিয়া স্থির করিয়াছেন, ওস্মান খাঁ বর্ত্তমানে সন্ধির নিয়ম যে অধিক দিন পালন করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। একে তো নবাবের প্রকৃতি নিতান্ত দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে আবার তিনি অতিশয় তেজস্বী; সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ধীরভাবে আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের সহিত তিনি সম্প্রতি যে সকল উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ভাবী বিসংবাদের লক্ষণ সূচিত হইতেছে। তিনি মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, মানসিংহের প্রেরিত পত্রের সদুত্তর দেন নাই; মানসিংহের সুবিধা অসুবিধার কোন সন্ধান করেন নাই এবং মানসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণের অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বাদশাহের প্রীতি ও অনুরাগ তিনি প্রার্থনা করেন না, মানসিংহের বিরাগ তিনি গ্রাহ্য করেন না এবং আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না। বর্ত্তমান সন্ধির পূর্ব্বে মানসিংহ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত আছেন। তাই সন্ধি-ভঙ্গ না করিয়া যুদ্ধের প্রবর্ত্তক তিনি হইবেন না। পাঠানগণ সন্ধি-ভঙ্গ না করিলে মানসিংহ কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

অদ্য নবাব ওস্মান খাঁ পুরী আগমন করিবেন এবং মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, সম্মান প্রদর্শনার্থ সাক্ষাৎ করিতে তিনি মহারাজের নিকট আসিতেছেন না; সেরূপ অভিপ্রায় হইলে তিনি পূর্ব্বেই আসিতেন এবং তাহার ব্যবস্থা অনুরূপ হইত। নবাব সাহেব সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, স্বকীয় বিবিধ প্রয়োজনে তিনি অদ্য মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

অপরাহ্ণকালে মহারাজ মানসিংহ দরবারমণ্ডপে উপবিষ্ট। পাত্রমিত্র ব্যতীত মহারাজ রামচন্দ্র দেবও তথায় উপস্থিত। এখনই নবাব ওস্মান তথায় আগমন করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবামাত্র দামামা বাজিল, তূর্য্যধ্বনি হইল। মহারাজ মানসিংহ স্বগণসহ মণ্ডপদ্বারে উপনীত হইলেন। নকিব ফুকরাইল। তৎক্ষণাৎ নবাব ওস্মান খাঁ সকলের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বিহিত শিষ্টাচারাদি সহ অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার নিমিত্ত বিচিত্র সিংহাসন স্থাপিত ছিল, নবাব সাহেব তাহাতে উপবেশন করিলেন।

কি সুন্দর ও সৌম্য মূর্ত্তি! একটু চিন্তিত, একটু সঙ্কিষ্ট, সুতরাং একটু ম্লানভাব হইলেও ওস্মানের মূর্ত্তি কি শোভাময়! অতি সুন্দর পরিচ্ছদে নবীন নবাবের দেহ সমাচ্ছন্ন। বামপার্শ্বে মুক্তা ও হীরকখচিত কোষমধ্যে অসি ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিতে করিতে দুলিতেছে, মস্তকে অতি শোভাময় উষ্ণীব।

নবাব-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও কুশলবিষয়ক প্রশ্নাদির পর মহারাজ মানসিংহ পরলোকগত ইষা খাঁর পীড়া, মৃত্যু ও সমাধি প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর লোকান্তরগত মন্ত্রীর নানাপ্রকার সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন, "আমার মনে ছিল না যে, উড়িষ্যায় আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। নবাবের এ আগমন আমার অশেষ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।"

মহারাজের এ শ্লেষপূর্ণ বাক্য ওস্মানের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আমাদিগের প্রতি কৃপা থাকিলে বা আমাদের দর্শনার্থ আগ্রহ থাকিলে মহারাজ নিশ্চয়ই দর্শন দিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেন; আত্মীয় ব্যক্তির দর্শনলাভ সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তাহা থাকিলে আমরা হাজির থাকিবার জন্য হুকুম পাইতাম না। যাহারা হুকুমের দাস, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

মানসিংহের উক্তির পূরা—পূরার অপেক্ষাও একটু বেশী উত্তর হইয়া গেল। উত্তর স্পষ্ট নহে, শ্লেষপূর্ণ বা ব্যর্থ নহে। মানসিংহ একটু বিরক্ত

হইলেন; স্পষ্ট কথাই বলিবেন স্থির করিলেন;—বলিলেন, "হুকুমের দাসও কখন কখন পরমাত্মীয় হইয়া থাকে। সে তাহার গুণ ও দক্ষতা। নবাব অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আত্মীয় হওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন।"

ওস্মান বড়ই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। স্পষ্টই তাঁহাকে মুখের উপরই হুকুমের দাস বলা হইল। তিনি অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা অসীম, তেজস্বিতা, সাহস, বীরত্বও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এ সকল মহদ্গুণের সহিত সহিষ্ণুতার চিরবিরোধিতা হওয়াই সম্ভব কিন্তু ওস্মানের হৃদয়ক্ষেত্রে বিরোধী গুণনিচয়ও স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধমান হইত। আয়েষার সহিত প্রেম-ব্যাপারে ওস্মান অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় নিয়তই দিয়া আসিতেছেন। এ স্থলে অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে ওস্মান স্থির হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন, "বঙ্গের সুবেদার মানসিংহ বাহাদুর, আমি আপনার সহিত বিবাদ করিতে আসি নাই। আপনার ন্যায় ব্যক্তির সহিত আমার বাগ্‌বিতণ্ডা শোভা পায় না। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আমার বাসনা ছিল। তাহাতে উভয় পক্ষের ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি আজি যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত সে সকল পরামর্শ করা আমি আর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি না। আমি এখনই আপনার শিবির হইতে চলিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব্বে একটি কথা আপনাকে জানাইতে আমি বাধ্য। বিষয়টি আপনাদের পারিবারিক, তাহা ব্যক্ত করা আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক। কিন্তু ধর্ম্ম, বিবেক, ন্যায়পরতা, সকলেই আমাকে শতমুখে তাহা আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছে। এই জন্যই তাহা ব্যক্ত করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনি তাহা এক্ষণে শ্রবণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি?"

মহারাজ কহিলেন, "আপনি যাহা ব্যক্ত করিবেন, শ্রবণ করিতে আমার আপত্তি নাই; আপনার সহিত কোনরূপ বিরোধ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আপনি আমার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিতেন।"

ওস্মান বলিলেন, "সে সকল কথা এখন থাকুক। আমি আর সে সকল অপ্রীতিকর বাক্যের আলোচনায় ইচ্ছুক নহি। আমি আপাততঃ আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আপনার পুত্র জগৎসিংহকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত বন্দী করিয়াছেন। যে সকল কারণে সেই বীরকে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, নবাবনন্দিনী আয়েষার প্রতি প্রণয় প্রকাশ তাহার মধ্যে অন্যতম হেতু। এ কথা কি সত্য?"

মানসিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "নবাব-কন্যা আয়েষার প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার হৃদয়ে প্রেম-উৎপাদন জগৎসিংহের একটা গুরুতর অপরাধ বটে; কিন্তু সে জন্যই তাঁহার দণ্ড হয় নাই। তিনি অবাধ্য, রাজকর্ম্মে অমনোযোগী এবং বিরোধিগণের সহিত আত্মীয়-সূত্রে বদ্ধ। এই সকল গুরুতর অপরাধ হেতু তাঁহার প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করা হইয়াছে।"

ওস্মান বলিলেন, "তাঁহার সহিত দণ্ডের যৌক্তিকতা বা তাঁহার কৃত কর্ম্মের বৈধতা ইত্যাদি কোন বিষয়ে কোন কথাই বলিতে আমার অধিকার নাই। সে সকল বিষয় আমি জ্ঞাত নহি; সুতরাং সেই সকল প্রসঙ্গ শুনিবার বা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমার প্রয়োজন নাই। জগৎসিংহ আমার শত্রু। নানা কারণে আমি তাঁহার হিতৈষী নহি। কিন্তু আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় অকারণ শত্রুর অধঃপতন দেখিতে ইচ্ছা করি না বা নিরপরাধে কাহাকেও লাঞ্ছিত দেখিয়া সুখী হই না। এই জন্যই আপনার নিকট পারিবারিক রহস্য ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।"

মানসিংহ বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কি, স্পষ্টরূপে প্রকাশ করুন।"

ওস্মান বলিলেন, "আয়েষার প্রণয় সম্বন্ধে জগৎসিংহ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, জগৎসিংহ বাক্যে ও ব্যবহারে, ছলে বা কৌশলে কোন দিন আয়েষার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করেন নাই। আয়েষা স্বতঃই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী। জগৎসিংহ সে কথা আয়েষার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াও কোন দিন সে অনুরাগের প্রশ্রয় দেন নাই। কোন দিন একটা প্রণয়সূচক বাক্যে আয়েষার উৎসাহ-বর্দ্ধন করেন নাই। জগৎসিংহ আমার পরম শত্রু হইলেও সত্যের অনুরোধে, ন্যায়ের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে

আমি এ কথা আপনাকে জানাইতে বাধ্য। সেই কর্ত্তব্যপালন করিয়া অদ্য আমি হৃদয়ের ভার লঘু করিলাম।"

মানসিংহ কহিলেন, "তবে আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জগৎসিংহকে আহ্বান করিয়াছিলেন কেন?"

ওস্মান একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"সে সংবাদও আপনি জ্ঞাত আছেন? উত্তম। আয়েষা আমার জীবনের ধ্রুবতারা! আয়েষাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু আয়েষার হৃদয় জগৎসিংহে পূর্ণ; সে হৃদয়ে এ অভাগার জন্য একটুও স্থান নাই। সুতরাং জগৎসিংহ আমার বধ্য—পরম শত্রু। জগৎসিংহের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইলে হয় তো আয়েষার শূন্য হৃদয়ে আমার একটু স্থান হইবে, ইহাই আমার শেষ আশা। সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমি জীবিত আছি। জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাভূত করিতে পারি নাই, জগৎসিংহের যাবজ্জীবন কারাবাসেও আমার বাসনাসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি জীবিত থাকিলে আয়েষা তাঁহাকে ভুলিবেন বলিয়া কোন আশা করা যায় না। জগৎসিংহের মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।"

মানসিংহ বলিলেন, "আপনার শত্রুতা বড়ই অদ্ভুত। আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রক্ষালিত করিয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে চাহেন; অথচ তাঁহার মরণ দেখিবার নিমিত্ত সতত ব্যাকুল।"

ওস্মান বলিলেন, "ধর্ম্মের শাসন ও স্বার্থের প্রয়োজন, এই দুই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিতায় আমি আপনার বিচারে অদ্ভুতরূপে প্রতীত হইতেছি। কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। আমার বক্তব্যের শেষ হইয়াছে। আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

মানসিংহ বলিলেন, "রাজকীয় ব্যাপারের দুই একটা কথা বলিবার ও বুঝিবার আবশ্যক ছিল। আপনাকে আতিথ্য-সৎকারে সৎকৃত করিবার বাসনা ছিল।"

ওস্মান খাঁ আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকীয় ব্যাপারের মীমাংসা পত্র ও দূত প্রেরণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে। আর আতিথ্যের কথা; যাহারা হুকুমের দাস, তাহাদের সহিত সে শিষ্টাচার প্রকাশ না করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।"

সকলকে সেলাম ও আপ্যায়িত করিয়া নবাব ওস্মান খাঁ মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহারাজ মানসিংহ রাজা রামচন্দ্র ও অন্যান্য পাত্রমিত্রগণকে বলিলেন, "মোগল-পাঠানের সন্ধির অবসান হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

মানসিংহ একটু উদ্বিগ্নচিত্তে সভাভঙ্গ করিয়া জগন্নাথদেবের আরতি দর্শনার্থ যাত্রার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

মানসিংহ উড়িষ্যা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বর্ণগড়দুর্গে নবাব ওস্মান খাঁর নিকট সকল সংবাদ আসিয়াছে। নবাব-বাদশাহদিগের গুপ্তচর বোধ হয় বৃক্ষপ্রস্তরের মধ্যেও বাস করে।

নবাব এক দিন মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাক্ষাতের ফল বোধ হয়, কোন পক্ষেরই সন্তোষজনক হয় নাই। পাঠানগণ মনে করেন, নবাব যখন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরী গমন করিয়াছিলেন, তখন মহারাজের উড়িষ্যাত্যাগের পূর্ব্বে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল; মহারাজ তাহা করেন নাই; সুতরাং পাঠানগণ যে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

নবাব ওস্মান খাঁ স্থির করিয়াছিলেন, অচিরে সন্ধিভঙ্গ করিতে হইবে। এরূপ অপমানজনক ব্যবহার স্মরণ করিয়া সন্ধি রক্ষা করা অসম্ভব। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, সহজ দৃষ্টিতে সাধারণে পাঠানগণকেই সন্ধিভঙ্গকারী বলিয়া ঘোষণা করিবে; কিন্তু তাঁহারা জানেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে মহারাজ মানসিংহ সন্ধি-উচ্ছেদকারী।

নবাব যুদ্ধের নিমিত্ত আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যুদ্ধে জয় হউক বা না হউক, তিনি যুদ্ধ না করিয়া মোগলদিগের এই প্রাধান্য নীরবে সহ্য করিবেন না। নবাব ওস্মান এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নূতন মন্ত্রী খিজর খাঁ এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন।

দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া ওস্মান একাকী চিন্তা করিতেছেন। সহসা সেই কক্ষের

অন্তঃপুরসংলগ্ন একটি দ্বার খুলিয়া গেল। দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল, "নবাব এখন একাকী আছেন? আমি একবার অতি সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত নবাবের নিকটে যাইতে পারি কি?"

কণ্ঠস্বর আয়েষার। অন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া যিনি কখন কোথায়ও পাদচরণা করেন না, যাঁহাকে প্রতিনিয়ত মনে মনে ধ্যান করিলেও ওস্মান কখন সাক্ষাৎ করিয়া বিরক্ত করিতে সাহস করেন না, সেই আয়েষা উপযাচিকাভাবে সাক্ষাতের অভিলাষিণী। কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র ওস্মান চমকিত হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "সাক্ষাতের অনুমতি চাহিতেছ? এ কি গঞ্জনা? যদি সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমার নিকটস্থ হইতাম। আইস—এখানে কেহ নাই।"

নবাব উঠিয়া দ্বারসন্নিকটে গমন করিলেন। অবনত মুখে আয়েষা ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। নবাব কক্ষের সম্মুখদ্বারসমূহ স্বহস্তে রুদ্ধ করিয়া আয়েষার সমীপস্থ হইলেন;—বলিলেন, "এ কি সৌভাগ্য আয়েষা! সহসা আমাকে তোমার মনে পড়িল কেন? যাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে পরমানন্দে তোমার নিকট উপস্থিত হইত, কষ্ট করিয়া তাহার নিকট আসিবার প্রয়োজন কি?"

আয়েষার বদন বিষাদমাখা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নত মুখে বলিলেন, "তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে ক্ষতি ছিল না জানি; কিন্তু অনেক কথা ভাবিয়াই না ডাকিয়া স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি যদি মনে করিয়া থাক, আমি কখন তোমাকে মনে করি না, তাহা হইলে, ওস্মান, তোমার বিষম ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু সে কথায় এখন আর প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি।"

ওস্মান বলিলেন, "বল, তোমার কথা শুনিতে পাওয়া আমার পরমানন্দ। দাঁড়াইয়া থাকিলে কেন? এই আসনে উপবেশন করিয়া কি বলিতে চাহ, বল।"

আয়েষা আসন গ্রহণ করিলেন। আসন গ্রহণ না করিলে তিনি হয় তো মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে ও কথা কহিতে সক্ষম হইবেন না ভাবিয়া উপবেশন করিলেন। আসনে বসিয়া আয়েষা অধোমুখ, নীরব রহিলেন এবং হস্তে ওড়নার অগ্রভাগ ধরিয়া সূত্রাকারে পাক দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া ওস্মান আবার বলিলেন, "বল আয়েষা, যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর।"

আয়েষা ওড়না ছাড়িয়া দিলেন;—বলিলেন, "তুমি আজিকালি যুদ্ধায়োজনে বড় ব্যস্ত, তোমার এখন হয় তো অনর্থক কথা শুনিবার সময় নাই। আমি আর এক সময় যাহা বলিতে হয় বলিব। এখন যাই।"

ওস্মান বলিলেন, "আয়েষা, তাহা হইলে আমার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হইবে। তোমার কথা সম্পূর্ণ অনর্থক হইলেও আমার পক্ষে অতিশয় সার্থক। আর আয়েষা, সকল কর্ম্ম রসাতলে দিয়াও যে ব্যক্তি তোমার কথা শুনিতে অভিলাষী, তাহাকে ব্যস্ত মনে করিয়া মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছে কেন?"

আবার আয়েষা বামহস্তে ওড়নার প্রান্ত ধরিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে জড়াইতে লাগিলেন। কথা যেন মুখে বাধিতে লাগিল। ওস্মান বলিলেন, "বল আয়েষা, কি বলিবে, বল। তোমার কথা শুভই হউক আর অশুভই হউক, আমি তাহা শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি।"

আয়েষা ওড়না ছাড়িয়া দিলেন;—বলিলেন, "তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ কর, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু আমি তোমার কোনই উপকার করিতে পারি না।"

আয়েষা নীরব হইলেন। ওস্মান, বলিলেন, "আমি তোমাকে কি অনুগ্রহ করি, জানি না, তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, আমি তোমার হিতৈষী, তাহা হইলে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সে জন্য কোন কৃতজ্ঞতার কথা তোমার মুখে শুনিতে ভাল লাগিবে না। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী, তুমি এ নবাবপুরীর অলঙ্কার। তুমি সকলেরই উপকার করিয়া থাক, তবে আজি ঐ কথা বলিতেছ কেন আয়েষা?"

আয়েষা অধোমুখে বলিলেন, "আমি এ অকৃতজ্ঞ দেহপ্রাণ লইয়া এখানে আর থাকিব না মনে করিয়াছি।"

ওস্মান উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিবে না মনে করিলে তোমাকে জোর করিয়া কে রাখিতে পারে? আমি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই তোমার কার্য্যে বাধা দিতে পারি,

কিন্তু তোমার কার্য্যে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে আমার কখনই প্রবৃত্তি নাই। আয়েষা, এ কি কথা তুমি আমাকে বলিতেছ? তুমি এখানে না থাকিলে থাকিবে কে? তুমি আছ বলিয়া অধম ওস্মান এখনও বাঁচিয়া আছে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে আমি লাভ করিতে পারিলাম না; কিন্তু ওস্মান আশা ত্যাগ করে নাই, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ সে তোমার করুণা-লাভের আশা করিবে। সেই আশাই তাহার পক্ষে এখন পরম সুখের কেন্দ্র। ওস্মানের সে সাধের আশালতা নির্ম্মূল করিয়া তোমার কি আনন্দ হইবে আয়েষা? কেন তাহার বজ্রহৃদয় এরূপে চূর্ণ করিবার কল্পনা করিতেছ? আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইতে চাহ, আয়েষা?"

আয়েষা উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "ওস্মান!" কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত, একটু সংক্ষুব্ধ। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ওস্মান। তোমার হৃদয় অতি উচ্চ, একান্ত উদার। তোমার ভালবাসা তুলনারহিত—মনুষ্যলোকে তাহা দুর্লভ। কিন্তু"—আবার আয়েষা নীরব।

ওস্মান সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "কিন্তু কি আয়েষা?"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি আমাকে ভালবাসিয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ করিতেছ। এই পাষাণীকে ভালবাসিয়া তুমি নিরন্তর যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছ। আমার বোধ হয় এই অভাগিনী তোমার সম্মুখ হইতে অন্তরিত হইলে উভয়েরই মঙ্গল হইবে।"

আয়েষা নীরব। ওস্মান ধীরভাবে এই হৃদয়-ভেদী বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আয়েষা, এ কাতর ব্যক্তিকে প্রাণে মারিয়া তোমার কি লাভ হইবে? যে ভবনে আয়েষা বাস করেন, সেই ভবনে এ অধমও বাস করে; ইহাও আমার একটা পরম আনন্দের বিষয়। আমার এই আনন্দ হরণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে আয়েষা? ইচ্ছা করিলে আমি দূর হইতেও আয়েষাকে দেখিতে পাই অথবা আয়েষার মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাই, ইহাও আমার পরম সুখ। আমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া তোমার কি উপকার হইবে আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন, "ওস্মান, তুমি সুধীর ও সুবুদ্ধিমান্। ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ, ইহাতে উপকার হইবে। অদর্শনে বা দূরাবস্থানে তুমি হয় তো যন্ত্রণার কারণকে ভুলিতে পারিবে।"

ওস্মান শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি ভ্রান্তি আয়েষা, অদর্শনে বা দূরাবস্থানে প্রণয়াস্পদকে কখন ভুলিতে পারা যায় কি? এই পুরমধ্যে অবস্থান করিলেও আমি কদাপি তোমার নিকটস্থ হই না; বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তোমার সহিত দুই এক দিন মাত্র দেখা করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ অদর্শনেও চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি আয়েষা? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তুমি যাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার সহিত বহুকাল তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি তুমি তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছ না কেন আয়েষা?

আয়েষা বলিলেন, "পুরুষের অনেক অবলম্বন, অনেক উপলক্ষ এবং অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে। নারীর সহিত প্রেম তাঁহাদের একটা ক্রীড়ার সামগ্রী। তাঁহারা অনায়াসেই প্রেমের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেন। আমি ভরসা করি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি এ পাষাণীর কথা সহজেই ভুলিতে পারিবে।"

ওস্মান কহিলেন, "দুরাশা—আয়েষা, দারুণ দুরাশা। কবরের মাটীতে যদি এ আকাঙ্ক্ষা মিশিয়া যায় তো বলিতে পারি না; কিন্তু শরীরে নিশ্বাস বহমান থাকিতে তোমাকে ভুলিবার কোন আশা নাই। বলিয়াছি, তোমাকে আশাই আমার সম্বল। আমি আশা করিয়া আছি, নিদারুণ তাপে পাষাণও গলিয়া যায়, ঈশ্বরের বাসনা হইলে মরুভূমিতেও সমুদ্রের উদ্ভব হয়। আয়েষা, বাঁচিয়া থাকিলে কখন না কখন তুমি ওস্মানের ভালবাসার প্রগাঢ়তা প্রণিধান করিতে পারিবে, ওস্মানকে হয় তো ভালবাসিতে ইচ্ছা করিবে। সেই দিন এ অভাগা ধন্য হইবে।"

আয়েষা বলিলেন, "তোমার ভালবাসা অতি মহৎ, অতি উদার, অতি প্রগাঢ়; এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তাহা প্রণিধান করি না মনে করিলে আমার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তোমার হিতার্থে দুষ্কর কর্ম্ম করিতেও সক্ষম; কিন্তু হায়! কি বলিব? আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; এ নিবেদিত বস্তু আর কাহাকেও দান

করিবার অধিকার নাই। যাহা দিয়াছি, তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিতে আমার সাধ্য নাই; সুখই হউক বা দুঃখই হউক, আমি মনে মনেও দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। তুমি আমাকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, এখনও আমাকে ক্ষমা কর। ওস্‌মান, আমি সাষ্টনয়ে নিবেদন করিতেছি, বৃথা এ অভাগিনীর আশায় আপনার সুখ নষ্ট করিও না। আমি কাতরভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ইচ্ছামত সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়া জীবনকে সুখময় কর; অনর্থক এ পাপিনীর আশায় মুগ্ধ থাকিয়া, ওস্‌মান, তোমার কর্ম্মময় প্রয়োজনীয় জীবনকে ধ্বংস করিও না!"

ওস্‌মান কহিলেন, "আয়েষা, আমার জীবন ও মরণে তুমিই আমার আরাধ্যা। তোমাকে না পাই, যেরূপে এত দিন নীরবে বেদনা সহ্য করিতেছি, এখনও তাহাই করিব। তবে এক শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। তুমি যাহাকে ভালবাস, সেই ভাগ্যবান্‌কে আমি স্বহস্তে বধ করিব। তাহার পর হয় তো তুমি স্বাধীনা হইবে। তখন হয় তো তোমার অনুগ্রহ লাভ করিলেও করিতে পারিব। তখনও যদি মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও পাঠান ওস্‌মান প্রতিদ্বন্দ্বিনাশজনিত সন্তোষলাভ করিয়া সুখী হইবে।"

আয়েষা বলিলেন, "সংসারের অমঙ্গল-স্রোত বৃদ্ধি করিতেই হয় তো আয়েষার জন্ম হইয়াছিল। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। তোমাকে সুখী দেখিতে পাওয়াই আমার প্রধান আকিঞ্চন। বোধ করি, বিধাতা অভাগী আয়েষার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য লিখেন নাই। আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আমি বিদায় হই; জীবনে হয় তো তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। যদি তোমার কোন বিপদে আমার দ্বারা উপকার হইতে পারে, তখন আমি যেখানে থাকি, উপস্থিত হইব। ভাই ওস্‌মান, আমাকে দুঃখিনী ভগিনী বলিয়া মনে রাখিও। না—না, আমাকে সর্ব্বপ্রকার যত্নে ভুলিতে চেষ্টা করিও।"

ওস্‌মান অধোমুখী আয়েষার হৃদয়বিদারক কথা শুনিতেছিলেন। তিনি তখন নানাবিধ ভয়ানক কল্পনায় প্রমত্ত। যখন তিনি মস্তকোত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলেন, আয়েষা তথায় নাই। দীর্ঘশ্বাস সহ উভয় হস্তে মস্তকের কেশসমূহ ধারণ করিয়া নবাব বলিলেন, "ওঃ!"

M/S made over on 24.10.60.

নবাব-নন্দিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারাগার

কোথায় জগৎসিংহ? পাটনার লৌহ-কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় পতিত বীর প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কারাগার অন্ধকার। শৃঙ্খলনিবদ্ধ বীর একখানি চারি-পায়ার উপর উপবিষ্ট। এ দুর্দ্দশার কি শেষ হইবে না? আর কি চন্দ্রসূর্য্যের মুখ তিনি দেখিতে পাইবেন না? আর কি সেই জীবন-সর্ব্বস্ব তিলোত্তমার সহিত একবারও মিলন হইবে না? এই কারাগারের অন্ধকারমধ্যেই কি জীবন সমাপ্ত হইবে? সকল আশারই কি এই শেষ?

মধুরভাষিণী আশা বলিতেছে, "ধীরতার সহিত অপেক্ষা কর, এ দুর্দ্দিন নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে। জগতে কবে কোথায় কাহার দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী হইয়াছে? জগৎসিংহ স্বকীয় জীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া দেখিতেছেন। অতি অল্পকালমধ্যে তাঁহার কত দশা-বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! তিনি সকলই অতিক্রম করিয়া আবার সুখের মুখ দেখিয়াছেন। এবারও কি সেরূপ ঘটিবে না?

কেহ কি তাঁহার দুঃখের জন্য চিন্তা করিতেছে? কেহ কি তাঁহার ক্লেশের গুরুতা প্রণিধান করিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেছে? জগৎসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার এই বিপদ্বার্ত্তা শ্রবণে তিলোত্তমা নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সেই সুশীলা বালা না জানি কতই যাতনা ভোগ করিতেছেন; না জানি, এই নিদারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার দেহ-মন কতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! এ দুরবস্থায় স্বকীয় ক্লেশের অপেক্ষা তিলোত্তমার চিন্তাই জগৎসিংহকে অধিকতর প্রপীড়িত করিতেছিল। যদি কোন উপায়ে তিলোত্তমাকে একটা সংবাদ দেওয়া হইত, যদি কাহারও দ্বারা তাঁহার নিকটে জগৎসিংহের একটা কুশল-সংবাদ প্রেরণ করার উপায় হইত, তাহা হইলেও তিনি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন; একটু শান্তি লাভ করিতেন। কিন্তু উপায় কোথায়?

জগৎসিংহ এইরূপ ক্লেশে ও চিন্তায় দিন কাটাইতেছেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কোন আশাই তো সফল হইতেছে না। তথাপি আশা যায় না; অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় রাত্রি চলিয়া যাইতেছে, অতি ক্লেশে—কর্ম্মহীনতায় দিন কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু আশা তো যাইতেছে না।

এক দিন প্রাতে জগৎসিংহের একটু নিদ্রা আসিয়াছে। সমস্ত রাত্রি তিলোত্তমার জন্য ভয়ানক চিন্তার পর একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সে অবস্থাতেও তিনি নিশ্চিন্ততার সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তখনও তিলোত্তমা-সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট উদ্বেগ তাঁহার হৃদয়ে ক্ষীণভাবে যাতায়াত করিতেছে।

সহসা সেই লৌহ-কারাগারের লৌহ-দ্বার ঘর্ঘর শব্দে খুলিয়া গেল; সে শব্দ জগৎসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে। সেই কঠোর কর্কশ শব্দ তাঁহার কর্ণে তিলোত্তমার সুমধুর মঞ্জীর-ধ্বনি বলিয়া উপলব্ধ হইল। তিনি নিদ্রাবশে মুদিত নয়ন দিয়া দেখিতে লাগিলেন, সেই প্রেমিকা পত্নী কুসুম-মালিকা হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। যুবরাজ কহিলেন, "অসি ফেলিয়া দিয়াছি, তোমার কথা পালন করিয়াছি; আর মালা ছিন্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

উন্মুক্ত দ্বার দিয়া কারারক্ষক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাজপুত্রের শয্যা-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল, "যুবরাজ!"

স্বর জগৎসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে; তিনি শুনিলেন, তিলোত্তমা বলিতেছেন, "প্রাণেশ্বর!"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন, "হৃদয়েশ্বরি!"

কারারক্ষক আবার ডাকিল, "যুবরাজ!"

রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন, "যাই, যাই, ভয় কি ?" জগৎসিংহ উদ্বেগের সহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে কারারক্ষকের অপ্রিয়-দর্শন পুরুষ-মূর্ত্তি। কোথায় তিলোত্তমা? যে সুন্দরীর বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ধাবমান হইতেছিলেন, সে তিলোত্তমা কোথায়? জগৎসিংহ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে করিলেন, 'হায়, স্বপ্নে সুখভোগ করাও অভাগার অদৃষ্টে নাই।' তিনি কাতরভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন। কারারক্ষক বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

জগৎসিংহ হস্ত দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "প্রাতঃকালে তোমার কি সংবাদ কারারক্ষক?"

কারারক্ষক সবিনয়ে বলিল, "এক জন সন্ন্যাসী, যুবরাজ কারাগারে প্রবেশ করার কিঞ্চিৎকাল পর হইতে নিয়ত রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিতেছেন।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তাহার পর?"

কারারক্ষক বলিল, "আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দিতে পারিতেছি না।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তবে সে কথা আমাকে জানাইতেছ কেন?"

কারারক্ষক বলিল, "এক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন, 'যদি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মহারাজ জানিতে পারিলে বিশেষ বিরক্ত হইবেন এবং রাজকার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট হইবে'।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কি স্থির করিয়াছ?"

কারারক্ষক বলিল, "আমরা তাঁহাকে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তবে এ সকল কথা আমাকে শুনাইতেছ কেন?"

কারারক্ষক বলিল, "সেই সন্ন্যাসীকে আসিতে দেওয়ায় হয় তো যুবরাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং যুবরাজের মঙ্গল-জনক জানিয়া আমরা যে কার্য্য করিতেছি, তাহা হয় তো অমঙ্গলজনকও হইতে পারে।"

রাজপুত্র একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার যে অমঙ্গল চলিতেছে, তাহার অপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল আর কিছু দেখিতেছি না। যে কোন লোক আমার সহিত দেখা করিতে আসুক, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই; তোমাদের আপত্তি না থাকিলে তোমরা যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিতে পার। আমার তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোন কারণ নাই।"

কারারক্ষক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। জগৎসিংহ একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মুক্তির কোন আশা নাই। মহারাজ যখন যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সে বাক্যের অন্যথা আর কে করিবে? শত-সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও মহারাজ স্বয়ং কখনই স্বীয় বাক্যের অন্যথা করিতে পারিবেন না। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তিনি তাহা করিতে পারেন না। যদি তাহা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদ-গৌরব ও শাসন-শক্তি সকলই ধিকৃত হইবে; তাঁহার প্রতাপ রসাতলে যাইবে; তাঁহার ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিদ্রূপের বিষয় হইবে।

তবে মুক্তির কি কোন উপায় নাই? তবে কি তাঁহাকে চিরদিন এইরূপে কারাগারে জীবনপাত করিতে হইবে? এক উপায় আছে। বাদশাহ কৃপা করিলে সকলই হইতে পারে। তিনি যদি কৃপা করিয়া জগৎসিংহের সম্বন্ধে অনুকূল আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে মহারাজ মানসিংহ, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহার প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু সে কার্য্য কে করিবে? দিল্লীতে বাদশাহ-দরবারে জগৎসিংহের আবেদন লইয়া কে যাইবে? কাহার কথাই বা সেখানে কে শুনিবে? সে দরবারে উপস্থিত হইয়া জগৎসিংহের উপকার করিতে কে অগ্রসর হইবে?

কাতর ও অপ্রসন্ন-বদন এক সন্ন্যাসি-বেশধারী পুরুষ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে সেই কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র জগৎসিংহ চিনিতে পারিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এ কি? আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?"

আগন্তুক আমাদের সুপরিচিত অভিরাম স্বামী। তিনি বলিলেন, "আমার এখানে অধিকক্ষণ থাকিবার সুবিধা হইবে না; সুতরাং সংক্ষেপে সকল কথা বলিতেছি। তোমার এই দণ্ডের কথা যে দিন শুনিয়াছি, তাহার পরদিনই আমি গড়মান্দারণ ত্যাগ করিয়াছি। সেই অবধি আমি এইখানেই আছি।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "গড়মান্দারণের সংবাদ আপনি কিছু জানেন ?"

অভিরাম বলিলেন, "জানি। সকলেই কুশলে আছেন, তোমার জন্য সকলেই কাতর। তিলোত্তমার ক্লেশের সীমা নাই।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে চলিয়া আসার পর আপনি আর গড়মান্দারণের কোন সংবাদ পান নাই ?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "পাইয়াছি। এক মাস পূর্ব্বে আমার আশ্রিত গজপতি এখানে আসিয়াছে। তাহার নিকট বিমলার এক পত্র ছিল, সেই পত্রে আমি সকলের শোকাকুল কাতরাবস্থার সংবাদ পাইয়াছি! তিলোত্তমা জীবিত আছে; কিন্তু বড়ই ক্লেশে সে জীবনপাত করিতেছে, এ সংবাদও আমি পাইয়াছি। আমার চেষ্টায় অবশ্যই তোমার মুক্তি হইবে, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এত দিন এখানে আছেন কেন ?"

"তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়—তোমার মুক্তির উপায়-চিন্তায়।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "প্রথম আশা সফল হইল কিরূপে ?

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "প্রভূত পুরস্কার দ্বারা কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া অতি অল্পসময়ের নিমিত্ত সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আপনি সে জন্য বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিবেন না।"

অভিরাম স্বামী ঝুলির মধ্য হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "হতাশ হইও না, নিশ্চয় আমার দ্বিতীয় আশাও সফল হইবে। তুমি এই কাগজে সহি করিয়া দেও, আমি কালি-কলম দিতেছি। বাদসাহ-দরবারে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "সে স্থানে চেষ্টা হইলে সফলতার আশা করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু সে কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে ? আপনি কাহার সহায়তা লাভ করিয়াছেন ?"

অভিরাম বলিলেন, "যিনি এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার উদ্যমে ও উৎসাহে আমারা কার্য্য করিতেছি, যাঁহার অর্থব্যয় ও আগ্রহে আমারা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছি, তিনি সকলই করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।"

"কে তিনি ?"

অভিরাম বলিলেন, "নবাবনন্দিনী আয়েষা।"

জগৎসিংহ বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "আয়েষা! তাহার সাহায্য আপনি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন ?" অভিরাম বলিলেন, আমাকে সংগ্রহ করিতে হয় নাই। তিনি তোমার মুক্তির জন্য জীবনান্ত করিতে প্রস্তুত। তোমার আবেদনপত্র লইয়া তিনি হয় তো স্বয়ং দিল্লী গমন করিবেন। সেখানে সকল ব্যবস্থাই স্থির আছে। তোমার আবেদনপ্রাপ্তিমাত্র মুক্তির আদেশ হইবে সন্দেহ নাই।"

জগৎসিংহ মনে মনে বলিলেন, "আয়েষা—চিরহিতৈষিণী আয়েষা! তোমার আয়াস নিশ্চয়ই সফল হইবে! তুমি এই অকৃতজ্ঞ নরাধমের জন্য এখানে আসিয়াছ, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেছ, এ ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ করিতে আমার সাধ্য নাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "প্রভো, আয়েষার সহিত এ অধমের সাক্ষাতের কোন উপায় হয় না কি ?"

অভিরাম বলিলেন, "উপায় হইলেও নবাব-নন্দিনী তোমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী নহেন। সাক্ষাৎ উভয় পক্ষের ক্লেশের হেতু বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তোমার জন্য জীবন দিতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু সাক্ষাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অপ্রবৃত্তি। অন্যান্য কথা সময়ান্তরে বলিব, এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া এই কাগজে নাম স্বাক্ষর কর।"

স্বামীর প্রদত্ত কালি-কলম লইয়া জগৎসিংহ কাগজে নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বামী সেই কাগজ-খণ্ড সযত্নে ঝুলির মধ্যে স্থাপন করিলেন।

প্রহরী ডাকিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, বড় দেরী হইতেছে, এতক্ষণ থাকিবার কথা ছিল না।"

স্বামী বলিলেন, "যাই! যুবরাজ, আমাকে এখন বিদায় দাও। ভরসা করি, ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই শুভ সংবাদ বহন করিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।"

জগৎসিংহ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুত্রবধূ

মহারাজ মানসিংহ স্বগণসহ শ্রীক্ষেত্র হইতে পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া নিয়মিত কর্ত্তব্য-পালনে নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়াছেন। যত লোক মহারাজের সহিত তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন, সকলেই প্রত্যাগত হইয়াছেন, অধিকন্তু আর এক জন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন! তিনি মহারাজের বড়ই আদর ও স্নেহভাজন রাজলক্ষ্মী।

মহারাজ আসিয়াছেন বটে; কিন্তু কেন বলা যায় না, তিনি চিত্তের অনেকখানি প্রসন্নতা উড়িষ্যার সমুদ্রে ফেলিয়া আসিয়াছেন, অথবা জগন্নাথদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন।

মোগল-পাঠানে যে সন্ধি-বন্ধন করিয়া তিনি আপাততঃ কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সে বন্ধন যে শীঘ্রই ছিন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দোষ কাহার? মানসিংহ ও ওস্‌মান এতদুভয়ের মধ্যে সন্ধি অবহেলন-সম্বন্ধে প্রযোজক কে? পাঠানগণই নিমিত্তকারণ হইবেন, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। পাঠানেরা বড়ই উদ্ধত ও অস্থিরমতি; সুতরাং তাহারা সন্ধির বন্ধনে দীর্ঘকাল বাধ্য থাকিবে না, এ কথা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ ওস্‌মান খাঁর সাহস ও ভরসা যেমন অতুলনীয়, বীরত্ব ও দৃঢ়তাও সেইরূপ অদ্ভুত। এরূপ পুরুষ যে সম্প্রদায়ের নেতা, সে সম্প্রদায় কখনই এক অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির থাকিতে পারে কি? মানসিংহ অর্থাৎ মোগলপক্ষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ধির নিয়ম পদদলিত করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিবেন না, ইহা স্থির; সুতরাং দোষ থাকুক না থাকুক, সন্ধির অবহেলন সম্বন্ধে ইতিহাসে পাঠানেরাই অপরাধী হইয়া থাকিবেন।

তথাপি একটা কথা এ সময়ে হয় না কি? মহারাজ মানসিংহ যে পত্র লিখিয়া উদ্ধত ওস্‌মানকে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্যের সীমান্তে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন হইয়াছিল কি? পুরীতে সাক্ষাতের পর তিনি ওস্‌মানের সহিত যে ভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছিল কি? মহারাজ মানসিংহ আপন চিত্তে ইত্যাকার নানা প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার মন প্রসন্ন নহে।

কুমার জগৎসিংহকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত তিনি কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি বীরের ন্যায় সুব্যবস্থাই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এ অনুষ্ঠানে সমস্ত সৈন্য, নায়ক, সেনাপতি, অধীনস্থ তদ্বৎ ব্যক্তির সমক্ষে তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণ তাবিষয়ক গৌরব সাতিশয় সংবর্দ্ধিত হইয়াছে; স্বয়ং বাদসাহ আকবরও তাঁহার এই বীরোচিত কার্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সকলই উত্তম হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণ কি প্রসন্ন হইয়াছে? উপযুক্ত বীর পুত্রকে যৌবনের অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তিবশবর্ত্তিতায় অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ অবলম্বনে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারাদণ্ড-বিধান করিয়া পিতার উচিত কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন কি? তাঁহার হৃদয় সেই কঠিন আজ্ঞা প্রচার করার পর হইতেই কাতর হইয়াছে। কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে কাহারও নিকট সে কথা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। মহারাণী ঊর্ম্মিলা এক দিন সাহসে ভর করিয়া সাশ্রুনয়নে মহারাজের নিকট জগৎসিংহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; মহারাজ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই; সুতরাং জগৎসিংহের কথা চাপা পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে পুরীধামে নবাব ওস্‌মান এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিশেষ উদারতা সহকারে তিনি সকল বিষয়ে হউক না হউক, অন্ততঃ একটা বিষয়ে জগৎসিংহের নির্দ্দোষিতা সুস্পষ্টরূপে সমর্থন করিয়াছেন। জগৎসিংহ জ্ঞানতঃ না হইলেও বস্তুতঃ ওস্‌মান খাঁর প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী। এরূপ শত্রু ব্যক্তিও যে বিষয়ে দোষী নহেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করা নবাবের পক্ষে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। মহারাজ বুঝিলেন, ওস্‌মান এ সম্বন্ধে বিশেষ মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব-কন্যার প্রণয়-ব্যাপারে জগৎসিংহ যেরূপ নিরপরাধ, অন্যান্য অনেক বিষয়েও সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। জগৎসিংহ ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন; তাঁহাকে কোন বিষয়েই কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সেরূপ সুযোগ দিলে যে যে রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহাকে দোষী মনে করা হইয়াছে, হয় তো তাহার অনেকগুলির সঙ্গত মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত।

এক দোষ অমার্জ্জনীয়। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ

করিয়াছেন। কার্য্য অতিশয় গর্হিত হইলেও এ অপরাধে কারাদণ্ড কখনই বিহিত হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তার কালে মহারাজের যৌবন-প্রারম্ভের এক প্রণয়কাহিনী মনে উদিত হইল। মনে মনে একটু লজ্জা হইল।

চিন্তিত ও অসুস্থ-হৃদয় মানসিংহ উর্ম্মিলা-দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি অন্তঃপুর-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র উর্ম্মিলা হাসিভরা মুখে তাঁহার সম্মুখে দর্শন দিলেন। মহারাজ বলিলেন, "একাকিনী বসিয়া আছ মহারাণি? তোমার রাজলক্ষ্মী কোথায়?"

মহারাণী বলিল, "আমার রাজলক্ষ্মী! মনে থাকে যেন, রাজলক্ষ্মী তবে তোমার কেহ নহে।"

মহারাজ বলিলেন, "সে কথা বলিতে পারিব না। রাজলক্ষ্মী আমার বড় আদরের সামগ্রী। আমি তাহাকে বড়ই স্নেহ করি। কোথায় রাজলক্ষ্মী?"

মহারাজ পর্য্যঙ্কের উপর প্রথমে বসিয়া পড়িলেন; তারপর শুইয়া পড়িলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন, "তুমি আসিতেছ জানিতে পারিয়াই রাজলক্ষ্মী তোমার জন্য জল আনিতে গিয়াছেন। মুখ-হাত ধোয়ার জল সে ঠিক করিয়া না দিলে তুমি যে রাগ কর।"

মান। কাজেই। দাসীগুলা জলে কতকগুলা গোলাপ আর কর্পূর মিশাইয়া একেবারে তিত করিয়া ফেলে। খাইবার জলে এত কেওড়া দেয় যে, তাহা খায় কাহার সাধ্য। রাজলক্ষ্মী সব ঠিক করিয়া দেয়; সে অন্তরের ভক্তির সহিত আমার যত্ন ও সেবা করে। আমি মেয়েটিকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

মহারাজার কথা শেষ হইবার একটু পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মী জল লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। কথার শেষভাগ শ্রবণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। লজ্জা ও আনন্দ মিশিয়া তাঁহার মুখের বড় শোভা করিয়া দিল।

মহারাণী বলিলেন, "মহারাজ রাজলক্ষ্মীকে ভালোবাসিয়াছেন, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য; কিন্তু আমি যে কি করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিঃসন্তান; মহারাজের অনেক সন্তান আছে; তাহারা সকলেই আমাকে মা বলিয়া ভক্তি করে সত্য, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমাকে মা বলার পর হইতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রাণের মমতা দেখিয়া তাহাকে গর্ভের সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছি। এমন মা হওয়ার সুখ আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখন বুঝিতে পারি নাই।"

মহারাণীর নয়ন জলভারাকুল; কণ্ঠস্বর সংক্ষুব্ধ। মহারাজা বলিলেন, "রাজলক্ষ্মী বাস্তবিকই বড় স্নেহের সামগ্রী। তুমি যখন তাহাকে সন্তান জ্ঞান করিয়া সুখী হইয়াছ, তখন সর্ব্বপ্রকার সমাদরে তাহাকে আমাদের পরিবারভুক্ত করিয়া লওয়াই উচিত। আমি এখনই এ বিষয়ের সুব্যবস্থা করিব।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "কিরূপে তাহা হইবে মহারাজ?"

মহারাজ বলিলেন, "কেন, রাজলক্ষ্মীর পিতামাতা কন্যাকে যাহাতে আমাদের নিকট থাকিতে দেন, তাহারই ব্যবস্থা করিব।"

মহারাণী বলিলেন, "আমার কথায় রাজলক্ষ্মীর আত্মীয়গণ সে বিষয়ে কোন আপত্তি করিবেন বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

মহারাজ বলিলেন, "তবে আর উদ্বেগের বিষয় কি আছে?"

মহারাণী বলিলেন, "রাজলক্ষ্মীকে কাছে রাখাও যেমন দরকার, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করাও সেইরূপ আবশ্যক। রাজলক্ষ্মী রূপে গুণে এমন অতুলনীয়া হইলেও এক বিষয়ে বড় অভাগিনী, উহার স্বামী উহাকে গ্রহণ করে না।"

"কেন?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "স্বামী উহাকে আদর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, যত্ন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এখন বলেন, পত্নী নীচবংশীয়া, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্যা।"

মানসিংহ বলিলেন, "কেন, বংশগত কোন দোষ আছে না কি?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "আমি যত দূর জানি, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যদিই কোন দোষ থাকে, তাহাতে এ কন্যার অপরাধ কি? রাজলক্ষ্মী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দোষের কথা তুলিয়া এখন এই গুণবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করা স্বামীর পক্ষে অধর্ম্ম হইতেছে না কি?"

মানসিংহ বলিলেন, "নিশ্চয়ই স্বামীর এখন এ বিবেচনা অতি গর্হিত ও অধর্ম্মজনক। কোন কারণেই এখন এ গুণবতী পত্নীকে কষ্ট দেওয়া স্বামীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের উচিত কার্য্য হইতেছে না। রাজলক্ষ্মীর স্বামী কে? সে কি করে?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "সে মহারাজার অধীনস্থ এক জন সৈনিক। মহারাজ কৃপা করিলে রাজলক্ষ্মীর এই কষ্ট অনায়াসেই দূর করিতে পারেন।"

মানসিংহ বলিলেন, "আমার অধীনস্থ সৈনিক! তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ইহার সুব্যবস্থা করিব। সে যাহাতে সমাদরে পত্নীকে গ্রহণ করে, তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণ যাহাতে রাজলক্ষ্মীকে সম্মান করে, আমি তাহার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিব। তুমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তাহার পর আমাদের কি হইবে? রাজলক্ষ্মীকে উহার স্বামী গ্রহণ করিলে তোমার নিকট সে ত আর থাকিবে না। তোমার মা হওয়ার সুখ তো ঘুচিয়া যাইবে।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "কেন মহারাজ! তোমার কৃপায় সকলই সুখময় হইবে। সে সৈনিক আমাদের নিকটেই থাকিবে, কন্যাও আমার কাছে থাকিবে। কন্যার মুখে আমি হাসি দেখিব; যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখে সুখী হইব; সমস্ত দিন রাজলক্ষ্মী মহারাজের পরিচর্য্যা করিবে; আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। মহারাজ, তুমি ন্যায়বান্ পরম ধার্ম্মিক। তুমি দয়া করিয়া রাজলক্ষ্মীর এই দুঃখ দূর করিবে না কি? তোমার চরণাশ্রিতা দাসীর এই করুণ-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না কি?"

মহারাণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মানসিংহ অতীব আদরে উর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিলেন;—বলিলেন, "মহারাণি, আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। কোন প্রকার আপত্তি বা প্রতিবাদ আমি শুনিব না। তোমার অনুরোধে রাজলক্ষ্মীকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমি কোন কর্ম্মই অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব না। ইহাতে যদি লোক-সমাজে বা সাধারণের চক্ষুতে আমাকে হীন বা ঘৃণিত হইতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

তখন মহারাণী উর্ম্মিলা গললগ্নীবাসা হইয়া মহারাজের চরণে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "তবে মহারাজ, তোমার পুত্রবধূ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার সম্মান রক্ষা কর।"

তৎক্ষণাৎ গলদশ্রুনয়নে রাজলক্ষ্মী আসিয়া মহারাজার চরণ-সমীপে নিপতিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ সবিস্ময়ে কহিলেন, "আমার পুত্রবধূ! সে কি মহারাণি?"

উর্ম্মিলা করযোড়ে কহিলেন, "হাঁ মহারাজ, রাজলক্ষ্মী যুবরাজ জগৎসিংহের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী।"

মহারাজ বলিলেন, "রাজলক্ষ্মী তবে কি বীরেন্দ্র-সিংহের কন্যা? না—না, সে কন্যার নাম যে তিলোত্তমা।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"এই রাজকুল-বধূর নামই তিলোত্তমা।"

মহারাজ অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "শুন মহিষি! তোমার কাতর প্রার্থনার আমি অবমাননা করিব না। আমার বাক্যের আমি অন্যথা করিব না। তিলোত্তমা পুত্রবধূ হইবার যোগ্য পাত্রী সন্দেহ নাই। আমি ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলাম। তুমি তিলোত্তমার নিমিত্ত আজ হইতে রাজমহিষীর ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দাও। অতঃপর নববধূ তোমার নিত্যসঙ্গিনী হইলেন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে তিলোত্তমা মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং একটু দূরে আসিয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাণী উর্ম্মিলাও মহারাজের চরণসান্নিধ্য হইতে দূরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, "দাসী চিরদিনই মহারাজের করুণা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে। অদ্যকার এই অনুগ্রহ দাসীর জীবনের চিরস্মরণীয় ঘটনা।"

মানসিংহ বলিলেন, "মা রাজলক্ষ্মি, এখন তুমি সত্যই আমার মা। মা'র কাজ কর; আমাকে ক্ষুধার সময় খাইতে দেও মা।"

তিলোত্তমা আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আয়েষা

পাটনায় প্রত্যাগমনের কয়েকদিন পরে মহারাজ গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলেন, পাটনায় এক সমৃদ্ধিশালী পাঠানের ভবনে কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা অতিথিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ নানা ভাবে এ সংবাদ আলোচনা করিলেন; কিন্তু ইহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে বা এজন্য কোন সাবধানতার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না। উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত তাঁহারা সন্ধি-বদ্ধ; সুতরাং সেখানকার সামান্য বা অসামান্য যে কোন লোক পাটনায় কেন, দিল্লীতেও যাতায়াত করিতে পারে। ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। তবে যদি নবাব-তনয়া প্রকাশ্যরূপে সুবেদারকে সংবাদাদি

প্রদান করিয়া আসিতেন, তাহা হইলে মানসিংহকে তাঁহার যথারীতি অভ্যর্থনা, তাঁহার সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি, তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং তাঁহার কুশলবার্ত্তা গ্রহণাদি করিতে হইত। কিন্তু তিনি যখন সে ভাবে আইসেন নাই, তখন সে সম্বন্ধেও মানসিংহের কোন কর্ত্তব্য নাই।

অনেক পাঠান কার্য্যসূত্রে পাটনায় বাস করেন। অনেকেরই অবস্থা উন্নত এবং অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রমশালী। ভারতে মোগল-পাঠানের বিবাদ অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। ইব্রাহিম লোদীর সহিত দিল্লীর সিংহাসন পাঠানদিগের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে। দায়ুদ খাঁ বাঙ্গালাদেশের সিংহাসন হারাইয়া উড়িষ্যায় পলাতক হইয়াছিলেন। উড়িষ্যায় পাঠানগণ এখনও স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রহিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা-দেশের পাঠানেরা অনেক দিন আপনাদের অপ্রতিবিধেয় নিয়তির অধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়াছে। বঙ্গদেশের পাঠানগণ মনের মধ্যে যাহাই হউক, বাহ্যে মনের অসন্তোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; সুতরাং আয়েষার গুপ্ত আগমনে বা তাঁহার পাঠানগৃহে অবস্থানে মানসিংহ সন্দেহের কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তাহ পরে এক ভয়ানক সংবাদ উপস্থিত হইয়া মানসিংহের সমস্ত শান্তি ধ্বংস করিয়া দিল। নবাব ওস্মান খাঁ পুরী আক্রমণ করিয়াছেন; রামচন্দ্র দেব পলাতক হইয়াছেন।

সংবাদ সত্য। ওস্মান খাঁ যে সন্ধি-বন্ধনে প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, এ কথা আমরা জানি। মানসিংহের কোন কোন ব্যবহারে যে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা জানি। তিনি অগ্রজ সোলেমানের সহিত পরামর্শ করিলেন। সেই বিলাসপ্রমত্ত ও ভোগ-সুখ-নিরত যুবাও আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত উত্তেজিত হইলেন। সন্ধিভঙ্গ করাই তাঁহারও অভিপ্রায় হইল। মানসিংহ চলিয়া আসার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহারা পুরী আক্রমণ করিলেন।

ওস্মানের উদ্ধতভাব মানসিংহকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। এককালে পাঠানগণকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে উড়িষ্যা-যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন। সৈন্য ও সেনাপতিগণকে অবিলম্বে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

পাঠানদিগকে, বিশেষতঃ ওস্মানকে নিগৃহীত ও মর্ম্মপীড়িত করিবার এক সহজ উপায় মানসিংহের মনে পড়িল। তিনি স্থির করিলেন, নবাব-তনয়া আয়েষা সমস্ত নবাব-পুরীর অতিশয় আদরের সামগ্রী। বিশেষতঃ তিনি নবাব ওস্মান খাঁর প্রণয়পাত্রী। তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ওস্মান খাঁ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িবেন। সমরে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, অধিকন্তু তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার এরূপ সহজ ও করতলগত উপায় ত্যাগ করিতে মহারাজের ইচ্ছা হইল না।

আয়েষা যাঁহার ভবনে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার নাম তাজ খাঁ। তাজ খাঁ কতলু খাঁর কাশ্মীরী বেগমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ব্যক্তি। সেই সম্পর্কে তাজ খাঁ ও তাঁহার পত্নী কখন কখন নবাব কতলু খাঁর ভবনে যাতায়াত করিতেন। এই সূত্রে আয়েষার সহিত তাঁহাদের সাতিশয় আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল। যাহাতে আয়েষা কখন না কখন পাটনায় তাঁহাদের ভবনে আগমন করেন, এ জন্য তাজ খাঁর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। বহুদিনের চেষ্টার পর এবার সহসা আয়েষা স্বয়ং পত্র লিখিয়া এবং সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া পাটনায় আসিয়াছেন। অতি সমাদরে তাজ খাঁ ও তাঁহার পত্নী নবাব-নন্দিনীকে গৃহে আনিয়াছেন। বড় আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতেছে।

সহসা সন্ধ্যার পর মোগল-সৈন্যেরা তাজ খাঁর ভবন ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি কোন সংবাদ জানিতেন না; সুতরাং এরূপ নিগ্রহের কোনই কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। অবরোধকারী সৈনিকগণ এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না! তখন তাজ খাঁ কাতরভাবে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রক্ষিগণ সে প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইল।

পরদিন প্রাতে প্রহরি-বেষ্টিত তাজ খাঁ বঙ্গ-বিহারের সুবেদারের সম্মুখীন হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভবনে কতলু খাঁর কন্যা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করাই মোগল-দিগের প্রয়োজন। যদি তাজ খাঁ নবাব-নন্দিনীকে মোগলদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা

হইলে তাঁহার ভবন প্রহরিমুক্ত হইবে। পাঠান তাজ খাঁ এ প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ব্যক্তি; সতত তাঁহার ভবনে বহু লোকের যাতায়াত হইয়া থাকে। তাহা বন্ধ হইলে তাঁহার এবং অন্যান্য অনেকের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইবে, এ কথা মহারাজের গোচর করা হইল। আয়েষাকে হাতে না পাইলে মহারাজ কোন কথাই শুনিতে সম্মত হইলেন না। এ কথা মহারাজ বুঝাইয়া দিলেন, নবাব-তনয়ার প্রতি কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে না, তাঁহার পদমর্য্যাদার অনুরূপভাবে তাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখা হইবে। তাজ খাঁ প্রাণ্ ছাড়িতে কবুল, তথাপি তাঁহার গৃহাগত নবাব-নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। অগত্যা প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া তাজ খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

আয়েষা সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি তাজ খাঁর সঙ্গে আসিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করিলেন। সময় ও স্থান স্থির হইল। যথাসময়ে দুই জন বাঁদী ও তাজ খাঁ সহ আয়েষার প্রহরিবেষ্টিত শিবিকা নির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিল। নির্ভীক ও অসঙ্কুচিতভাবে আয়েষা মানসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মানসিংহ দেখিলেন, সজীব দেবীমূর্ত্তি সগৌরবে আপনার শোভা ও মহিমা বিলাইতে বিলাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে মানসিংহ বলিলেন, "মা, তুমি আমার কন্যা। আমি তোমাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি। আমি তোমাকে কন্যা বলিয়াছি, অতএব যাহা তোমার বলিবার থাকে, তুমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার।"

আয়েষা বলিলেন, "পিতা, আপনি আমাকে অবরুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। পিতার অবরোধে কন্যা কিয়ৎকাল বাস করিলে অসঙ্গত হয় না। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার অবরোধে বাস করিব এ সম্বন্ধে আমার বলিবার কোন কথাই নাই।"

মানসিংহ বলিলেন, "তোমার বলিবার কোন কথা না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা করিবার অনেক কথা আছে। তুমি তাহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে সুখী হইব।"

আয়েষা বলিলেন, "আয়েষার জীবনে প্রচ্ছন্ন করিবার ঘটনা কিছুই নাই; সুতরাং মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই; আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

মানসিংহ বলিলেন, "তুমি আত্মীয়স্বজনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা হইতে পাটনায় কেন আসিয়াছ?"

আয়েষা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্য কথাই বলিব। আপনার পুত্র কুমার জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিবার বাসনায় আমি এখানে আসিয়াছি।"

মানসিংহ পুত্রের মুক্তির জন্য একটু ব্যাকুল হইয়াছেন; বাহে তাহা ব্যক্ত না করিলেও অন্তরে তিনি তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু কোন উপায়ই তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে সহজে সদুপায় উপস্থিত হইতেছে জানিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন;—বলিলেন, "তাহার জন্য কি উপায় তুমি অবলম্বন করিয়াছ?"

আয়েষা। বাদশাহের নিকট যুবরাজের পক্ষ হইতে আবেদন প্রেরণ।

মান। আমি সুবেদার, আমাকে না জানাইয়া বাদশাহের নিকটে তুমি কেন আবেদন প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ?

আয়েষা। আপনার দ্বারা এ সম্বন্ধে কোন উপকার হইতে পারে না। আপনি স্বয়ং প্রকাশ্য দরবারে অপরাধী স্থির করিয়া যুবরাজের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আজি তাহা লঙ্ঘন করিতে আপনার ইচ্ছা হইবে না। যদি সেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অম্বরেশ্বরের সর্ব্বত্র সমাদৃত নাম নিতান্ত অসার বস্তু। মহারাজের প্রকৃত মর্য্যাদা আমরা জানি বলিয়াই রাজপুত্রের আবেদন তাঁহার পিতার নিকটে উপস্থিত না করিয়া পিতার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

এ উত্তরে মহারাজ পরিতুষ্ট হইলেন;—জিজ্ঞাসিলেন, "আবেদন প্রস্তুত ও প্রেরিত হইতে বিলম্ব কি?"

আয়েষা বলিলেন, "আবেদন প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছে। বোধ হয়, আবেদন এত দিনে প্রয়াগ ছাড়াইয়া গিয়াছে।"

মান। আবেদনে কারারুদ্ধ জগৎসিংহের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে কি?

আয়েষা। না মহারাজ, কারাবদ্ধ জগৎসিংহ

স্বয়ং সমস্ত মর্ম্ম বুঝিয়া সে আবেদনে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মান। কারাগারে তাহার নিকট আবেদন পৌঁছিল কিরূপে?

আয়েষা। সে জন্য আমাকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারারক্ষকদিগকে অনেক ঐশ্বর্য্য প্রদানের লোভ দেখাইয়া হস্তগত করিতে হইয়াছিল।

মান। বুঝিলাম, তুমি অতি বুদ্ধিমতী ও কার্য্যকুশলা; কিন্তু প্রধান ব্যাপারের তুমি কি ব্যবস্থা করিয়াছ? বাদশাহ-দরবারে এ আবেদন উপস্থিত হইবে কি না সন্দেহ।

আয়েষা বলিলেন, "মহারাজ, সে বিষয়ে যথেষ্ট সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবেদন যেমন উপস্থিত হইবে, তেমনিই বাদশাহের হস্তগত হইবে এবং তৎক্ষণাৎ অনুকূল আদেশ প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

মানসিংহ বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য কি? কেন তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহা জানিতে পারা আমার আবশ্যক।"

আয়েষা অবনত-মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কথার কোন উত্তর তাঁহার মুখে আসিল না।

মহারাজ বলিলেন, "বুঝিতেছি, এ প্রশ্নের উত্তর তুমি সহসা দিতে ইচ্ছা করিতেছ না। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করিব না। তুমি কোন দিন কারাগারে জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ কি?"

"না।"

"তোমার কোন সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছ কি?"

"না।"

"তোমার যত্নে জগৎসিংহ মুক্ত হওয়ার পর নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে?"

"না।"

আয়েষার প্রণয়-ঘটিত কোন ব্যাপারই মহারাজের অবিদিত ছিল না। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন, এই অসামান্যা নারী বাস্তবিকই জগৎ-সিংহের প্রতি অসামান্য প্রণয়ানুরাগিণী। কিন্তু ইনি জ্ঞাত আছেন, জগৎসিংহের অন্তরে ইঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ অনুরাগ নাই। এই জন্যই এই নবীনা এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন নাই, তাঁহার মুক্তির পরও সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন না। এই অলোক-সামান্যা নারী নিতান্ত মনঃপীড়া ভোগ করিতেছেন বলিয়া মানসিংহের মনে হইল। পুত্রের মুক্তির পর এই নারীর মানসিক ক্লেশ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন।

কথাটা আর একটু পরিস্ফুট করিবার অভি-প্রায়ে মানসিংহ বলিলেন, "জগৎসিংহ অকৃতজ্ঞ ও নরাধম। তুমি তাহার জন্য এত আয়াস স্বীকার কেন করিতেছ?"

আয়েষা নীরব, অধোমুখ—চিন্তাকুল।

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "কেন মা, তুমি আমার এ সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "মহারাজ, কাষ্ঠখণ্ডকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন পরের প্রয়োজনে আপনি পুড়িয়া মরে। জগৎসিংহ অকৃতজ্ঞ নহেন, তিনি একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ।"

মানসিংহ বলিলেন, "মা, আয়েষা, তুমি রমণী-রত্ন; তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।"

আয়েষা বলিলেন, "অতি প্রগল্‌ভার ন্যায় আমাকে মহারাজের ন্যায় ব্যক্তির সমক্ষে অনেক কথা কহিতে হইয়াছে; কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এত কথা কহি নাই। দায়গ্রস্ত হইয়া মহারাজের আজ্ঞায় এবং পাছে প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে আমার রসনা লজ্জাহীনার ন্যায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। আমি মহারাজের চরণে এ জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

মানসিংহ বলিলেন, "আয়েষা, রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিতান্ত দুঃখের সহিত তোমাকে আমি কিছু দিন আবদ্ধ রাখিব, ইহাই আমার প্রথম সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু মা, তোমাকে দেখিয়া, তোমার সহিত কথা কহিয়া, আমার মনে আরও অনেক সাধ হইয়াছে। সে কথা এখন থাকুক। পাঠানদিগের সহিত উড়িষ্যায় যুদ্ধ উপস্থিত। আমাকে কল্যই উড়িষ্যায় যাইতে হইবে। যুদ্ধের অবসানকাল পর্য্যন্ত তোমাকে আমাদিগের নিকট থাকিতে হইবে। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে?"

"কিছু না। যুদ্ধ, সন্ধি, শাসন, পালন রাজার কার্য্য। আমরা স্ত্রীজাতি, তাহার কিছুই জানি না। আমরা সে সম্বন্ধে কথা কহিব কেন?"

মান। নবাব ওস্মানকে এ সম্বন্ধে তুমি কোন কথা জানাইতে চাহ ?

"না। নবাব এক জন তেজস্বী, সাহসী, বীর। তিনি যে বুদ্ধির বশে যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে কোন পরামর্শ প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত সাহস। তাঁহার কার্য্যের পরিণাম ও ফলাফল তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন এবং সে জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।"

মানসিংহ বলিলেন, "আপাততঃ তোমাকে এই ভবনেই থাকিতে হইবে। আমার মহিষী উর্ম্মিলা দেবী তোমার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিবেন; কোন বিষয়েই তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। আমি যুদ্ধান্তে পুনরায় আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি বড় ব্যস্ত; এক্ষণে বিদায় হও। তুমি তাজ খাঁকে গৃহে প্রেরণ কর।"

মহারাজ প্রস্থান করিলেন, তাজ খাঁ গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ভবন প্রহরিমুক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরাজয়

উড়িষ্যায় বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পাঠানগণ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুরী আক্রমণ করিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্র দেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন না; সুতরাং সহজেই পুরী পাঠানদিগের করকবলিত হইয়াছে। রামচন্দ্র পুরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং যুবরাজ মানসিংহের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

মহারাজ মানসিংহ বিশেষ আয়োজন সহকারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমান হইতে সৈয়দ খাঁও যথেষ্ট সৈন্যাদি লইয়া উড়িষ্যার দিকে ধাবিত হইলেন। একে সন্ধি-অবহেলনজনিত ক্রোধ, তাহার পর হিন্দুর প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম আক্রমণ; অধিকন্তু ওস্মানের নিতান্ত উদ্ধত ব্যবহার। মানসিংহ পাঠানকুলের সর্ব্বনাশ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন।

পাঠানগণও উদ্‌যোগের কোন ত্রুটি করেন নাই। ধারপুরের যুদ্ধবিজয়ী নবাব ওস্মান খাঁ জানিতেন যে, সন্ধিভঙ্গ হইবামাত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তিনি অনেক দিন হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন এবং যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন।

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে বর্ণনীয়; তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। এ স্থলে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বাক্যমাত্র বিন্যস্ত হইতেছে।

বনপুরের নিকট মোগল-পাঠানের প্রথম সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে তুমুল যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। পাঠানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হস্তিসমূহকে তাঁহারা সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মোগলেরা অনেক কামান লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া এবং কোন কোন হস্তী কামানের গোলা দ্বারা আহত হইয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া পড়িল এবং নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। রক্ষকেরা করিকুলকে কোন ক্রমেই স্থির রাখিতে পারিল না। তাহারা অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পশ্চাতের সৈন্যসমূহকে দলন করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইল। সমরক্ষেত্রের পুরোভাগে হস্তিস্থাপনরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু পাঠানসৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং অনেকে হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ করিল।

তথাপি দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু প্রথমেই উদ্যমহীন হওয়ায় তাহারা হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। বিষম যুদ্ধ হইল বটে, শেষে পাঠানদিগকে পরাজিত হইতে হইল।

বনপুরে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের নিমিত্ত বনপুর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। বনপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোগল-পক্ষনেতা মহারাজ মানসিংহ সহজে ক্ষান্ত হইলেন না। উড়িষ্যা হইতে পাঠানপ্রাধান্য তিরোহিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি দুর্গের পর দুর্গ এবং নগরের পর নগর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জলেশ্বর ও কটক মোগলদিগের অধীন হইল। অল-দুর্গেও মোগলবৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে লাগিল।

মোগল স্বর্ণগড় দুর্গও আক্রমণ করিলেন। এই স্থানে পাঠানগণ ভীষণ রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোন যুদ্ধেই তাঁহাদের সুবিধা হইল না। স্বর্ণগড় মোগলদিগের হস্তগত হইল।

অগত্যা ওস্মানকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। নবাব সোলেমান ও ওস্মান সর্ব্বতোভাবে আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং করদরূপে পরিগণিত হইলেন, উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেল।

যথাসময়ে উড়িষ্যা-বিজয়ের সংবাদ বাদশাহের গোচর করা হইল। এই শস্যশালী প্রদেশ বহুদিন হইতে মোগলদিগের নানাপ্রকার উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হইয়াছিল; এক্ষণে ইহা সর্ব্বতোভাবে মোগলদিগের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হওয়ায় সম্রাট্ আকবরের আনন্দের সীমা থাকিল না। মহারাজ মানসিংহ অতঃপর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নামে পরিচিত হইলেন। রামচন্দ্র দেব প্রভৃতি উড়িষ্যার নিরীহ পূর্ব্ব ভূপতিগণ অবিচলিত-চিত্তে মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট্ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

হতাশ ওস্মান মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। এত অবনতি ঘটিবে, ইহা তিনি একবারও মনে করেন নাই। এই যুদ্ধোদ্যমের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার চিত্ত নানাবিধ দুশ্চিন্তায় যন্ত্রণায় অসন্তোষের নিকেতন হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আয়েষা নবাবপুরী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ওস্মানকে আয়েষা যে ভাবেই দেখুক না কেন, তিনি যে ওস্মানের সকল আনন্দের, সকল অধ্যবসায়ের উৎস, তাহার সন্দেহ নাই। সেই আয়েষার সহিত ওস্মান বাল্যকাল হইতে একত্র ক্রীড়াকৌতুক করিয়া আসিতেছেন এবং একসঙ্গে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। আয়েষার প্রতি তাঁহার ভালবাসা সীমাশূন্য ও অমেয়। সেই আয়েষা পুরী পরিত্যাগ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে ওস্মানের উৎসাহ ও ভরসা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ অসন্তুষ্ট, হতাশ ও চিন্তাকুল চিত্ত লইয়া ওস্মান যাহা করিলেন, তাহাতেই বিরুদ্ধ ফল ফলিল। ওস্মান অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অগ্নিকাণ্ড

অভিরাম স্বামী কারাবাসী রাজপুত্রের মুক্তির নিমিত্ত আবেদনাদি লইয়া দিল্লীযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আর পাঁচ জন রক্ষী গিয়াছে। সকলেই অশ্বারোহণে গমন করিয়াছেন, নানা স্থানে নানা ব্যক্তিকে উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হইবে; বাদশাহ-দরবারে আবেদন স্থাপন করিবার উপায় করিতে হইলে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে; আয়েষা সে জন্য অভিরাম স্বামীর হস্তে প্রভূত ধন-রত্ন প্রদান করিয়াছেন।

নবাব-নন্দিনী আয়েষা আরও অনেক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বাদশাহ-দরবারে ও অন্তঃপুরে অনেকের সহিত আয়েষার পরিচিত হইবার উপায় ছিল; অনেক অতীত কথা স্মরণ করাইয়া অনেককে তিনি লিপি লিখিয়াছেন। অধিকন্তু মানসিংহের ভগ্নী, সুতরাং জগৎসিংহের পিতৃস্বসার নিকটও একখানি বিনীত পত্র লিখিয়া তাঁহার কৃপালাভের নিমিত্ত প্রার্থী হইয়াছেন। যত পত্র আয়েষা লিখিয়াছেন, তত্তাবৎই যথাস্থানে উপনীত হইলে অভীষ্টফল-প্রাপ্তি সহজ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই; উদ্‌যোগ ও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নাই।

কয়েক দিন মাত্র বিলম্ব করিয়া আয়েষা স্বয়ং দিল্লীযাত্রা করিবেন, এরূপও স্থির থাকিল। সম্ভবতঃ তাঁহার দিল্লী-গমনের পূর্ব্বেই অভিরাম স্বামী কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগত হইবেন, অনেকের মনেই এইরূপ ভরসা হইল। সহসা মহারাজ মানসিংহের ব্যবস্থায় আয়েষাকে পাটনায় বন্দী হইয়া থাকিতে হইল। মানসিংহ যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া বিব্রত, সুতরাং আয়েষার মুক্তির সম্প্রতি কোন আশা নাই; কিন্তু ইহাতেও আয়েষার অসন্তোষ বা উদ্বেগ নাই; কেন না, তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আজীবন বন্দিনী থাকিতেও কাতর নহেন। জগৎসিংহের কর্ম্মময়, উৎসাহময় ও আনন্দময় জীবন অন্ধকার কারাগারে নষ্ট হইতেছে; যদি সেই বীরকে মুক্ত করিবার জন্য চিরদিন তাঁহার স্থানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আয়েষা হাসিতে হাসিতে এখনই তাহাতে প্রস্তুত।

পঞ্চম দিনে অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গী বীরপঞ্চকে বহন-করিয়া অশ্বসমূহ কানপুরে উপনীত হইল। তথায় যাইয়া অভিরাম জ্ঞাত হইলেন, বাদশাহ বাহাদুর তখন আগ্রায় আছেন। এ সংবাদে তিনি তুষ্ট হইলেন। আর দুই দিনে তিনি আগ্রায় উপনীত হইতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিলেন। বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন; সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া তিনি হৃষ্ট হইলেন।

এই সম্প্রদায় যখন কানপুরে উপনীত হইলেন, তখন অপরাহ্নকাল। অশ্বসমূহ নিতান্ত পরিশ্রান্ত

এবং অশ্বারোহিগণও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। অভিরাম স্বামী বাজারের পার্শ্বে প্রান্তরমধ্যে এক বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে সেদিনকার মত আশ্রম-সন্নিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বারোহিগণ অবতরণ করিয়া দূরে আর এক বৃক্ষমূলে পশুদিগকে বন্ধন করিল। অভিরাম স্বামী আপনার স্কন্ধস্থিত চর্ম্ম খুলিয়া বৃক্ষতলে এক দিকে পাতিয়া বসিলেন। জগৎসিংহের আবেদন, আয়েষার লিখিত পত্রসমূহ এবং তাঁহার প্রদত্ত ধনরত্ন এক স্থূল উত্তরীয়-বস্ত্রে সুন্দররূপে বাঁধিয়া তিনি বক্ষোদেশে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অতি সাবধানতার সহিত তিনি সেই সকল পদার্থ লইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে এই স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া তিনি বক্ষোদেশস্থ সেই উত্তরীয় উন্মোচন করিলেন এবং চর্ম্মাসনের নিম্নে এক প্রান্তে তাহা পরিস্থাপিত করিয়া তাহার উপর মস্তকস্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

রক্ষিগণ আপন আপন লোটা ও রশী বাহির করিয়া পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল তুলিতে লাগিল এবং তাহার পর গা, হাত, মুখ ধুইতে থাকিল। পথে পালা করিয়া রক্ষিগণ অশ্বগুলির সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন যাহাদের পালা, তাহারা দুই জন বাজারে ঘোড়ার দানা কিনিতে গেল। তাহারা সকলেই এক জাতি; এক চৌকায় সকলেরই আহার চলে। হাত-মুখ ধোয়া শেষ হইলে এক জন বাজারে ডাইল, আটা, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি আনিতে গেল। আর এক জন একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া চৌকা বানাইতে লাগিল। পঞ্চম ব্যক্তি অভিরাম স্বামীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল, "প্রভুর সেবার কি আয়োজন করিব?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আমি একটু ঘৃত-চিনি মিশাইয়া কাঁচা আটা খাইব। সে জন্য কোন আয়োজনের আবশ্যক নাই। তোমাদের জন্য যাহা আসিতেছে, তাহা হইতে একটু লইলেই হইবে।"

জিজ্ঞাসাকারী, যে ব্যক্তি চৌকা বানাইতেছে, তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। যাহাদের উপর অশ্বসেবার ভার, তাহারা প্রচুর দানা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং একখানি বড় কাপড়ে দানা সমস্ত বাঁধিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া দিল। সঙ্গীদিগকে সেই দানার উপর মধ্যে মধ্যে জল ঢালিতে বলিয়া তাহারা ঘোড়াগুলি লইয়া জলাশয়ের অন্বেষণে চলিল।

যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য লইয়া এক জন রক্ষী ফিরিয়া আসিল। চৌকার নিকট হইতে এক জন উঠিয়া আসিয়া সাবধানে আগন্তুকের হস্ত হইতে সমস্ত সামগ্রী নামাইয়া লইল। তাহার পর স্বামীজীর নিমিত্ত আটা, চিনি, ঘৃত স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী উভয়ে গুছাইয়া রাখিল।

পাক আরম্ভ হইল। অশ্বপালেরা ফিরিয়া আসিল এবং অশ্বদিগকে দানা খাইতে দিয়া আপনারা হাত মুখ ধুইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রক্ষিগণ বাজার হইতে মশাল প্রস্তুত করিয়া আনিল। মশালের আলোকে অন্ধকার দূর করা হইল। খাদ্যাদি প্রস্তুত।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। সহসা বাজারের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। "গেল রে —গেল রে—জল—জল—বাহির কর—টান—টান—ধর" ইত্যাদি শব্দে বিষম গোল হইতে লাগিল। সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই দেখিলেন, ভয়ানক কাণ্ড! বাজারে আগুন লাগিয়াছে! "আহা! কি হইল! —হায়, সব গেল!" ইত্যাকার বিবিধ হৃদয়-বিদারক শব্দ পথিকগণের কর্ণে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি অতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অন্ধকারে সেই অগ্নিকাণ্ড যেন বহ্নিময় শৈল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাহার উপর হইতে যে সকল অগ্নি-শিখা ঊর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তৎসমস্ত যেন অগ্নিশৈল হইতে উড্ডীয়মান বহ্নি-বিহঙ্গম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিল। ভগবান্ সর্ব্বভুক্ লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া সর্ব্বগ্রাসের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। দারুণ চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "ভাই সব, দেখিয়া কি ফল? যাও, যদি বিপন্নের কোন সাহায্য করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিতে অগ্রসর হও।"

বাক্য শেষ হইবামাত্র রক্ষিগণ আপনাদের উপস্থিত খাদ্য ফেলিয়া সেই অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে ধাবিত হইল। অভিরাম স্বামী তথায় দাঁড়াইয়া সেই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

সহসা সকল কোলাহল অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিলাপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ পরাভূত করিয়া, নারীকণ্ঠে হৃদয়ভেদী শব্দ উঠিল, "আমার ছেলে—দুঃখিনীর

সর্ব্বস্বধন—রক্ষা কর—রক্ষা—কর। আমি তোমাদের দাসী হইয়া থাকিব। "রক্ষা কর—না কর—দোহাই তোমাদের—আমাকে আগুনে ফেলিয়া দেও।"

অভিরাম স্বামী দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি বেগে সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অসীম সাহসের সহিত উন্মত্তপ্রায় অভিরাম স্বামী সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনীর শিশুসন্তান রক্ষা পাইল। সেই নিদ্রিত শিশু বুকের ভিতর লইয়া অভিরাম নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহের নানা স্থান দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না।

রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে অগ্নিনির্ব্বাণ হইল। রক্ষিগণ তখন অভিরাম স্বামীর সহিত মিলিত হইল। সকলে ভস্মমাখা, কাতর ও দগ্ধপ্রায় দেহ লইয়া প্রান্তরে বটবৃক্ষসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু কি ভয়ানক! অশ্বগুলি সে স্থানে নাই! অগ্নিভয়ে তাহারা কি বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছে? রক্ষিগণের ডাউল, রুটী, তরকারী, কিছুই নাই। কুকুর-শৃগালে হয় তো খাইয়া গিয়াছে। লোটা একটিও নাই! তবে তো চোর আসিয়াছিল! অভিরাম স্বামী ব্যস্ততা সহ চর্ম্মাসন তুলিয়া দেখিলেন, সে উত্তরীয় বস্ত্র নাই, সে আবেদন নাই, সে সকল পত্র নাই—সে ধন-রত্ন কিছুই নাই। 'হায়, কি হইল' বলিয়া অভিরাম স্বামী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবিচার

জগৎসিংহ সেই অন্ধকার কারাগারে পড়িয়া অচিরে মুক্তিলাভ করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা সেই সুখের পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ের সেই প্রিয় দেবতার সুখ ও আনন্দ-প্রাপ্তির কল্পনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহ দারুণ যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়াও অপরের প্রযত্নে পুত্রের স্বাধীনতার আশা করিতে লাগিলেন। কেহই জানিতে পারিলেন না যে, সকলের সকল বাসনা ব্যর্থ হইয়াছে; অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়া সকলের সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায় সেই রাত্রিতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনাহারে, পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায় নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়ে তাঁহারা সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রাত্রি কাটাইলেন। লুণ্ঠনাবশিষ্ট যে সামান্য সামগ্রী তথায় পতিত ছিল, পরদিন প্রাতে তাহা সংগ্রহ করিয়া সেই ছয় পথিক সহর-কোতোয়ালের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কোতোয়াল মহাশয় যমদূতের ন্যায় আশঙ্কার বস্তু। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা কহিতে সাহস করে, এমন লোক অতি বিরল। অভিরাম স্বামী অনেক বাদশাহ-নবাবের দরবার দেখিয়াছেন, কোতোয়ালের দরবার যে তাহার অপেক্ষা ভয়ানক স্থান, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না; কোতোয়ালগণের অধিকাংশই কারণে অকারণে প্রভুতা বিস্তার করিতে এবং সম্মুখাগত ব্যক্তি-মাত্রকেই শাসন করিতে পারিলে কর্ত্তব্যের শেষ হইল মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এই শ্রেণীর এক অদ্ভুত কোতোয়ালের নিকট অভিরাম স্বামীকে দল সহ উপস্থিত হইতে হইল।

সমস্ত অভিযোগের মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণ কোতোয়াল মহাশয় স্থির করিলেন, ইহারা নিশ্চয়ই বিদেশী চোর; এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই একটা দাগী লোক, এ কারণ সন্ন্যাসী সাজিয়া বেশ বদলাইয়াছে, এখানে আসিয়া ইহারা চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে একটা মিথ্যা অছিলা করিয়া আগেই কোতোয়ালের নিকট সাফাই করিয়া রাখিতেছে। এরূপ সুন্দর মীমাংসা করিয়া সেই সুদক্ষ কোতোয়াল মহাশয় অভিরাম স্বামী ও তাঁহার লোকপঞ্চকে কোতে পুরিবার হুকুম দিলেন।

অভিরাম স্বামী ঘোর বিপদে পড়িলেন। চুরির কিনারা হউক না হউক এবং অপহৃত পদার্থসমূহ পাওয়া যাউক না যাউক, অবকাশ পাইলে তিনি আবার পাটনায় ফিরিয়া যাইতে পারিতেন এবং নবাবনন্দিনীর নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া যথা-বিহিত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। না হয় আর খানিকটা সময় নষ্ট হইত। এত সময় গিয়াছে, আর দশ দিন বিলম্বে কি ক্ষতি হইত? তাঁহাদের অনর্থক পরিশ্রম হইত; তাহাতে কি আইসে যায়?

অভিরাম স্বামী একটা যুক্তির কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন; কিন্তু কথা শুনে কে? মুখের কথা সামান্যমাত্র বাহির হইতে না হইতেই কোতোয়াল সাহেব এই চোরদিগকে কোতে লইয়া যাইবার জন্য কর্কশভাবে আদেশ প্রদান করিলেন; সুতরাং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইলেও অভিরাম

স্বামী ও তাঁহার সঙ্গীদের বিনা অপরাধে কোতে থাকিতে হইল।

সেই আবর্জ্জনা-পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন কোতঘরে পড়িয়া তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহাদিগকে হয় তো কাজির নিকট পাঠাইবে। কাজিসাহেব হয় তো কোতোয়ালেরই মত সূক্ষ্মদর্শী। তিনি হয় তো তাঁহাদের কারাবাস ব্যবস্থা করিবেন। অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন করাই আবশ্যক; কিন্তু তাহারই বা উপায় কি?

পলায়নের উপায় স্থির হইল। এক জন রক্ষী দেখাইয়া দিল, বিশেষ চেষ্টা করিলে দ্বারের একটা লৌহদণ্ড খোলা যাইতে পারে। দেয়ালের উপরে লোক আসিবার জন্য কয়েকটা ছিদ্র আছে। এক জনের কাঁধের উপর আর এক জন দাঁড়াইয়া সেই লৌহদণ্ডের দ্বারা একটা ছিদ্র একটু বড় করিলেও করা যাইতে পারে। তাহার পর সেই ছিদ্র দিয়া এক জন করিয়া পলায়ন করা অসম্ভব নহে।

সকলেই এ কার্য্য সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। প্রস্তাবকারী রক্ষী গরাদে খুলিবার চেষ্টায় থাকিল। গত কল্য ভয়ানক পরিশ্রমে, অনাহারে, শেষে অগ্নিদাহে ও তাপে সকলেই কাতর ছিলেন; অদ্যও অনাহারে দিন কাটিল।

রক্ষী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক হইল। এক জনের কাঁধের উপর আর এক জন উঠিয়া পর্য্যায়ক্রমে সাবধানতার সহিত পরিশ্রম করিয়া, দেয়ালের রন্ধ্র-পথ বিস্তৃত করিয়া ফেলা হইল। যদি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহারা পলায়ন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিন জনকে পাটনার দিকে ফিরিয়া গিয়া নবাবনন্দিনীর নিকট সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিতে হইবে। তিনি অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তদনুযায়ী কার্য্য হইবে। অভিরাম স্বামী আগ্রার দিকে যাইবেন। যদি সেখানে কোন উপায় করিতে বা বাদশাহ-দরবারে প্রসঙ্গটা উপস্থিত করিয়া রাখিতে পারেন, আগ্রায় থাকিয়া তিনি তাহারই উপায় দেখিবেন এবং নবাব-নন্দিনীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল।

গভীর নিশীথে সেই রন্ধ্র-পথ দিয়া একে একে কয় ব্যক্তিই নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই অন্ধকারে প্রচ্ছন্নদেহ হইয়া সকলে পলায়ন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি তাঁহারা সহরের অনেক দূরে এক বনের মধ্যে অবস্থান করিলেন। শেষ-রাত্রিতে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তিন জন পাটনার দিকে এবং অভিরামপ্রমুখ তিন জন আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি সকলেরই অবলম্বন হইল।

যে সম্প্রদায় পাটনার দিকে যাত্রা করিল, তাহারা যথা সময়ে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইল বটে, কিন্তু কোন কার্য্যই করিতে পারিল না। তাজ খাঁর বাটী আসিয়া তাহারা জানিল, নবাব-নন্দিনী বন্দী হইয়া মহারাজের প্রাসাদ-বিশেষে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোনই উপায় হইল না। কারাবাসী যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না, সুতরাং তাহারা এ সকল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তর অবলম্বনে জীবিকাপাত করিতে লাগিল।

এ দিকে অভিরাম-প্রমুখ যাত্রিগণ অরণ্য-পথ অবলম্বন করিয়া আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যথাকালে ভিক্ষালব্ধ ভুট্টা ও নদীর জল কথঞ্চিৎরূপে তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে লাগিল। বৃক্ষের উপরিভাগে উঠিয়া, শাখার সহিত দেহ বন্ধন করিয়া, তাঁহারা রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। দুই দিন এইরূপে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে যাত্রিগণ আগ্রার নিম্নবাহিনী যমুনার উত্তরপূর্ব্ব অংশস্থিত ঘনারণ্যে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উত্তরদিক্ হইতে আর একটি অরণ্যপথ আসিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত সঙ্কীর্ণ অরণ্যপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, অচিরপূর্ব্বে অনেক অশ্বারোহী পার্শ্বস্থ পথাবলম্বনে তাঁহাদের পরিগৃহীত পথে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রে চলিয়া গিয়াছে। পদচিহ্নসমূহ দেখিলে বোধ হয়, ক্ষণপূর্ব্বে অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করিয়াছে।

এরূপ অরণ্যপথে অশ্বারোহী কেন চলিয়াছে, ইহা জানিতে অভিরাম স্বামীর একটু কৌতূহল জন্মিল। তিনি সঙ্গিদ্বয় সহ একটু দ্রুত চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর স্বামী দেখিতে পাইলেন, অশ্বসমূহ দক্ষিণদিকের একটি সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বনে গমন করিয়াছে। সে দিকে গমন করা অভিরাম স্বামীর অভিপ্রেত না হইলেও কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি সঙ্গিদ্বয় সহ সেই পথে প্রবেশ করিলেন।

অশ্বপদাঙ্ক আর পরিদৃষ্ট হয় না; পার্শ্বস্থ ঘন বনের এক স্থানের গুল্ম-লতা দলিত এবং

শাখাপ্রশাখা ভগ্ন বলিয়া বোধ হইল। পত্রাদিতে দলনচিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিরাম স্বামী তৎসমস্ত মনুষ্য ও অশ্বচরণ-পেষণজনিত বলিয়া অনুমান করিলেন। কৌতূহলের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি এক জন রক্ষীকে বলিলেন, "বিশেষ সাবধানে ব্যাপারটা কি, জানিয়া আসিতে পার ?"

অভিরাম ও সঙ্গী একটা স্থান নিরূপণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত রহিলেন। অপর রক্ষী প্রস্থান করিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। শেষে রক্ষীর জন্য তাঁহারা একটু চিন্তাকুল হইলেন। রক্ষী ফিরিয়া আসিল।

অভিরাম স্বামী সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "কি দেখিলে ?"

রক্ষী বলিল, "বড় শুভ সংবাদ !"

অভি। কিরূপ ?

রক্ষী। আমাদেরই সেই ছয় ঘোড়া।

অভিরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি ?"

রক্ষী বলিল, "আমি ঠিক দেখিয়াছি, আমাদের সেই ছয় ঘোড়া, তাহার কোন ভুল নাই।"

অভি। সঙ্গে লোক কত জন ?

রক্ষী। দশ জন। আমাদের লোটাগুলিও তাহাদের সঙ্গে আছে; আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

"অস্ত্র-শস্ত্র কিছু আছে ?"

"সকলেরই তলোয়ার, ছোরা, আর বর্শা আছে।"

অভিরাম বলিলেন, "এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইহারাই আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে। ইহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিলে সকলই পাওয়া যাইবে।"

যে রক্ষী অভিরামের কাছে ছিল, সে বলিল, "তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু উপায় কি ?"

অভিরাম বলিলেন, "তোমরা দুই জনে এই বনে থাকিয়া দস্যুদের উপর লক্ষ্য রাখিতে পারিবে ?"

১ম রক্ষী বলিল, "তাহা পারিব না কেন ? কিন্তু আপনি কি করিতে চাহেন ?"

অভিরাম বলিলেন, "এই বন পার হইয়া আর একটু পশ্চিমদিকে যাওয়ার পর যমুনা পার হইয়া আগ্রায় পৌছিতে পারা যাইবে। আমি আগ্রায় গিয়া সরকারী সিপাহী আনিতে চাহি।"

২য় রক্ষী বলিল, "আবার কোতোয়ালের কাছে এত্তালা করিতে হইবে তো ?"

অভিরাম বলিলেন, "তাহা হইবে, কিন্তু সকল কোতোয়ালই যে কানপুরের মহাত্মার মত কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ হইবেন, এরূপ বিবেচনা করা ভুল। আগ্রা রাজধানী; এখানে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোক আছেন। কোতোয়ালের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় না হইলে এখানে অন্য উপায়ও না হইতে পারিবে, এমন নহে।"

২য় রক্ষী বলিল, "যতক্ষণ আপনি না ফিরিয়া আইসেন বা আপনার কোন খবর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দস্যুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া এখানে থাকিতে পারিব ; কিন্তু দস্যুরা যদি এ স্থান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি করিব ?"

অভিরাম বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ। এক জন দূরে থাকিয়া দস্যুদের পিছু লইবে, এক জন এই স্থানে স্থির থাকিবে। দস্যুরা সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই এক এক স্থানে আহার ও বিশ্রামের জন্য আড্ডা স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিবে, তাহাকে সেই সময় চলিয়া আসিয়া এই স্থানের সঙ্গীকে দস্যুদের অবস্থানস্থানে যাইবার দিক্, পথ এবং অন্যান্য সঙ্কেত সবিশেষ বলিয়া যাইতে হইবে।"

১ম রক্ষী বলিল, "আমরা আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি এবং তদনুরূপ কার্য্যও করিতে পারিব বুঝিতেছি ; কিন্তু দস্যুরা যদি অধিক দূর চলিয়া যায়, তাহা হইলে যাওয়া আসার সুবিধা হইবে কি ? হয় তো শেষে আর দস্যুদের সন্ধান হইবে না।"

অভিরাম বলিলেন, "এ কথা সঙ্গত নহে। এখন বেলা দেড় প্রহর। আমার আগ্রা পৌছিতে দুই প্রহর বেলা হইবে। যোগাযোগ করিতে করিতে তৃতীয় প্রহর কাটিয়া যাইতে পারে। নাগাইদ সন্ধ্যা, আমি এখানে আসিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।"

২য় রক্ষী বলিল, "তাহা যদি পারেন, তাহা হইলে কোনই আশঙ্কা নাই। কারণ, দস্যুগণ তিন দিন পরে এই আড্ডা লইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা সকলেই অতিশয় কাতর। আজি তাহারা এখানেই থাকিবে বলিয়া অনুমান হয়।"

অভিরাম বলিলেন, "আমার আরও বোধ হয়, তাহারা এ স্থান হইতে আর কোথাও যাইবে না ! এই বনে থাকিয়া তাহারা এক এক জন করিয়া

আগ্রায় গিয়া ক্রমে ঘোড়া ও রত্নাদি বিক্রয় করিবে। এইরূপ উদ্দেশ্য না হইলে তাহারা আগ্রার ন্যায় রাজধানীর দিকে আসিবে কেন?"

১ম রক্ষী বলিল, "প্রভুর এ অনুমান সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

অভিরাম বলিলেন, "আর কথায় কাজ নাই। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি। যদি আমি সন্ধ্যার মধ্যে কোন মতেই না আসিতে পারি, তাহা হইলে কল্য প্রাতে যে ফিরিব, অন্ততঃ একাকীও ফিরিয়া আসিব, তাহার সন্দেহ নাই। তোমরা সাবধানে থাকিবে।"

অভিরাম স্বামী প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাটনায় মহারাজ মানসিংহ-নির্দ্দিষ্ট ভবনে আয়েষা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে আছেন। মহারাণী উর্ম্মিলা বিবিধ বিধানে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখ ও আনন্দের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বহুবার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। এ সংসারে আয়েষার সহিত আলাপ করিয়া কে না প্রীত হয়? কে তাঁহাকে পরিচয়ের পর দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে? স্বয়ং আয়েষার হৃদয়ের মহদ্ভাব-সকলের পরিচয় পাইয়া উর্ম্মিলা দেবী নিতান্ত মোহিত হইয়াছেন।

দুই মাস কাটিয়া গেল। সুখ-দুঃখে সময় সমভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পাঠানদিগের পরাজয়কাহিনীর নিত্য নূতন নূতন সংবাদ আয়েষার কর্ণগোচর হইতেছে। সেই স্বচ্ছন্দতাময় কারাগারে থাকিলেও সতত মোগলদিগের বিজয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাব ওস্মান খাঁর ভয়ানক পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আয়েষার হৃদয় অবসন্ন হইতে থাকিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ওস্মানের এমন বিপদের সময়, হৃদয়ের এরূপ অবসাদের সময় উড়িষ্যা হইতে চলিয়া আসা আয়েষার ভাল হয় নাই; এরূপ অসময়ে পিতৃভবন ত্যাগ করা তাঁহার শ্রেয় হয় নাই; নবাব ওস্মান খাঁর সান্নিধ্য হইতে দূরাগমন তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। এ সময়ে তিনি নিকটে থাকিলে ওস্মান হয় তো উৎসাহশূন্য হইতেন না, হয় তো বিবেচনার ভুল করিতেন না, হয় তো জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। আয়েষা আপনাকেই পাঠানদিগের এই পরাজয়ের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ওস্মান তাঁহার প্রতি একান্ত করুণাময় এবং অবিচলিত প্রেমময়। সেই সুহৃদ্বরের এই দুঃসময়ে দূরে চলিয়া আসা নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

আবার সংবাদ আসিল, মানসিংহের উড়িষ্যা-বিজয় শেষ হইয়াছে। ওস্মান সর্ব্বতোভাবে বাদশাহের অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। আয়েষা বুঝিলেন, নবাবের জীবন আছে, সেই তেজস্বী সাহসী বীরের জীবন থাকিলে সকলই আছে। আয়েষা শুনিতে পাইলেন, উৎকল-বিজেতা মহারাজ মানসিংহ পাটনার দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্র আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন।

যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে আয়েষা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। মহারাজ মনে করিয়াছিলেন, আয়েষার অবরোধ-সংবাদ শ্রবণে ওস্মান যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়াই অধীনতা স্বীকার করিবেন। প্রকারান্তরে আয়েষার অবরোধ মহারাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। আয়েষার অনুপস্থিতি, তদনন্তর তাঁহার অবরোধ-সংবাদ নবাবকে এতই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া ও হিতাহিত-বোধ-বিরহিত হইয়া কার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন; ফল মহারাজের অনুকূল হইয়াছে। যাহাই হউক, সে রাজনৈতিক প্রয়োজন, বোধ হয়, এক্ষণে শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহারাজ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়াই আয়েষাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

এইরূপ চিন্তায় ও আশায় ভাসিতে ভাসিতে আয়েষা দিন কাটাইতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর, একাকিনী এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া নবাবনন্দিনী আপনার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের অনেক কথা আলোচনা করিতেছেন। সহসা দূরে পার্শ্বস্থ দ্বারসন্নিধানে একটি পরমা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। নারী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি ব্যস্ততা সহ আয়েষা আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নবাগতা নারী বেগে অগ্রসর হইয়া আয়েষার বক্ষের উপর পড়িলেন। বহুক্ষণ উভয় সুন্দরী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রহিলেন। উভয়েরই নয়নে জল। নবাগতা সুন্দরী তিলোত্তমা।

প্রথমে আয়েষা কথা কহিলেন,—বলিলেন, "আর যে কখন তোমাকে দেখিতে পাইব, এমন মনে করি নাই। তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে। তুমি শ্বশুর-গৃহে স্থান পাইয়াছ, এ সকল শুভ সংবাদ আমি শুনিয়াছি।"

আয়েষার বক্ষোদেশ হইতে তিলোত্তমা মস্তক উত্তোলন করিলেন; একবার আয়েষার সেই অসীম বুদ্ধি ও তেজস্বিতাদ্যোতক মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; তারপর বলিলেন, "অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল কৈ? তিনি তো বন্ধনে!"

বালিকার ন্যায় বসনে বদনাবৃত করিয়া তিলোত্তমা কাঁদিয়া ফেলিলেন; অতি যত্নে আয়েষা তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু ও মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর সন্নিহিত আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনি পার্শ্বে উপবেশন করিলেন;—বলিলেন,—"কাঁদিও না, দুঃখ করিও না। বীরের রমণীকে অনেক দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিবার নিমিত্ত বুক পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এই সামান্য বিপদে কাতর হইলে তোমার কলঙ্ক হইবে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "এইরূপ ক্লেশে কাল কাটাই কিরূপে? এ দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিবার লোকও সংসারে নাই; তাই তোমার নিকটে কাঁদিতে আসিয়াছি।"

আয়েষা বলিলেন, "বেশ করিয়াছ ভাই, তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি। তোমার এ দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হইবে। রাজপুত্র অচিরে কারামুক্ত হইবেন।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কিসে এরূপ অনুমান করিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "অভিরাম স্বামী আবেদন লইয়া দিল্লী গমন করিয়াছেন; সে আবেদন ব্যর্থ হইবে না।"

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন, "কতদিন গিয়াছেন?"

"দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে।"

"এত বিলম্ব কেন হইতেছে! কোন ব্যাঘাত ঘটিল কি?"

"ব্যাঘাত ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাদ্‌শাহ-দরবার হইতে হুকুম বাহির করিতে হইলে অনেক বিলম্বই হইয়া থাকে। যদিই ভাই, দুই মাসের স্থলে চারি মাস বিলম্ব হয়, তাহাতে এমন ক্ষতি কি?"

তিলোত্তমা মনে মনে একটু বিস্মিত হইলেন। এ কি প্রকার ভালবাসার কথা? যাহাকে ভালবাসি, সে লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাবাসী। সে অবস্থা স্মরণ করিলে ক্লেশে বুক ফাটিয়া যায়। এক মুহূর্ত্ত-মাত্র অগ্রে যদি সে অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় করা যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রণয়ীর তাহাও পরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। নবাব-নন্দিনী দুই মাসের স্থানে চারি মাস কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছেন না। বলিলেন,—"ভাই, যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এই মুহূর্ত্তেই যুবরাজকে মুক্ত করা যায়, তাহাও আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ, দুই মাস পরে যদি যুবরাজ সঐশ্বর্য্য-বেষ্টিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন, তাহাও বোধ হয় প্রার্থনীয় নহে।"

আয়েষা একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রণয়ে এই-রূপই হয় বটে।"

"তবে তুমি অন্যরূপ মনে করিতেছ কেন?"

আয়েষা একটু অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমি জানি, রাজপুত্র বীর-শ্রেষ্ঠ। বীরের দেহে শাণিত অসি বিদ্ধ হইলেও একটুও যন্ত্রণা বোধ করেন না। শত্রুর অসি দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে আসিতেছে দেখিয়াও একটুও বিচলিত হন না। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য লৌহ-শৃঙ্খল বা অন্ধকার-কারাগার বিশেষ ভয়ানক নহে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি তাঁহার দুই দিন বেশী কাটিয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্লেশের কথা কিছু নাই। তবে তোমার আমার মত অবুঝ আত্মীয় লোকেরা ইহাতে বড় কষ্ট অনুভব করে বটে। সে কষ্টের কারণ কেবল স্বার্থপরতা। আমরা সময়ে প্রেমাস্পদের হৃদয় অপেক্ষা দেহকে অধিক ভালবাসি, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, তিনি নিকটে না থাকিলে ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এরূপ উদ্বেগের কোন প্রয়োজন আমি বুঝিতে পারি না।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক। বাস্তবিকই রাজপুত্রের সহিত ক্ষণে-কের বিচ্ছেদও আমার অসহ্য। ইহা যদি স্বার্থপরতার ফল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অতিশয় স্বার্থপর। সাহস করিয়া তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভাই। তুমিও তো যুবরাজকে যথেষ্ট ভালবাস। তবে তুমি কেন তাঁহার জন্য আমার মত ব্যাকুল হইতেছ না?"

আয়েষা নতমুখে তিলোত্তমার হাত ধরিলেন; তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,

"তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। আমি যুবরাজকে ভালবাসি সত্য। সে ভালবাসা অনন্ত, অসীম ও গভীর। কিন্তু এ জগতে তাহার কথা কেহই জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। দৈবাৎ মনের একটু অবিচলিত অবস্থায় আমি যুবরাজের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি; সে জন্য আমি সাতিশয় লজ্জিত আছি। আমার অনুরোধ, তুমি এ কথা কখনও কাহারও নিকট বলিও না; নিজেও এ কথা কখনও মনে করিও না। তুমি এ কথা ভুলিয়া যাও, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কেন ভাই, এ কথা ভুলিয়া যাইব? কেন এ কথা কাহাকেও বলিব না? ভালবাসা দোষের কথা নহে; ভালবাসিলে পাপ হয় না তো। তবে কেন তুমি এ জন্য লজ্জিত আছ?"

আয়েষা বলিলেন, "আমি মনে করি, ভালবাসা প্রাণের বস্তু; প্রাণের মধ্যে অতি সাবধানে ও সযত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিবার পদার্থ। তাহার কথা আস্ফালন করিয়া জগতে প্রকাশ করিলে তাহার অসারতা প্রকাশ পায় এবং তাহা লজ্জার কারণ হইয়া পড়ে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "ভালবাসা প্রাণের সামগ্রী বটে, কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে সে কথা জানিতে দেওয়ায় দোষ কি? তিনিও যদি তাহা না জানিতে পাইলেন, তাহা হইলে ভালবাসিয়া সুখ কি?"

আয়েষা বলিলেন, "তাহা হইলেই ভালবাসার ব্যবসা আরম্ভ হইল। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে তাহা বুঝিতে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়; তাহা হইলেই ভালবাসার দোকানদারী চলিতে থাকে। আমি তোমাকে এক বস্তু দিই, তুমিও তাহার বদলে আমাকে কিছু দেও; ইহাই দোকানদারী। এমন পবিত্র ভালবাসার দোকানদারী করা আমি লজ্জার কথা বলিয়া মনে করি।"

তিলোত্তমা একটু চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, ভালবাসার এ ভাব বড়ই মধুর ও অত্যুচ্চ সন্দেহ নাই—বলিলেন, যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার সুখের জন্যও তো তাঁহাকে এ কথা জানিতে দেওয়া উচিত।

আয়েষা বলিলেন, উচিত বটে। যখন দেখা যায়, আমি যাঁহাকে ভালবাসি, তিনি সে ভালবাসা ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল, ভালবাসার অভাবে তিনি দীন, তখন তাঁহাকে প্রাণের সমস্ত ভালবাসা ঢালিয়া দেওয়া উচিত।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কিন্তু ভাই, আমরা নারী; ভালবাসাই আমাদের কাজ। যাঁহাকে ভালবাসি, তিনি ভালবাসার দরিদ্র না হইলেও আমরা কেন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিব না? কেন নিরন্তর ভালবাসা ঢালিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া দিব না?"

আয়েষা বলিলেন, "ভালবাসিব না, আমি এমন কথা বলিতেছি না। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে আমাদের সতত অধিকার আছে। কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে অকারণে সে কথা জানাইব না।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কেন ভগ্নি, তুমি এরূপ মনে করিতেছ? পুরুষ-হৃদয় সমুদ্রস্বরূপ। সে সমুদ্রে কেন ভালবাসার কলসী ঢালিব না বা তাহা হইতে আবশ্যকমত ভালবাসা তুলিয়া লইব না? ভালবাসা মনুষ্য-জীবনে সর্ব্বপ্রধান সুখের বিষয়। ভালবাসিতে পাওয়া এবং ভালবাসা পাওয়া উভয়ই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। ভগ্নি আয়েষা, তুমি রাজপুত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাস, এ কথা সত্য; তবে কেন তুমি তাঁহাকে প্রকাশ্যে ভালবাসিয়া সুখী হইবে না? তুমি যদি মনে করিয়া থাক, রাজপুত্রকে আর কেহ ভালবাসিলে তিলোত্তমা দুঃখিনী হইবে, তাহা হইলে, নবাবনন্দিনি, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে তোমার বিবেচনার ভ্রম হইয়াছে। তোমার ন্যায় গুণবতী মহিলা যুবরাজের প্রেমিকা, ইহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। এক বৃন্তে তোমাতে আমাতে যুগল প্রসূনরূপে প্রস্ফুটিত থাকি, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা। এক শোভাময় কাননে কত প্রকার কুসুমই প্রস্ফুটিত হয়; এক গিরিবক্ষ বিদার করিয়া কতই নির্ঝরিণী নাচিয়া বেড়ায়; এক সাগরে কতই নদী দেহ ঢালিয়া দেয়। যাঁহাকে তুমি ভালবাস, তাঁহাকেই আমি ভালবাসি। অতঃপর আমাদের মধ্যে অসীম এক-প্রাণতা ও সহানুভূতি হওয়াই উচিত। তবে কেন ভগ্নি, তুমিও যুবরাজের বক্ষে কোহিনুরের ন্যায় শোভা পাইবে না?"

তিলোত্তমা আদরে আয়েষার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আয়েষা আদরে তিলোত্তমার চিবুকে

হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার ন্যায় সরলা সহৃদয়া মহিলার মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায় বটে। আমার বিশ্বাস, এইরূপ গুণবতী সহধর্ম্মিণী পার্শ্বে থাকিলে, রাজপুত্রকে জীবনে কখনও একটি বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিতে হইবে না। কিন্তু ভগ্নি, তোমার বিষম ভুল হইয়াছে। আমার ভালবাসাকে এক স্বতন্ত্র পথে চালিত করিয়া আমি পরম সুখে ভোগ করি। আমি ভালবাসিতেই জানি, ভালবাসিয়াই অশেষ আনন্দ লাভ করি। ভালোবাসা লাভ করিতে বা ভালবাসা লইয়া আড়ম্বর করিতে আমার কোন আকিঞ্চন নাই। ভগ্নি, আমার কথা তুমি আর কখন ভাবিও না, আমি ক্লেশ পাইতেছি মনে করিয়া কখনও ক্লেশ পাইও না।"

তিলোত্তমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝিতে পারি না তুমি কেমন করিয়া প্রাণকে এরূপ সংযত করিতে পারিয়াছ। বুঝি এ জগতে তোমার আর তুলনা নাই।"

আয়েষা বিষাদের হাসি মিশাইয়া বলিলেন, "আমি পাষাণী। এ শুষ্ক নীরস পাষাণ হৃদয়ে তোমাদের ন্যায় কোমলতার স্থান নাই। সে কথা যাউক, আমরা অনেকক্ষণ আপনাদের কথাই কহিতেছি। রাজপুত্রের মুক্তি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি; অনুরোধ করি, তুমিও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তুমি যখন তাঁহার মুক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছ না, তখন আমিই বা সে জন্য আর চিন্তা করিব কেন?"

তাহার পর আয়েষা সস্নেহে তিলোত্তমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। আমার ভ্রাতা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। আমি মহারাজের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াই উড়িষ্যায় ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাইব। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের ভবিষ্যতে আত্মীয়তা ঘটিবার কোন আশা নাই; সম্ভবতঃ পাঠানগণ বিলুপ্ত হইবে; সুতরাং হয় তো সেই সঙ্গে আয়েষার নামও ডুবিয়া যাইবে। আমার মৃত্যু হইলেও তোমরা সংবাদ পাইবে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ বলিয়া জ্ঞান করিবে।"

তিলোত্তমা কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "কেন দিদি, তুমি এমন কথা বলিতেছ? তোমার সহিত চিরদিনই সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি, হৃদয়ের কত সুখ-দুঃখের কথা চিরদিন তোমাকে জানাইব, কত বিপদে তোমার সহায়তা গ্রহণ করিব, কত সম্পদে তোমার সহিত ভাগাভাগি করিয়া আনন্দ ভোগ করিব। তবে কেন এরূপ কঠোর বাক্যে তুমি আমার সকল সাধ ছিঁড়িয়া দিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "ভগ্নি, মনুষ্য-হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষা যত কমিয়া যায়, ততই মঙ্গল। আমার প্রাণকে আমি বাসনা ত্যাগ করিতে শিখাইয়াছি। এই জন্যই আমি আর কোন কারণে কাতর নহি। প্রার্থনা করি, আমার জন্য তোমরাও কাতর হইবে না।"

এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "বধূমাতাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মহারাণী ঠাকুরাণী আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

তিলোত্তমা তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং আয়েষাকে বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার উপায় নাই; শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কৃপায় তোমার সহিত দেখা হইল, ইহা আমার ভাগ্য। কিন্তু ভগ্নি এ সাক্ষাতে আমি অন্তরে সুখী হইলাম না। তুমি এ দেশ হইতে প্রস্থান করার পূর্ব্বে আর একদিন তোমার সহিত দেখা করিব। ভরসা করি, সে দিন তোমার চিত্তের অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইতে পারিব। আপাততঃ আমি বিদায় হই।"

আয়েষা বলিলেন, "বিদায়ের পূর্ব্বে আর এক দিন সাক্ষাৎ হইলে আমিও সুখী হইব। আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন এ জীবনে দেখিবার আশা করিও না। প্রার্থনা করি, তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হও। মহারাণী মাতাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইও। এ দেশ হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আর একদিন সাক্ষাৎ হইলে চরিতার্থ হইব।"

তিলোত্তমা বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সহানুভূতি

উড়িষ্যা-বিজয়ী মহারাজ মানসিংহ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি আয়েষাকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাকে

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন এবং অচিরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আয়েষা পাটনাস্থিত আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ লইয়াছেন।

তাজ খাঁর পরিবারবর্গ আসিয়া আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে আয়েষা জানিতে পারিয়াছেন যে, অভিরাম স্বামীর দৌত্য নিস্ফল হইয়াছে। কানপুরে তস্করে তাঁহার হস্তন্যস্ত ধন-রত্ন, পত্র ও আবেদন সকল হরণ করিয়াছে। তাঁহার তিন জন সঙ্গী পাটনায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অভিরাম স্বামী দুই জন সঙ্গী সহ দিল্লী গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর আয়েষা মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন এবং অবিলম্বে স্বয়ং দিল্লী গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নকালে নবাবনন্দিনী একাকিনী বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন। এত দিন কোথায় কোন পত্র প্রেরণ বা কাহারও পত্র গ্রহণ করিতে তাঁহার অধিকার ছিল না। এক্ষণে তাঁহার এ স্বাধীনতা হইয়াছে ; বহুক্ষণে পত্রিকা সমাপ্ত হইল। পত্র নবাব ওস্মান খাঁর উদ্দেশে লিখিত। আয়েষা একবার পত্র পাঠ করিলেন—

"ভাই ওস্মান,

"আমি সংবাদ পাইয়াছি, অনেক যুদ্ধেই তোমার পরাজয় হইয়াছে। কিন্তু এ সংবাদে আমি বিশেষ বিচলিত হই নাই। কারণ, তোমার হৃদয়-বলের উপর আমার প্রভূত বিশ্বাস আছে। যুদ্ধে পরাজয় হইলেও তোমার হৃদয়কে পরাজিত করিতে পারে, এমন বীর জগতে আর কে আছে ?

"আমি তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তোমার স্নেহময় আশ্রয় ত্যাগ করিতে আমার কখন অধিকার ছিল না এবং সে ক্ষমতাও আমার এখনও নাই।

"দূরে আসিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার অপরাধ কত গুরুতর হইয়াছে। আমি মনে মনে সে জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি এবং আপনাকে আপনি শত তিরস্কার করিতেছি।

"আমার এই স্বাধীনতায় বোধ হয় তোমার অন্তরে সাতিশয় ক্লেশ হইয়াছে এবং বোধ হয় তুমি এ জন্য চিত্তের প্রসন্নতা-বিহীন হইয়াছ। তুমি চিরদিন আমার প্রতি একান্ত করুণাময়। আমার অপরাধ ক্ষমার অতীত, সন্দেহ নাই। তথাপি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে বলিয়া ভরসা করিতেছি। আমার এই ভরসা কি বিফল হইবে ?

"যে প্রয়োজনে আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমার জানিয়া কাজ নাই। তুমি আমার মাতার মুখে শুনিয়া থাকিবে, বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার জন্য আমি তোমার করুণাময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছি। তুচ্ছ ধনসম্পত্তির লোভে আয়েষা কখনই তোমার স্নেহের সান্নিধ্য হইতে দূরে আসিতে পারে না। তোমার দয়ার সহিত সংসারে সকল সম্পদেরই বিনিময় করা আয়েষার পক্ষে অসম্ভব নহে।

"যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তোমার ভবন হইতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সে কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। বোধ হয় আর অল্পকাল পরেই সে কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হইবে।

"আমি শীঘ্র তোমার নিকট গমন করিব। কবে, কি প্রকারে আমি যাত্রা করি, তাহার সংবাদ তোমাকে লিখিব।

"তোমার যে অসীম স্নেহ, কৃপা ও আদরে আমার মনপ্রাণ নিয়ত সিক্ত হইয়া আছে, আমার দারুণ অপরাধজনিত ক্রোধে তুমি কি তাহা শুষ্ক করিয়া ফেলিতে পারিয়াছ ? তাহা কি তুমি পারিবে ?

"তোমার দশা বিপর্য্যয় হেতু আমি বিশেষ চিন্তিত হই নাই। কারণ, আমি জানি, পার্থিব গৌরব চিরস্থায়ী হয় না ; তাহার আসিতে যাইতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু হৃদয়ের উচ্চতা এবং মহত্ত্ব কেহই সহজে পায় না। যে তাহা লাভ করিয়াছে, মনুষ্যমধ্যে সেই ধন্য হইয়াছে। আমি জানি, তোমার হৃদয় অসাধারণ সদগুণ-সমূহের আলয় ; সুতরাং ঐহিক ঐশ্বর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি হইবে ?

"জানি না, এই গুরুতর অবস্থান্তর-জনিত যাতনা তুমি কিরূপ ধীরতার সহিত বহন করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অসাধারণ। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু ক্লেশের তুলনায় অপরিসীম হৃদয়জালা তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধীরতার সহিত নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছ, ইহা আমি জানি। সুতরাং এ ক্ষুদ্র অবস্থান্তর কখনই তোমাকে অবসন্ন করিতে পারিবে না, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস।

"এই দুঃসময়ে তোমার নিকট উপনীত হইবার

নিমিত্ত, এই দশান্তরে তোমার হৃদয় অটল গিরির ন্যায় কিরূপ স্থির আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এবং আবশ্যক হইলে সাধ্যমতে তোমার সহায়তা বা তোমাকে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

"স্থানান্তরে আসিয়া আমাকে একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তুমি হয় তো তাহা শুনিয়া থাকিবে; এ জন্য পত্রে তাহা লিখিলাম না, কিন্তু সে বিপদে আমার কোন ক্ষতি নাই।

"আর অধিক কথা বলিব না। যাহার শত অপরাধ চিরদিন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, সে আবার সবিনয়ে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পত্রের পরিসমাপ্তি করিতেছে। ইতি—

অভাগিনী—আয়েষা"

এই পত্রিকা যথাস্থানে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া আয়েষা ইহা তাজ খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের অনেক কথাও তিনি তাজ খাঁকে জানাইলেন। বিশ্বস্ত ও চতুর ব্যক্তি এই সকল বার্তা ও পত্রিকা লইয়া তাজ খাঁর নিকট প্রস্থান করিল।

আয়েষা সেই স্থানে একাকিনী বসিয়া অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ত্বরায় মুক্তিলাভ করা এক্ষণে তাঁহার প্রধান কামনা হইলেও, তিনি সে জন্য মানসিংহের করুণা ভিক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদায়

যে দিন মধ্যাহ্নে আয়েষা ওস্মানকে পত্র লিখিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে মহারাণী উর্ম্মিলা ও মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে রাজান্তঃপুরে আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। হৃষ্টচিত্তে আয়েষা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

আয়েষা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলে উর্ম্মিলা সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাণীর সঙ্গে আয়েষা এক সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেই কক্ষমধ্যে মহারাজ মানসিংহ এক রত্নাসনে উপবিষ্ট।

আয়েষা গৃহাগত হইবামাত্র মহারাজ আসন ত্যাগ করিয়া একটু অগ্রসর হইলেন এবং নবাব-নন্দিনীকে উপবেশন করিবার নিমিত্ত একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন। আয়েষা উপবেশন না করিয়া মহারাণীর পার্শ্বে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন মহারাণী আদরে আয়েষার হস্ত ধারণ করিয়া এক আসনসমীপে গমন করিলেন এবং আপনি তাহার একাংশে আসীন হইয়া আয়েষাকে অপরাংশে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমাকে এতদিন অনর্থক কষ্ট দিয়া আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি। এই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি স্বাধীন। যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তোমাকে আমি কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করা আমার ভ্রম হইয়াছে। তোমার স্বাধীনতার কথা আমি স্বয়ং তোমার নিকট গমন করিয়া ব্যক্ত করিব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মহারাণী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করায় তাঁহারই ইচ্ছায় তোমাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছি।"

আয়েষা বলিলেন, "মহারাণী মাতা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। মুক্তিলাভের নিমিত্ত আমি মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

মহারাজ জিজ্ঞাসিলেন, "অতঃপর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ মা? কোথায় যাওয়া বা থাকা তোমার এখন অভিপ্রায়?"

আয়েষা বলিলেন, "আমি আপাততঃ দিল্লী যাইব।"

"অতঃপর কি দিল্লীতেই থাকিবে মনে করিয়াছ?"

আয়েষা। কেন মহারাজ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

মান। আমি জানি, দিল্লীতে তুমি অনেকের নিকট পরিচিতা। বোধ হয়, বাদশাহও তোমার কথা জানেন। আর আমি যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয়, তুমি মোগলদিগের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ-সূত্রে বদ্ধ।

আয়েষা। এই কারণেই কি অতঃপর আমার দিল্লী বাস করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মহারাজের মনে হইতেছে?

মান। আরও মনে হয়, সমস্ত ভারতবর্ষ

হইতে পাঠানগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। উড়িষ্যার যে পাঠানগণের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহারা এক্ষণে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তোমার সে সংস্রব ত্যাগ করাই বিধেয়।

আয়েষা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ যে যে কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, এক্ষণে পাঠান-সংস্রব ত্যাগ না করাই আমার বিধেয়। যাহারা আমার আশ্রয়-দাতা, যাহারা আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি যাহাদের স্নেহের ও করুণার শেষ নাই, যাহারা আমার সুখ-দুঃখে আন্তরিক ক্লিষ্ট বা হৃষ্ট হয়, তাহারা ঘটনা-চক্রে আজি হীন হইয়াছে বলিয়া—আমি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব কেন? বরং পাঠান-দিগের হীনতা হেতু অতঃপর তাহাদের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হইয়া থাকাই আমার আবশ্যক।"

এ কথায় মহারাজ একটু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি একটা সমুচিত উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাণী উর্ম্মিলা স্বামীর এই দুর্গতি উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "তোমার কোথাও গিয়া কাজ নাই। তুমি আমাদের সামগ্রী আমাদের কাছেই কেন থাক না?"

আয়েষা বলিলেন, "আমার প্রতি মহারাণী মাতার অনুগ্রহের সীমা নাই। কিন্তু আমার প্রাণের আকর্ষণ এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে ভিন্ন পথে চলিবার উপদেশ দিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "যদি তুমি উড়িষ্যায় গমন করাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়া থাক, তবে এক্ষণে দিল্লী যাইতেছ কেন?"

আয়েষা বলিলেন, "কুমার জগৎসিংহের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে।"

মান। সে জন্য পূর্ব্বে আবেদন প্রেরিত হইয়াছে শুনিয়াছি। তবে তুমি আবার যাইতেছ কেন?

আয়েষা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আবেদনাদি সমস্তই হারাইয়া গিয়াছে।

মান। আবার নূতন আবেদন স্বাক্ষরিত হইয়াছে কি?

আয়েষা। না, আমার বিশ্বাস আছে, আমি স্বয়ং দরবারে এ কথা উত্থাপন করিলে বিনা আবেদনেও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

মানসিংহ বুঝিলেন, এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বলিলেন, "রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ সহায়তা করিয়া তুমি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিতেছ। তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া একবার তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু—কিন্তু বার বার এরূপ অপরাধ ক্ষমা করা অসম্ভব। তুমি এ প্রযত্ন ত্যাগ কর; নচেৎ আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইব।"

আয়েষা বলিলেন, "আমাকে দণ্ড প্রদান করিতে নিশ্চয়ই মহারাজের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনি কখনই তাহা করিবেন না।"

"কেন?"

আয়েষা। হিতকারীকে এ সংসারে কেহ কখন শাস্তি দেয় না।

মানসিংহ। তুমি আমার শক্তির বিরোধিতা করিতেছ, তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তা করিতেছ; তবে তোমাকে হিতকারী বলিয়া বোধ করিব কেন?

আয়েষা। মহারাজ মুখে যাহা বলিতেছেন, সত্যই কি আপনার মনেরও সেই ভাব? সত্য কথা বলিতে হইলে, আপনি বলিবেন না কি, যুবরাজকে দণ্ডিত করা আপনার অসীম কূট-রাজনীতির অন্যতম কৌশল মাত্র? জগতের সমক্ষে, বিশেষতঃ বাদশাহ আকবরের সমক্ষে আপনার রাজভক্তি, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিবার জন্যই সামান্য কারণে আপনি প্রিয়পুত্রকে বন্দী করেন নাই কি? এক্ষণে কত দিনে, কি উপায়ে যুবরাজ মুক্তিলাভ করিবেন, এ চিন্তায় আপনার হৃদয় নিরন্তর ব্যাকুল নাই কি? তবে মহারাজ, সত্য করিয়া বলুন দেখি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার এ উপকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আপনার যথার্থ হিতকারী কি না?

মানসিংহ। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য কি না, সে বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই, তুমি স্বার্থের জন্য রাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তবে কেন না তুমি দণ্ড গ্রহণ করিবে?

আয়েষা। হইতে পারে, আমি স্বার্থের নিমিত্ত রাজপুত্রের মুক্তির চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার স্বার্থ ও মহারাজের স্বার্থ সমান, সুতরাং আমার চেষ্টা মহারাজেরও হিতকর হইতেছে।

এরূপ স্থলে আমাকে দণ্ড দিলে, মহারাজের হৃদয় কখনই সন্তোষলাভ করিবে না।

মানসিংহ কথায় পারিয়া উঠিলেন না, সুতরাং নীরব হইলেন। মহারাণী উর্ম্মিলা বলিলেন, "তোমার ন্যায় গুণবতী কন্যাকে আমি ছাড়িয়া দিব না। আমি তোমাকে পুত্রবধূ করিয়া সংসার করিব।"

আয়েষা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। উর্ম্মিলা আবার বলিলেন, "তুমি যবন-কন্যা বলিয়া কোন আপত্তি হইবে না। মহারাজ পূর্ব্বেই মুসলমানের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছেন। আবার যদি তিনি সে সম্পর্কের বৃদ্ধি করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

আয়েষা অধোমুখ। উর্ম্মিলা বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? তোমার রূপ, গুণ ও বুদ্ধি অতুলনীয়। তোমাকে যাহারা আপনার লোক জ্ঞান করে, তাহারাই সুখী। আমি সে সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।"

আয়েষা বলিলেন, "আমার প্রতি আপনাদের দয়ার সীমা নাই। আমি আপনাদের দাসী। কিন্তু—"

আয়েষা নীরব। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন, "কিন্তু কি মা?"

আয়েষা বলিলেন, "কিন্তু মা, আমি এরূপ অনুগ্রহের যোগ্যা নহি। আমার কর্ত্তব্য ও জীবনের গতি পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "তুমি দিল্লী-যাত্রার পূর্ব্বে জগৎসিংহের সহিত দেখা করিতে চাহ না কি? আমি তোমাকে এখনই কারাগারে প্রবেশের অনুমতি দিতেছি।"

আয়েষা বলিলেন, "কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমাকে এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া বিদায় দিউন। কল্য প্রত্যূষেই আমি যাত্রা করিব; সুতরাং আমার এক্ষণে অনেক কাজ।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "আজি তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে। আইস, তোমাকে বধূমাতার নিকট লইয়া যাই। সেখানে তাঁহার নিকট তুমি আজি থাকিবে। তোমার সহিত সেখানেই কথা কহিব চল।"

সসম্ভ্রমে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া আয়েষা আসন ত্যাগ করিলেন। মহারাণী তাঁহার বামহস্ত স্বকীয় দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

মানসিংহ সেই গমনশীলা নবাব-নন্দিনীকে দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন, কি আশ্চর্য্য। দেববালার ন্যায় আকৃতি, কি সাহস, কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কি নির্ভীকতা, অথচ কি কোমলতা, কি সরলতা, কি মধুরতা, কি শালীনতা, কি লজ্জাশীলতা! এ কুমারী যে কুলের বধূ হইবে, সে কুল ধন্য হইবে। আমার কি এরূপ ভাগ্যোদয় হইবে?

—

দশম পরিচ্ছেদ

লুপ্তোদ্ধার

অভিরাম স্বামী পরদিন প্রাতে সহর-কোতোয়াল ও সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনার পর-পারে নির্দ্দিষ্ট বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ তখনও সে স্থান ত্যাগ করে নাই। তাহারা সহজেই ধরা পড়িল। আবেদন, অন্যান্য পত্র, ধনরত্ন প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রীই তাহাদের নিকট ছিল। সে সকলই কোতোয়ালের হস্তগত হইল। সমস্ত সামগ্রীসহ দস্যুগণকে বাঁধিয়া লইয়া কোতোয়াল সহরে প্রত্যাগত হইলেন। অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় কোতোয়ালের অনুসরণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিলেন।

সকলই হইল বটে, কিন্তু অভিরাম স্বামীর ইষ্ট কিছুই হইল না। তিনি কোতোয়ালের নিকট সবিনয়ে দ্রব্যসামগ্রী পুনঃপ্রাপ্তি নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কোতোয়াল বুঝাইয়া দিলেন, বমাল-সমেত দস্যুদিগকে বিচারের নিমিত্ত কাজির নিকট পাঠাইতে হইবে। বিচারের পর যাহার এ সকল সামগ্রী, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে বটে, কিন্তু সকলই যে তাহার সামগ্রী, এ সম্বন্ধে তাহাকে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হইবে; বোধ হয়, তাহাকে এ জন্য উপযুক্ত জামিনও দিতে হইবে। সুতরাং অভিরাম স্বামীকে বিশ হাত জলের নীচে পড়িতে হইল।

অভিরাম স্বামী কপর্দ্দকমাত্রবিহীন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ অনেক সময়েই মানুষের বিশেষ সহায়তা করে। তিনি ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এক জন উচ্চপদস্থ রাজপুত-সৈনিকপুরুষের নিকট তিনি উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত অবস্থা ও যাবতীয় ঘটনা তাঁহাকে জানাইয়া, আর্থিক সাহায্য এবং

উপস্থিত বিপদে সৎপরামর্শ ভিক্ষা করিলেন। সৈনিক-পুরুষ সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অভিরাম স্বামীর হস্তে একটি রজতমুদ্রা প্রদান করিলেন এবং অপহৃত দ্রব্যাদির পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যথাবিহিত উপায় করিতে সম্মত হইলেন।

নগরের বাহিরে যমুনা-তীরে এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় কথঞ্চিৎরূপে জঠরজ্বালা নিবারণ করিলেন। সেই স্থলই নির্দ্দিষ্ট আবাসস্বরূপে স্থির করিয়া এবং সঙ্গিদ্বয়কে তথায় থাকিবার উপদেশ দিয়া অভিরাম স্বামী আবার নগরে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে ভদ্রলোক দেখিলেই তিনি আপনার বিষাদের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু বা মুসল-মান বিচার না করিয়াই তিনি সর্ব্ব সমক্ষে মানসিংহ-তনয় জগৎসিংহের অবরোধ, মুক্তির নিমিত্ত আবেদন, নবাব-নন্দিনী আয়েষার পত্র ও সহায়তা, ধন-রত্ন প্রদান, কানপুরের অগ্নিকাণ্ড, সর্ব্বনাশ, অগত্যাবিত উপায়ে দস্যুদলের সন্ধান, কোতোয়াল কর্ত্তৃক তাহাদের বন্ধন এবং শেষে তাঁহার দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে কোতোয়ালের অনিচ্ছা প্রকাশ ইত্যাদি সকল কথাই তিনি জানাইতে থাকিলেন। অচিরে তাঁহার এই সকল প্রসঙ্গ সহরে বিশেষ প্রচার হইয়া পড়িল। অতি অল্পকালমধ্যে পদস্থ রাজপুরুষেরাও ইহা জানিতে পারিলেন। যে সৈনিক পুরুষ প্রথম দিন তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অভিরাম স্বামী প্রতিদিনই সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তিনিও শীঘ্র অভীষ্ট-সিদ্ধি সম্বন্ধে অভিরাম স্বামীকে ভরসা দিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন দুইবার করিয়া স্বামীজী কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনিও শীঘ্র তাঁহার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভরসা দিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তাকুল মস্তকের উপর ভরসা, সহানুভূতি প্রভৃতির যথেষ্ট ধারা বর্ষিত হইতে থাকিল; কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না। প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। এইরূপ সময়ে অভিরাম স্বামী শুনিতে পাইলেন, নবাব-নন্দিনী আয়েষা আগ্রায় আসিয়াছেন। অভিরাম বুঝিলেন, এতদিনে তাঁহার মনোরথ সফল হইবার উপায় হইল।

অভিরাম স্বামী অনেক সন্ধান করিয়া আয়েষার অবস্থান-স্থানের অন্বেষণ করিলেন। স্থান ঠিক করিতে পারিলেন বটে, কিন্তু নবাব-নন্দিনীর সহিত সাক্ষাতের কোন সুযোগ হইল না। আয়েষা আগ্রায় আসিয়া এক জন বিশিষ্ট ওমরাহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় স্বামীজীর প্রবেশ করিবার কোন সুবিধা হইল না। বহু চেষ্টায় এক পরিচারিকা তাঁহার সংবাদ নবাব-নন্দিনীর নিকট বহন করিতে সম্মত হইল। সে সংবাদ লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না; আয়েষার মন্ত্রণা ও ব্যবস্থার কথা অপর কেহই তাঁহাকে জানাইল না। অগত্যা অভিরাম স্বামী ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাগত হইলেন।

আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও অথবা তিনি কোন সংবাদ না পাঠাইলেও, অভিরাম স্বামীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল ঘটনা সহজেই উপস্থিত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে কোতোয়ালের নিকট সাক্ষাতের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া অভিরাম দেখিলেন, অন্যান্য দিনের অপেক্ষা সে দিন কোতোয়াল সাহেব তাঁহাকে একটু বেশী সমাদর করিলেন এবং বলিলেন, "দস্যুদিগের নিকট যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, আম-দরবার হইতে তলব হওয়ায় তৎসমস্ত চালান দেওয়া হইয়াছে। ধন-রত্ন এখনও আমার নিকটেই আছে, সে সম্বন্ধে এখনও কোন হুকুম পাওয়া যায় নাই।"

অভিরাম ফিরিয়া আসিলেন; বুঝিলেন, এ সকল কাণ্ড আয়েষার প্রযত্নেই ঘটিয়াছে। তিনি এতদিন দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়াও যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আজি সহসা তাহা ঘটিতেছে কেন? এত দিনে যুবরাজের আবেদন যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরদিন তিনি আবার কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে দিন শুনিয়া আসিলেন, স্বামীজীর আর আগ্রায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি আগ্রায় আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে হুকুম যথাসময়ে প্রচার হইবে এবং সে হুকুম হরকরার দ্বারা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

অভিরাম স্বামী সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও ফল কিছুই হইল না; সাক্ষাৎ বা সংবাদ প্রেরণের কোন সদুপায় না হওয়ায় বিফল-মনোরথ অভিরাম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে আবার তিনি কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, শুনিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্গী পাঁচ জনকে বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাহাদের পাথেয়াদি ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কোতোয়াল স্বামীজীর হস্তে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার আর কষ্ট করিয়া আগ্রায় থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই। দস্যু-দিগের বিচারের সময় অভিরাম স্বামীর কোন সহায়তার প্রয়োজন হইবে না, আবশ্যক হইলে অভিরাম স্বামী অশ্ব ছয়টিও লইয়া যাইতে পারেন। তিনি সেগুলিকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে গমন করিতে পারেন।

অভিরাম সে দিন স্থির করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। পরদিন আবার সেই কর্ম্মচারীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ধন-রত্ন সম্বন্ধে কোন সন্ধান করিবার তাঁহার অবসর নাই। তাঁহার সহিত এ বিষয়ের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে।

যুবরাজের সম্বন্ধে কি আদেশ প্রচারিত হইবে, তাহার আভাসমাত্রও জানিতে পারিলে অভিরাম স্বামী পরম পরিতুষ্ট হইতে পারিতেন, কিন্তু কোন মতেই তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল আদেশ অচিরে পরিব্যক্ত হইবে।

কিসে কি হইল, তাহাই অভিরাম স্বামী জানিতে পারিলেন না। তাঁহার এত দিনের প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি কাহাকেও তাঁহার সম্বন্ধে একটুও আকৃষ্ট-চিত্ত করিতে পারেন নাই; কিন্তু আয়েষার আগ্রায় আগমনের পর সহসা তাঁহার বিষয়ে সকলেই মনোযোগী হইয়া পড়িল এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সুব্যবস্থা হইয়া গেল। আয়েষা কি প্রণালীতে কাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহা অভিরাম জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এ সকল অনুকূল ব্যবস্থা যে নবাব-নন্দিনীর দ্বারা সাধিত হইল, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকিল না।

আয়েষার সহিত বিদায়কালীন সাক্ষাতের প্রার্থী হইয়া তিনি আর একবার ওমরাহ মহাশয়ের দ্বারে উপনীত হইলেন। সাক্ষাৎ হইল না, অধিকন্তু একটা হৃদয়ভেদী সংবাদ আসিল। অভিরাম স্বামীকে প্রণাম জানাইয়া আয়েষা বলিয়া পাঠাইলেন, "বোধ হয়, এ জীবনে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যুবরাজ জগৎসিংহ আত্মীয়গণসহ কুশলে থাকুন, ইহাই আমার কামনা। যুবরাজ বা তাঁহার স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাতের বোধ হয় আর কোন প্রয়োজন নাই। আমার সংবাদ লইবার জন্য আপনারা কেহই ব্যাকুল হইবেন না। বোধ হয়, আমার সংবাদ আপনারা আর পাইবেন না। আমাকে চিরদিনের মত বিদায় দিন।"

অভিরাম স্বামীর চক্ষুতে জল আসিল; কিন্তু তিনি নিরুপায়। পরদিন যথাসময়ে কোতোয়ালের নিকট অর্থ ও অশ্ব লইয়া সঙ্গিদ্বয় সহ তিনি আগ্রা হইতে অপ্রসন্নমনে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নদীবক্ষে

উড়িষ্যায় কটক নগর নানা কারণে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শিল্প ও কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা হেতু এ নগর জনসমাজে সুপরিচিত; শোভা ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত এক সময়ে এ নগরের প্রতিপত্তি অল্প ছিল না। এই নগর নানা সময়ে নানা প্রকার ঐতিহাসিক কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইয়াছে। আর্য্য, পাঠান, মোগল ও মহারাষ্ট্র-প্রাধান্যের বিবিধ নিদর্শন অদ্যাপি এই নগরের বক্ষে বিরাজ করিতেছে।

এই নগরের পার্শ্ব-প্রবাহিত মহানদী বিশালতায় পদ্মা বা মেঘনার সমতুল্য না হইলেও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বা শুষ্ককলেবর নহে। মহানদীর সুনির্ম্মল স্রোত ধীর ও মৃদুভাবে প্রতিনিয়ত বহিতেছে এবং তাহার মধুর কল্লোলধ্বনি অবিরত শ্রোতৃ-মন মুগ্ধ করিতেছে। তাহার বক্ষের উপর নগরনিম্নে নানাদেশাগত নৌকা অপেক্ষা করিতেছে। কোন নৌকা হইতে বাহকেরা পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া তীরে স্থাপন করিতেছে; কোন নৌকায় তাহারা অশেষ আয়াসে বিবিধ সামগ্রী ন্যস্ত করিতেছে; কোন নৌকা হইতে ব্যস্ততা সহ আরোহিগণ কূলে অবতরণ করিতেছে; কোন নৌকায় বা স্থানান্তর-গমনাভিলাষী মনুষ্যগণ আরোহণ করিতেছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ অদর্শনের পর মিলন হেতু পরমানন্দের অভিনয় চলিতেছে; কোথায় বা প্রিয়জন-বিদায়কালীন অবশ্যম্ভাবী বিষণ্ণতার লীলা

পরিদৃষ্ট হইতেছে। কোন নৌকা কূল ত্যাগ করিয়া দূর-জলে গা ভাসাইতেছে; কোন নৌকা বা বহুকাল নদীবক্ষে নৃত্য করিয়া এক্ষণে কূলে আসিয়া হাঁফ ছাড়িতেছে।

নগর হইতে অর্দ্ধ-ক্রোশাধিক দূরে নদী-তীরে নবাব ওস্মান খাঁ পাদ-চারণা করিতেছেন। দুই জন মাত্র সশস্ত্র অনুচর একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছে। সে স্থান জনশূন্য। নবাবের মূর্ত্তি বিষণ্ণ এবং পরাজয় ও হীনতা হেতু যেন কালিমা-গ্রস্ত। নবাব পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং এক একবার এক স্থানে স্থির হইয়া নদীর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নবাবের পরিচ্ছদ অতি সামান্য। তাঁহার দেহের নিম্নভাগে ঢিলা পায়জামা এবং উর্দ্ধভাগে এক শিথিল পঞ্জাবী, মস্তকে একটি সামান্য টুপী, সকলই শ্বেতবর্ণ ও সুপরিষ্কৃত। চরণে জরির জুতা। কটিদেশে অসি ঝুলিতেছে না, পৃষ্ঠে ঢাল নাই, হস্তে বর্শা নাই। নবাব ওস্মান নিরস্ত্র ও সামান্য-বেশধর; যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ সুন্দর, তাহাকে সকল ভাবেই সুন্দর দেখায়। ওস্মানকে এই বেশে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

ভাদ্র মাস। অপরাহ্ণ হইলেও এখনও সূর্য্য-কিরণের তেজ মন্দীভূত হয় নাই। ওস্মান যে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তথায় নানা জাতীয় অনেক সমুন্নত বৃক্ষ ছিল। তাহারই শীতল ছায়াতলে নবাব পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। নদী-প্রবাহিত বায়ুহিল্লোল তাঁহার দেহকে সুশীতল করিতেছিল। সহসা ওস্মান স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিতে পারে, আগ্রহসহকারে ততদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আবার সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া, উৎকণ্ঠিতভাবে পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন।

সংবাদ আসিয়াছে, অদ্য আয়েষা বজরাযোগে কটকে আসিবেন। কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হইলে বজরা যে সময়ে কটকে আসিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়া ওস্মান নদীতীরে সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই হৃদয়দেবীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনুমানিক কাল অতীত হইল; কিন্তু এখনও তো বজরা দেখা যাইতেছে না। ওস্মান উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

সুদূরে নদী-বক্ষে অনেক নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে দেখা গেল। দূর হইতে সেই সকল নৌকা যেন জলে ভাসমান পক্ষিসমূহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ওস্মান স্থিরদৃষ্টিতে নৌকা সকলের দিকে চাহিয়া রহিছেন। নৌকা আরও নিকটস্থ হইতে লাগিল। ওস্মান বুঝিতে পারিলেন, তিনখানি বজরা ও পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা কাছাকাছি থাকিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ওস্মান একদৃষ্টিতে নৌকার অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। জলযান-সমূহ আরও নিকটস্থ হইল। ওস্মান বুঝিতে পারিলেন, একখানি বজরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতিশয় শোভাময়। তিনি স্থির করিলেন, সেই বজরাতেই নবাব-নন্দিনী আছেন। ওস্মান মাথার টুপী খুলিয়া দুলাইতে লাগিলেন। সেই বৃহৎ বজরার একটি জানালা খুলিয়া গেল। এই জানালার মধ্য দিয়া স্বর্ণসূত্র-বিরচিত একখানি ওড়না বাহির হইল এবং একখানি অতুলনীয় হস্ত মধ্যস্থিত থাকিয়া তাহা ধীরে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ওস্মান আনন্দজনিত চঞ্চলপদে তীরে তীরে নৌকার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন; দেখিলেন, সকল নৌকা প্রহরী, শরীর-রক্ষক, দাস দাসী ও দ্রব্য-সামগ্রী-পরিপূর্ণ। যে বৃহৎ বজরায় আয়েষা আছেন, তাহাতে অন্য কোন লোক আছে বলিয়া নবাবের বোধ হইল না।

জানালা দিয়া ওস্মান সুস্পষ্টরূপে আয়েষার প্রফুল্ল-কমলসদৃশ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। উভয়েই উভয়কে অভিবাদন করিলেন। আনন্দ-জ্যোতিতে উভয়েরই বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুক্ষণ হইতেই আয়েষার আদেশে মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছিল। নৌকা ও বজরা-সকল বেগে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা যে বজরায় আয়েষা ছিলেন, তাহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অন্যান্য নৌকা ও বজরা অগ্রগামী হইল; আয়েষার বজরা পিছাইয়া পড়িল। সে বজরার মাঝিরা আপনাদের অকর্ম্মণ্যতা হেতু লজ্জিত হইয়া সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি বিশেষ ফল হইল না। কেন এরূপ ঘটিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তাহারা ব্যস্ত হইল।

মাঝিরা বজরার এই দুর্গতির কারণ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ওস্মান দেখিলেন, বজরার যতটুকু জলের উপর জাগিয়া থাকা উচিত, ততটুকু জাগিয়া নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বজরা ক্রমেই জলের

মধ্যে বসিয়া যাইতেছে এবং তাহার যে অংশ জাগিয়া ছিল, তাহা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। মাঝিরাও তখন এ ব্যাপার বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত, বজরার তলভাগ একটু কম মজবুত ছিল; তাহারই একস্থান এখন ফাঁসিয়া গিয়াছে। তলভাগ সুদৃঢ় ছিল না বটে, কিন্তু সহসা ফাঁসিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা তাহাদের কখনই ছিল না। নবাব-নন্দিনীর আদেশে সাতিশয় শক্তি সহকারে বজরা চালিত করায় অত্যন্ত বেগ-জনিত জলের প্রতিঘাতে এবং অতিশয় বল-প্রয়োগ হেতু বিষম আন্দোলনে বজরার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

নবাব ওস্মান খাঁ তখন ব্যাকুলভাবে জলমধ্যে নামিয়া পড়িয়াছেন, আয়েষা জানালা হইতে ওস্মানের এই কার্য্য দেখিয়া উদ্বেগে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইতেছিলেন, সহসা ওস্মান চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নবাব-নন্দিনি, শীঘ্র কামরা হইতে বাহিরে আইস, একটু বিলম্ব করিও না। কামরায় আর কে আছে? এখনি নবাব-কন্যাকে কামরার বাহিরে লইয়া আইস।"

ওস্মান তখন একগলা জলে দণ্ডায়মান। বজরার কামরায় আয়েষার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও আয়েষা তৎক্ষণাৎ সঙ্গিনী সহ কামরার বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বজরা ডুবিতে আর বিলম্ব নাই। মাঝিরা বুঝিয়াছে, এ বজরা ডুবিলে নবাব তাহাদের জান রাখিবেন না; অথচ বজরা রক্ষা করারও কোন উপায় নাই; সুতরাং তাহারা তখন উদাসীন।

নবাবের দিকে চাহিয়া আয়েষা যুক্তকরে কহিলেন, "তুমি কি করিতেছ? জলে কেন নামিয়াছ? আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ওস্মান, তুমি তীরে উঠ।"

ওস্মান তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলিলেন, "তোমাকে লইয়া উঠিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তীরে উঠিব—নতুবা তোমার সঙ্গে—"

কথা শেষ হইল না। মাঝিরা গোল করিয়া উঠিল, সঙ্গিনী কাঁদিয়া উঠিল, আয়েষা হাত নাড়িয়া ওস্মানকে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কেত করিতে লাগিলেন, বজরা ডুবিয়া গেল।

যেখানে বজরা ডুবিল, সেখানে ভয়ানক আবর্ত্ত উপস্থিত হইল। সেই ঘূর্ণায়মান বারিরাশির মধ্যে আর এক ব্যক্তি ডুবিয়া গেলেন। নবাব ওস্মান আর নদীবক্ষে সন্তরণ-নিরত নহেন।

বজরার মাঝিরা সাঁতরাইয়া কূলে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্যান্য অগ্রগামী বজরা ও নৌকা ঘুরিয়া বিপদের স্থান-সন্নিধানে আসিল। আর এক বজরার উপর হইতে কয়েক ব্যক্তি গায়ের জামা প্রভৃতি খুলিয়া জলে পড়িল।

নবাব ওস্মান ভাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু তিনি বড় কাতর; জীবনান্ত-সময়ে মনুষ্য মুখ-গহ্বর যেরূপ বিস্তৃত করিয়া নিশ্বাস ফেলে, ওস্মান সেইরূপে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে সামর্থ্য নাই। কোন গুরুভার পদার্থ যেন তাঁহার দেহের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ একখানি বজরা নবাব সাহেবের নিকটস্থ হইল। তখন জলের উপর ভাসিয়া থাকা ওস্মানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একবার ডুবিতে ও একবার ভাসিতে থাকিলেন। বজরা হইতে লোকেরা একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্র ফেলিয়া দিল। ওস্মান একহস্তে তাহা ধারণ করিলেন। বহুলোকে সাবধানে সেই বস্ত্র টানিয়া তাঁহাকে বজরার নিকটে লইয়া আসিল। তখন কয়েক ব্যক্তি অতিশয় নত হইয়া তাঁহার হাত ধরিল।

ওস্মানের সংজ্ঞা-শূন্যপ্রায় দেহ বজরার লোকেরা টানিয়া উপরে উঠাইতে গিয়া বুঝিল, নবাব একা ভাসিয়া উঠেন নাই। তাঁহার কটিদেশে ওড়নার এক প্রান্ত নিবদ্ধ; অপর প্রান্তে আর এক গুরুভার পদার্থ সংলগ্ন; নবাবকে অল্পমাত্র তুলিয়াই তাহারা দেখিতে পাইল, ওড়নার অপর প্রান্তে আলুলায়িত-কেশা নবাব-নন্দিনীর অচেতনপ্রায় কলেবর। অতি সাবধানে লোকেরা উভয়ের দেহ বজরার উপর উঠাইল।

ওস্মান বলিলেন, "যে ব্যক্তি বাঁদীকে বাঁচাইতে পারিবে, সে অনেক পুরস্কার পাইবে।"

এক ব্যক্তি বলিল, "খোদাবন্দ, ঐ সিপাহী বাঁদীকে লইয়া ভাসিয়াছে।"

সত্যই এক ব্যক্তি বাঁদীকে লইয়া ভাসিয়া উঠিল। তখনই অন্য এক নৌকার লোকেরা তাহাদিগকে উপরে তুলিয়া ফেলিল।

আয়েষার বস্ত্রাদি কিছুই স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। লোকেরা অতি সন্তর্পণে মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুসজ্জিত ও সুগঠিত প্রতিমার ন্যায় তাঁহার সেই অচেতন কলেবর বজরার উপর স্থাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা

নবাব-নন্দিনীর অবস্থা বড় মন্দ। ওস্মানের পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে আয়েষা সলিল-সমাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে দুর্ঘটনার পরিণামস্বরূপ ভয়ানক জ্বররোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেক সুবিজ্ঞ হকিম ও আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসক অশেষ কৌশলে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। নবাব-বাটীতে উদ্বেগের সীমা নাই। কতলু খাঁর অনেক মহিষী। আয়েষা সকলেরই পরম আদরের ধন; সুতরাং তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়াছেন। কাশ্মীরী বেগম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এবং নিয়ত আয়েষার শয্যা-পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া, প্রাণপণে পীড়িতার শুশ্রূষা করিতেছেন। আয়েষা নবাবপুরীর শোভা, সকলেরই লোচনানন্দদায়িনী ও সর্ব্বজন-প্রসাদন-কারিণী। এ জন্য নবাব-ভবনের দাস-দাসী প্রভৃতি সকলেই নবাব-নন্দিনীর পীড়ার অবস্থা কঠিন হইয়াছে শুনিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

নবাব সোলেমান সতত বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান এবং সাংসারিক অন্যান্য ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হইলেও আয়েষার কঠিন পীড়ার সংবাদ তাঁহাকেও নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সুরাপাত্র ত্যাগ করিয়া এবং রূপসী সঙ্গিনীগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ স্বয়ং আসিয়া আয়েষার সংবাদ লইতেছেন।

আর নবাব ওস্মান খাঁ? তাঁহার কি অবস্থা? তাঁহার চিত্তের অবস্থা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। তিনি পীড়িতার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে অবিরত আসীন। কোথায় রাজ্য, কোথায় যুদ্ধ, কোথায় সন্ধি, কোথায় উৎসাহ, কোথায় বা দুরাকাঙ্ক্ষা। সংসারের সকল ব্যাপারই তিনি ভুলিয়াছেন। আপনার দেহে বা দৈহিক কোন প্রয়োজনেই তাঁহার মন নাই। হকিম ও বৈদ্যদিগের মুখে পীড়িতার অবস্থা মুহুর্মুহুঃ শুনিবার নিমিত্ত অধীরভাবে তিনি পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট।

দিন যাইতে লাগিল। বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পীড়িতার অবস্থা ক্রমে ভাল বোধ হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা ভরসাযুক্ত হইলেন। সমস্ত নবাবপুরী যেন প্রাণ পাইল। হকিম ও বৈদ্যগণ অনেকের নিকট প্রভূত শিরোপা পাইলেন। মসজিদে অনেক প্রকার ব্যয় হইল। অনেক দান, দরিদ্রভোজন ও পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। নবাব-পুরীর সকলে অনেক আনন্দজনক কার্য্যে মত্ত হইলেন। ক্রমে পীড়িতা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পথ্যাদি আহার করিয়া ক্রমে তাঁহার শরীরে শক্তি-সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং রোগজনিত অপগত শ্রীর পুনরাবির্ভাব হইতে লাগিল।

ওস্মান আর সতত পীড়িতার পার্শ্বস্থ কক্ষে অপেক্ষা করেন না। প্রথম প্রথম প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ তিনি স্বয়ং আসিয়া রোগমুক্তা সুন্দরীর সংবাদ লইতে লাগিলেন, যতই তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরাগত হইতে লাগিল, ততই ওস্মানের আগমন কমিয়া আসিতে থাকিল; শেষে দুই একদিন ব্যবধান দিয়া তিনি পীড়িতার কক্ষে দর্শন দিতে থাকিলেন।

আয়েষার মাতাও এখন আর অনন্যব্রত হইয়া নিয়ত কন্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন না। আয়েষা উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন; অনবরত তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার এখন কোন প্রয়োজন নাই।

মধ্যাহ্নকালে আয়েষা একাকিনী পর্য্যঙ্কে আসীনা। নিকটে কোন দাসীও নাই। নবাব-নন্দিনী অনেক চিন্তায় মগ্ন। কেন এমন হইল? তিনিই কি পাঠানদিগের অবনতির একমাত্র কারণ? যত্ন করিলে, যাহা ঘটিয়াছে, এখন তাহার কি কোন অন্যথা করা যায় না? আয়েষার অশেষ চিন্তা।

সহসা ওস্মান কক্ষদ্বার হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আয়েষা, কেমন আছ?"

আয়েষা উত্তর দিলেন, "ভাল আছি। তুমি ঘরের ভিতর আইস ওস্মান।"

ওস্মান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তুমি একলা বসিয়া আছ কেন আয়েষা? থাক—এখন আর যাইব না। অন্য সময়ে আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিব।"

আয়েষা বুঝিলেন, তিনি একাকিনী আছেন বলিয়াই ওস্মান কক্ষমধ্যে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আয়েষা দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, "ভিতরে আইস, তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

ওস্মান কোন প্রতিবাদ না করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আয়েষা বলিলেন, "দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? এই স্থানে উপবেশন কর।"

সেই পর্য্যঙ্ক ভিন্ন তথায় আর বসিবার স্থান

নাই। ওস্‌মান বলিলেন, "তুমি বইস, আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিব না।"

আয়েষা বলিলেন, "কুণ্ঠিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বলিতেছি, তুমি নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ কর।"

ওস্‌মান সেই পর্য্যঙ্কের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, আয়েষা অন্য প্রান্তে উপবেশন করিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিছুকাল তোমার নিকট হইতে দূরে ছিলাম; ফিরিয়া আসিয়াও পীড়ার জন্য তোমার সহিত বিশেষ কোন কথা কহিবার সময় পাই নাই। আমি স্ত্রীলোক; তোমার শাসনাধীন থাকাই আমার কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করিয়া বিশেষ অপরাধ করিয়াছি। সে জন্য ক্ষমা চাহিতেছি ভাই!"

ওস্‌মান বলিলেন, "কেন ক্ষমা চাহিতেছ? আমি কি কোন দিন তোমার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি? তুমি কৃপা করিয়া আমার এ নবাবপুরীতে আসাতে, তোমার শুভাগমনে আমার মৃতদেহে জীবন আসিয়াছে। তোমার কোনও অপরাধ হইয়াছে বলিয়া আমি একদিনও মনে করি নাই। তবে কেন আয়েষা, তুমি ক্ষমা চাহিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিকালের মধ্যে আমাদের অনেক ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে জন্য তুমি কি অবসন্নহৃদয় হইয়াছ ভাই?"

ওস্‌মান বলিলেন, "বিষম ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, তাহাতে আমার হৃদয় একটুও অবসন্ন হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। তুমি অপরাধের কথা বলিতেছিলে আয়েষা, আমার এই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য সত্যই তুমি অপরাধী। তুমি ওস্‌মানের বাহুতে বল, হৃদয়ে সাহস, মনে বুদ্ধি, কর্ম্মে উৎসাহ। ওস্‌মানের এই সকলই হরণ করিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছিলে। এরূপ অবস্থায় ভাগ্য-পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।"

আয়েষা বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে; কিন্তু প্রতীকারের আর কোন উপায় নাই কি?"

ওস্‌মান বলিলেন, "যথেষ্ট উপায় আছে; কিন্তু সে উপায় তোমারই হস্তগত। তুমি এই নবাবপুরীর মঙ্গলময়ী অধিষ্ঠাত্রী। তুমি যদি আমার মঙ্গলচিন্তায় ক্ষান্ত না হও, তাহা হইলে সকলই শুভ হইবে।"

আয়েষা বলিলেন, "ওস্‌মান! এরূপ কথা তুমি কেন বলিতেছ ভাই? তোমার ইষ্টানিষ্টের সহিত আমার সুখ-দুঃখ জড়িত, ইহা কি তুমি জান না?"

ওস্‌মান বলিলেন, "তাহা আমি জানি এবং তাহা জানি বলিয়াই অদ্যাপি আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু একটা কথা আজই জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াও, কেন আয়েষা, আমার দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমার এই দারুণ দুর্দ্দশার দিনে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে আয়েষা?"

আয়েষা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "যাহার নিকটে জীবনের কোন ঘটনাই প্রচ্ছন্ন নাই, তাহার নিকট এ কথাও প্রচ্ছন্ন রাখিব না। কথা হয় তো তোমার কষ্টকর হইবে, কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা না করিলে আমি কখনই এ কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতাম না। আমি যুবরাজ জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে পাটনায়, পরে আগ্রায় গিয়াছিলাম।"

ওস্‌মান বলিলেন, "এ সংবাদ আমার অবিদিত নহে; ভাগ্যবান্ জগৎসিংহ তোমার হৃদয়-রাজ্যের রাজা, এ কথা তুমি তো গোপন কর না; সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত করিতে তোমার বাসনা হওয়া অসঙ্গত নহে। প্রকারান্তরে তুমি এ কার্য্যে আমার ইষ্টই করিয়াছ।"

আয়েষা জিজ্ঞাসিলেন, "কিরূপে?"

ওস্‌মান বলিলেন, "জগৎসিংহ আমার বধ্য। তাহাকে বধ করিবার জন্যই আমি জীবন রাখিয়াছি। সে কারাগারে থাকিলে আমি হয় তো সংজ্ঞে তাহাকে বিনাশ করিবার সুযোগ পাইতাম না; তুমি তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করায় আমার উপকার হইয়াছে।"

আয়েষা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ওস্‌মান বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? আমার কথায় কি ক্লেশ পাইলে আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন, "না।"

ওস্‌মান জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি ভাবিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন, "ভাবিতেছি, আমার ন্যায় অভাগিনীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টার কি লাভ হইল? আমি সংসারে কোন উপকারে আসিলাম না; কাহারও কোন হিত আমার দ্বারা সাধিত হইল না। আমার জন্য কেবল কলহ-বিদ্বেষের স্রোত অব্যাঘাতে বহিতে থাকিল; তোমার ন্যায় মহাপুরুষকেও আমার নিমিত্ত নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইল।"

ওস্মান বলিলেন, "অনন্ত জ্বালা ভোগ করিতেও ওস্মান পশ্চাৎপদ নহে। সকল জ্বালাই আমি বুক পাতিয়া সহিতে সক্ষম এবং নিরন্তর সহিয়া আসিতেছি। আয়েষা, বুঝি ভালবাসার এই জ্বালাতেও সুখের সীমা নাই। নহিলে এ জ্বালা জুড়াইবার কোন চেষ্টা করি না কেন? নহিলে যাহার জন্য এই জ্বালা, সেই তুমি নয়নান্তরালে গমন করিলে সংসার শূন্য বোধ করি কেন? নহিলে তোমাকে ভুলিবার নিমিত্ত দয়াময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেও মন হয় না কেন? নহিলে যে ভবনে আমার জ্বালার কারণ বিদ্যমান, সেই ভবনের এক প্রান্তে বাস করিতে পাইলেও সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করি কেন? নহিলে তোমার হৃদয়ে আমার স্থান নাই জানিয়াও তোমার চিন্তায় আমার চিত্ত অহর্নিশি নিযুক্ত থাকে কেন? নহিলে সংসারে সকল বস্তুর অপেক্ষা এই জ্বালার বস্তুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি কেন?"

আয়েষা বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি, ওস্মান, এই জ্বালা-ভোগই তোমার নিয়তি। অভাগিনীই তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণাধার মহাত্মার চিরযন্ত্রণার হেতু। এ পিশাচীকে ওস্মান, কেন তুমি বার বার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছ?"

ওস্মান বলিলেন, "আয়েষা, তুমি ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা বেশ জান। জগৎসিংহ কারাগারে, এ সংবাদে বিচলিত হইয়া এবং পিতৃ-ভবন ত্যাগ করিয়া কেন তুমি দেশান্তরে ধাবিত হইয়াছিলে? তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহার সামান্য কারাবাসও যদি তোমার সহ্য না হয়, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু-সম্ভাবনায় আমি উন্মাদ না হইব কেন?"

আয়েষা বলিলেন, "আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ওস্মান, তুমি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ কর। তুমি বীর, সাহসী, যোদ্ধা; রণক্ষেত্রে কীর্ত্তি অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় সাম্রাজ্যলাভের আশায় তুমি মত্ত হও। যাহার এত সুখ ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, ক্ষুদ্র এক নারীর চিন্তায়, এক অযোগ্য অভাগিনীর প্রেমপিপাসায় সকল আকাঙ্ক্ষা শেষ করা কি তাহার কর্ত্তব্য?"

ওস্মান বলিলেন, "আমি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি—এত প্রকৃতিস্থ করিয়াছি যে, তুমি তাহা শুনিলে অবাক্ হইবে। আমার প্রাণ কখন তোমাকে পাইবে না জানিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে শিখিয়াছে; আমার হৃদয় এখন তোমাকে লাভ করিবে না বুঝিয়াও কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার সহিত সমপ্রাণতা হইবে না বুঝিয়াও আমার অন্তর এখন জয়-পরাজয়ের সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা আর কি হইতে পারে আয়েষা? রণরঙ্গে প্রমত্ত হইতে বলিতেছ, আকাঙ্ক্ষার সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছ, এ অবস্থায় তাহাই তো আমার একমাত্র কর্ত্তব্য; সেই পথই তো এক্ষণে আমার প্রধান অবলম্বনীয়। কিন্তু আয়েষা, আমার এক নিবেদন আছে। হৃদয়কে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিয়াছি সত্য, কিন্তু এক বিষয়ে আমার এখনও অতিশয় দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে। তোমাকে না পাইলেও আর আমি কাতর নহি; তুমি যাহারই হও, সে চিন্তাতেও আর ব্যাকুল নহি; আমি কেবল কখন কখন তোমাকে দূর হইতে দেখিবার বাসনা এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই; কখন কখন তোমার এক একটি বাক্য-শ্রবণের অভিলাষ এখনও বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই; যে ভবনে তুমি বাস কর, সে ভবনে অবস্থিতিরূপ গৌরব আমি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই; তোমার কুশলে সুখী ও অকুশলে উদ্বিগ্ন হইবার অধিকার আমি এখনও পরিহার করিতে পারি নাই। আয়েষা, এ দীনহীন অভাগ্য সকল সাধই বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার এই ক্ষুদ্র বাসনাগুলিও কি তুমি অসঙ্গত বলিয়া মনে কর? ভিক্ষুকের রত্নস্বরূপ তাহার এই আদরের অভিলাষগুলি চূর্ণ করাই কি তোমার অভিপ্রায়?"

আয়েষা বলিলেন, "না ওস্মান, জীবনে মরণে আমি তোমার সঙ্গিনী। বিবাহরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন আমাদের অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এ দেহ যদি তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে আমার সাধ্য না হয়, যদি বিধাতার বিড়ম্বনায় তোমার সেবায় আমি আত্ম-নিয়োজন করিতে অধিকারিণী না হই, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ভাই? কেন আমরা সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমপ্রাণ না হইব? কেন আমরা এক মনে এক মন্ত্রণায়, এক প্রাণে কার্য্য-সাগরে ভাসিয়া জীবনকে কর্ম্মময় না করিব? ওস্মান, অতঃপর আমি জীবনে ও মরণে তোমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হইয়া রহিব; তোমার সন্তোষ-সাধনই অতঃপর আমার ব্রত হইবে।"

তখন ওস্মান বলিলেন, "আয়েষা, আজি তুমি এ অভাগার জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করিয়া

দিলে। তোমার অনুগ্রহ আমাকে ধন্য করিল। এ ভিক্ষুক আর কিছুরই প্রার্থী নহে। আয়েষা আমার অবিচলিত হিতৈষিণী, আয়েষা আমার উন্নতি অবনতির জন্য চিন্তিতা, আয়েষার মন্ত্রণাচালিত হইয়া আমি কার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত, ইহা আমার পরম গৌরব এবং অপরিসীম আনন্দ। ইহার অধিক আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

আয়েষা বলিলেন, "এ কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি উপায়ে আমাদের অপহৃত রাজ্য আমরা পুনরায় হস্তগত করিতে পারি, তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক হইয়াছে।"

ওস্‌মান বলিলেন, "সে জন্য আর কোন চিন্তা নাই, অতঃপর যুদ্ধে আমার বীরত্ব দেখিয়া মানবসমাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইবে এবং আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে। আমার মঙ্গলময়ী আয়েষার প্রসন্নতায় সফলতা আমার কার্য্যসূত্রের সহিত নিত্যসংবদ্ধ হইবে।"

আয়েষার মাতা দ্বার হইতে জিজ্ঞাসিলেন, "ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে মা ?"

আয়েষা বলিলেন, "আইস মা, ভিতরে আইস, ঔষধ আর না খাইলেও ক্ষতি হইবে না বোধ হয়।"

আয়েষা ও ওস্‌মান আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বেগম সাহেবা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবক-যুবতীর মুখে অপরিসীম প্রসন্নতার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহাদের এ ভাব নিতান্ত শুভ সূচনা বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি

জগৎসিংহ সেই অন্ধকার কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া অতি ক্লেশে কালপাত করিতেছেন। হায়! এ দারুণ দুঃখের দিন কি ফুরাইবে না ? আর কি কখন স্বাধীন মনুষ্য-সমাজে মিশিয়া তিনি সুখ-দুঃখের কর্ম্মে জীবনকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন না ? তাঁহার সকল আশা, সকল আনন্দই কি এই কারাগৃহে দীর্ঘনিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে ?

অভিরাম স্বামী স্বয়ং কারাগারে প্রবেশ করিয়া আবেদনে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া গিয়াছেন। নবাব-নন্দিনী আয়েষা তাঁহার মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মীয়গণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির চেষ্টা কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। কিন্তু বহুদিন অতীত হইয়া গেল, এখনও কোন শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিল না তো। তবে কি সকল ভরসাই শেষ হইল ?

জগৎসিংহ নিভৃত কারাগারে বসিয়া আয়েষার সম্বন্ধে কত চিন্তাই করিতেছে। এমন হিতৈষিণী, এমন সুহৃদ্ ও সহায় যে লাভ করে, সে মানবের মধ্যে ধন্য। আয়েষাকে মানবী বলিয়া মনে করিলেও অন্যায় করা হয়। স্বর্গেও এরূপ দেবী নাই। কিন্তু হায়! এই মহীয়সী মহিলা অপাত্রে অলৌকিক প্রণয় ন্যস্ত করিয়া চির-বিষাদময়ী এই হতভাগ্যই সেই দেবীর যন্ত্রণার একমাত্র কারণ। এ অভাগা তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী না হইলে নিশ্চয়ই সে দেববালা সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হইতে পারিতেন। নিশ্চয়ই সেই অতুলনীয় রত্ন কোন প্রেমমুগ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠ সমাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত সুখভোগ করিতেন। নিশ্চয়ই সেই শোভাময় প্রসূন হতাদরে মলিন ও বিশুষ্ক হইত না। এ অকৃতজ্ঞ নরাধম সে দেবদুর্লভ প্রণয়ের প্রতিদান করিতেও অশক্ত। এরূপ ব্যক্তির প্রতিও সেই করুণাময়ীর দয়া। হায়! আর কি জীবনে জগৎসিংহ তাঁহাকে একবারও দেখিতে পাইবেন না ? আর কি তাঁহার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগও উপস্থিত হইবে না ?

অভিরাম স্বামী বলিয়া গিয়াছিলেন, তিলোত্তমা বড় ক্লেশে, নিতান্ত কাতরভাবে কাল কাটাইতেছেন। এত দিন এই অপরিসীম যাতনা ভোগ করিয়া সেই কোমল-প্রাণা সুরসুন্দরী জীবিতা আছেন কি ? আর কি জগৎসিংহ সেই প্রেমময়ীকে সজীব অবস্থায় দেখিতে পাইবেন ? আর কি তিনি কখন তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইবেন ? আর কি কখন তাঁহার সহিত প্রাণের কথা কহিবার সুযোগ হইবে ?

কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার স্নেহময় পিতৃদেব তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু পুত্রের এই দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া পিতার হৃদয় কি একটুও বিচলিত হইতেছে না ? তাঁহার কোন কোন বিমাতা পাটনায় আছেন। তাঁহারাও জগৎসিংহের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইতেছেন না কি ? এত আত্মীয়স্বজন থাকিতেও কি জগৎসিংহকে চিরদিন এই ভাবেই কালপাত করিতে হইবে ?

এ কষ্ট অসহনীয়। লৌহশৃঙ্খলে কষ্ট নাই, অন্ধকারে কষ্ট নাই, বন্ধনে কষ্ট নাই। একবার—

একবারমাত্র দূর হইতে প্রাণের পরম প্রিয় পদার্থকে দেখিতে পাইলেই এ কষ্ট বোধ হয় সহনীয় হইতে পারে। দূর হইতে একবারমাত্র তিলোত্তমাকে দেখিবার কোন উপায় হইতে পারে না কি?

জগৎসিংহের ইচ্ছা হইল, এই লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, লৌহ-দ্বার ভগ্ন করিয়া তিনি এখনই গড়মান্দারণের অভিমুখে ধাবিত হইবেন।

বিকট ঘর্ঘরশব্দে কারাগারের লৌহদ্বার খুলিয়া গেল। সেই মুক্ত পথ দিয়া বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিয়া জগৎসিংহকে কথঞ্চিৎ বিনোদিত করিল। জগৎসিংহ দেখিলেন, দ্বারমধ্য দিয়া কারারক্ষক ও আর এক জন অনুচর কারাগারে প্রবেশ করিল। অনুচরের হস্তে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার।

কারারক্ষক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতীব সম্মান সহকারে যুবরাজকে প্রণাম করিল।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি সংবাদ?"

কারারক্ষক সবিনয়ে নিবেদন করিল, "যুবরাজ মুক্ত হইয়াছেন। এই রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এখন কারাগার হইতে নিক্রান্ত হউন।"

যুবরাজ বিশেষ ধীরতার সহিত এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিলেন,—বলিলেন, "তোমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, এরূপ নিদর্শন কি আছে? হয় তো কারাগার হইতে নিক্রান্ত হইলে আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে।"

কারারক্ষক বলিল, "আমার নিকট বিশেষ কোন নিদর্শন নাই; আগ্রা হইতে খোদ সাহানশাহার নামমোহরযুক্ত পরওয়ানা মহারাজের উপর সিপাহী দ্বারা জারি হইয়াছে। মহারাজের খাস সিপাহীরা আমার উপর হুকুম জারি করিয়াছে। সে সিপাহীরা যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখন দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু তুমি কাজ ঠিক কর নাই। সিপাহীদিগের সহিত মহারাজার পাঞ্জা অথবা তাঁহার নাম-মোহর-যুক্ত হুকুমনামা থাকা উচিত ছিল। তাহা দেখাইয়া আমাকে মুক্তি দিতে আসিলে তোমার কর্ত্তব্যপালন করা হইত।"

কারারক্ষক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "যুবরাজ উচিত আজ্ঞা করিয়াছেন। আনন্দে আমি সকল সাবধানতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে যুবরাজের কি হুকুম?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "সিপাহীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে তুমি বলিয়া আইস যে, মহারাজ বা বাদশাহের আদেশ না পাইলে যুবরাজ কারাগার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রধান সিপাহীকে আমকাছারী হইতে সেরূপ কোন নিদর্শন আনিতে বলিয়া তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আইস। যতক্ষণ সেরূপ কোন আদেশ না আইসে, ততক্ষণ আমার শৃঙ্খল মোচন বা বেশ-পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই।"

কারারক্ষক যুবরাজের সাবধানতা ও স্থিরবুদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইল; আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিয়া সে আজ্ঞা-পালনে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর কারাগারের দ্বার নিরুদ্ধ করিল না; কারণ, এ আদেশের সত্যতা সম্বন্ধে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না।

অবিলম্বে কারারক্ষকের সহিত মথুরাসিংহ কারাগারে প্রবেশ করিল এবং সসম্মানে নিবেদন করিল, "যুবরাজ, যে পাঞ্জা দেখাইয়া এ অধীন রাজপুত্রকে গড়মান্দারণের নিকট মহারাজার আজ্ঞা জানাইয়াছিল, সেই পাঞ্জাই অদ্য তাহার নিকট রহিয়াছে। রাজপুত্রের মুক্তি জন্য আনন্দে এ দাস তাহা দেখাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। গোলামের কসুর মাফ করিতে আজ্ঞা হয়।"

মথুরাসিংহ উষ্ণীষমধ্য হইতে পাঞ্জা বাহির করিয়া যুবরাজের সম্মুখে ধারণ করিল। যুবরাজ পাঞ্জার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "কারারক্ষক, আমার-শৃঙ্খল মোচন কর।"

তখন পরমানন্দে কারারক্ষক যুবরাজের হস্তপদ-বন্ধন মোচন করিল। অনুচরের হস্ত হইতে পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিয়া মথুরাসিংহ তাহাকে যুবরাজের হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনার্থ জল আনিতে আদেশ করিলেন; জল আনিলে জগৎসিংহ হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কারাবাসীর ঘৃণিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজপরিচ্ছদে দেহ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মস্তকে হীরকখচিত শিরপেঁচযুক্ত উষ্ণীষ, কর্ণে রত্নকুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তামালা শোভা পাইতে লাগিল। কটিদেশে অসি বিলম্বিত হইল। রত্নখচিত পাদুকা চরণ আবৃত করিল। বহুদিন অন্ধকার কারাবাস, দারুণ দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে জগৎসিংহের মূর্ত্তি মলিন হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার স্বভাব-সুন্দর কান্তি উপযুক্ত পরিচ্ছদ-সমাবৃত হওয়ায় বড়ই শোভাময় হইল।

জগৎসিংহ সেই যন্ত্রণার নিকেতন-স্বরূপ কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নানাপ্রকার বিভীষিকাময়ী দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া তিনি যে স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, সে স্থানের সহিত তাঁহার আজি সম্বন্ধের শেষ হইল। প্রথমে মথুরাসিংহ, কারারক্ষক ও অনুচর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরের আলোক-রাজ্যে ও অব্যাহত বায়ু-সমুদ্রে আসিয়া জগৎসিংহ যেন নূতন জীবন লাভ করিলেন ও নূতন বিশ্বে আনীত হইলেন।

যে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী মথুরাসিংহের আজ্ঞাধীনতায় জগৎসিংহকে বন্দী করিতে গমন করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে কারাগার-সন্নিহিত প্রান্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছে। জগৎসিংহের সেই শ্বেত অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া বহুদিন পরে প্রভুকে বহন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত রহিয়াছে। অশ্ব-সন্নিধানে ছত্রধর কারুকার্য্য-খচিত ও মুক্তাঝালর-সমন্বিত বিশাল ছত্রহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কারচোপে সমাচ্ছাদিত সুবৃহৎ-ব্যজনী লইয়া অন্য ব্যক্তি ছত্রধরের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে।

যুবরাজকে দর্শনমাত্র সেই পঞ্চাশৎ সৈনিক অসি তুলিয়া প্রণাম করিল এবং সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়।"

যুবরাজ জগৎসিংহ অসি দ্বারা তাহাদিগকে তদ্রূপ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "জয় বাদশাহ আকবরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়।"

জগৎসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন। বহুকাল পরে প্রভুর দর্শন পাইয়া অশ্ব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কারারক্ষক সম্মানসহকারে যুবরাজকে প্রণাম করিল। জগৎসিংহ বলিলেন, "তুমি আমার কারাবস্থানকালে সতত আমার সহিত সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছ, তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অন্য কোন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।"

কারারক্ষক আবার যুবরাজকে প্রণাম করিল। পঞ্চবিংশ জন সৈনিক রাজপুত্রের অগ্রবর্ত্তী এবং পঞ্চবিংশ জন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যুবরাজ সেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পাইলেন। মথুরাসিংহ এবার যুবরাজের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ না করিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। ব্যজক ও ছত্রধর যুবরাজের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন প্রথমে মথুরাসিংহ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সম্মুখস্থ পঞ্চবিংশ অশ্বারোহী সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়।"

পশ্চাতের পঞ্চবিংশ সৈনিক তাহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ বলিয়া উঠিল, "জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়।"

সেই স্বর ব্যোমপথে নাচিতে নাচিতে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে সম্প্রদায় ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে নগরে প্রবেশ করিল। নগরের রাজপথসমূহ কৃত্রিম তোরণ, ধ্বজা, পতাকা ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত। পথিপার্শ্বে, অট্টালিকার উপর, বারান্দায়, বাতায়নে, সর্ব্বত্র ঔৎসুক্য-পূর্ণ নর-নারী দণ্ডায়মান। সকল অট্টালিকাই রঞ্জিতবস্ত্র, পুষ্পমালিকা ও কেতনে পরিশোভিত; দীনের পতনোন্মুখ কুটীরেও যথাসম্ভব সজ্জার অভাব নাই। প্রত্যেক ভবনের প্রবেশদ্বারে বারিপূর্ণ কলস ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত।

সম্প্রদায় নগরসীমায় প্রবেশ করিবামাত্র অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "জয় জগৎসিংহের জয়।"

সেই শব্দ কণ্ঠ-পরম্পরায় শব্দিত হইতে হইতে সমস্ত পাটনা-নগরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সম্প্রদায় ধীরে ধীরে রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কুলকামিনীগণ গবাক্ষ হইতে জগৎসিংহের মস্তকে লাজ, কপর্দ্দক ও প্রসূনবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। জগৎসিংহ অবনতমস্তকে সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে সম্প্রদায় মহারাজ মানসিংহের দরবার-গৃহের সমীপদেশে উপনীত হইল। দরবার-তোরণে যুবরাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বাদশজন মোগল ও রাজপুত-সেনাপতি এবং সভাসদ্ আসিয়া তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে লইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নবীন সুবেদার

যে সভায় সর্ব্বসমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এবং ঘৃণিত কারাবাসীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জগৎসিংহ দণ্ডিত হইয়াছিলেন, আজ বহু দিনের পর তিনি সেই সভায় বহু সম্মানে ভূষিত হইয়া এবং রাজ-পরিচ্ছদাদি

ধারণ করিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই উচ্চ মঞ্চের উপর মহারাজ মানসিংহ গম্ভীর-ভাবে বসিয়া আছেন; সেই পারিষদ ও সভাসদ্‌গণ তাঁহার উভয় পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনসমূহ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। সৈনিক, রাজকর্মচারী ও সাধারণ জনসমাগমে সভার তাবৎ স্থান পরিপূর্ণ। এখনও জনসমাগম নিরুদ্ধ হয় নাই। যে সকল মানব পথিপার্শ্বে জগৎসিংহের শুভাগমন-দর্শনার্থ অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে দলে দলে আসিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সভামধ্যে জগৎসিংহ প্রবেশ করিবামাত্র সেই অগণিত প্রায় কণ্ঠ হইতে শব্দ হইল, "জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়।"

সঙ্গে সঙ্গে জগৎসিংহ বলিলেন, "জয় বাদশাহ আকবরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে মহারাজ মানসিংহের সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সিংহাসন উচ্চ মঞ্চে সংস্থাপিত। জগৎসিংহ নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার উষ্ণীষ উন্মোচন করিলেন এবং তাহা মহারাজের চরণে স্থাপন করিয়া কর-যোড়ে কহিলেন, "অপরাধী পুত্র কাতরভাবে মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে।"

মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পুত্র! তোমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং বাদশাহ বাহাদুর কৃপা করিয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন এবং তোমাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।"

অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "জয় বাদশাহ আকবরের জয়।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "বাদশাহের এ অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু পিতঃ, যিনি এ জগতে আমার পরম গুরু, যিনি আমার ইহ-পরকালের দেবতা, সেই পিতৃদেবের প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলে আমার সকল সাধনাই বৃথা। পিতার মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত অধম পুত্র কাতরভাবে অপেক্ষা করিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "পুত্র, আমি সরল মনে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। তুমি উষ্ণীষ উঠাইয়া শিরে ধারণ কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া যশস্বী হও।"

অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "জয় মহারাজ মানসিংহের জয়।"

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে উষ্ণীষ গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আজ আমার জীবনধারণ সার্থক হইল। পিতার অসন্তোষের ভার মস্তকে ধারণ করিয়া জীবিত থাকার অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। আমি এত দিন মৃতকল্প হইয়া জীবিত ছিলাম। করুণাময় পিতৃদেব, আমার অপরাধ অনেক; আমার কোন্ কোন্ অপরাধের ক্ষমা হইয়াছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমি অপরাধী আছি, ইহা জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে আমার কোন অধিকার আছে কি?"

মানসিংহ বলিলেন, "স্নেহভাজন কুমার, তোমার পারিবারিক ও রাজনৈতিক সকল অপরাধই ক্ষমা হইয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি নবাবনন্দিনী আয়েষার হৃদয়ে প্রেমানল প্রজ্বালিত করিবার কোন প্রযত্ন কর নাই; সে জন্য কোন সহায়তাও তুমি কর নাই। এ কথা নবাব ওস্‌মান খাঁ আমার নিকট নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং সে জন্য তোমাকে অপরাধী করা অসঙ্গত।"

জগৎসিংহ অবনত মস্তকে বলিলেন, "আমার আরও অনেক অপরাধ আছে।"

মানসিংহ বলিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার সহিত পরিণয়ে তোমার অপরাধ গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি জ্ঞাত হইয়াছি, বীরেন্দ্রনন্দিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া; সেই তিলোত্তমা যথার্থ রাজলক্ষ্মীস্বরূপা। সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাহ হেতু তোমার অপরাধ মার্জ্জনীয়।"

জগৎসিংহের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "তোমার রাজনৈতিক অপরাধ দুনিয়ার মালিক স্বয়ং ক্ষমা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলে আমার গুরুতর অপরাধ হয়। তুমি সম্প্রতি বাদশাহের বিচারে এবং আমার বিচারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

সেই অগণ্য কণ্ঠে সমস্বরে শব্দ হইল, "জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "আমার প্রতি এক্ষণে মহারাজের কি আদেশ? কোন্ কর্ত্তব্যসাধন করিয়া আমি এক্ষণে মহারাজের প্রসন্নতা অর্জ্জনের প্রয়াসী হইব?"

মহারাজ এক জন পারিষদ্‌কে ইঙ্গিত করিলে, তিনি জগৎসিংহের হস্তে একখানি সনন্দ প্রদান করিলেন। মানসিংহ বলিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ,

বাদশাহের কৃপায় তুমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছ। তোমার যেরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, মনুষ্যের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটিতে দেখা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, সাহস ও সুবিচার হেতু তুমি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ও যশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।"

সভাস্থ তাবৎ লোক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় বাদশাহ আক্‌বরের জয়! জয় মহারাজ মানসিংহের জয়! জয় যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সভাস্থ তাবৎ সভাসদ্ পারিষদ্ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সসম্ভ্রমে জগৎসিংহকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন একটু অগ্রসর হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আমরা নবীন সুবাদারের নিকট আমাদের একান্ত বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করিতেছি। আমরা অবিচলিতচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা-পালনে সম্মত হইতেছি। আমরা অন্তরের সহিত তাঁহার শুভকামনা করিতেছি। আমরা তাঁহার এই পদোন্নতি হেতু হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে অবিচলিত সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছি।"

জগৎসিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কোথায় অন্ধকার কারাগারে লৌহশৃঙ্খলনিবদ্ধ দশা, আর কোথায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার-পদপ্রাপ্তি। উভয়ের প্রভেদ কল্পনাতীত। উভয় অবস্থার পার্থক্য আলোচনা করিলে শিহরিতে হয়। এই পরিবর্ত্তন এত সহসা, এত অতর্কিতভাবে, এত অপ্রত্যাশিতরূপে উপস্থিত হইল যে, জগৎসিংহ যেন তাহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে অক্ষমতা হেতু কিয়ৎকাল মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

মহারাজ মানসিংহ কহিলেন, "কুমার জগৎসিংহ, তোমাকে অদ্যই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। কল্য হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিব।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

মহারাজ বলিলেন, "ইহাই বাদশাহের আদেশ। তিনি আমাকে হুকুম প্রাপ্তিমাত্র পাটনা ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনে সম্প্রতি অবিলম্বে আগ্রায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে; সে স্থান হইতে আমাকে দিল্লী, পরে আজমীর যাইতে হইবে জানিতে পারিয়াছি। তাহার পর আর কোথায় কোন প্রয়োজনে যাইতে হইবে কি না, তাহা এখনও আমি জানিতে পারি নাই। আমার অনুপস্থিতিকালে বাদশাহ তোমাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সকলই দুনিয়ার মালিক বাদশাহ বাহাদুরের ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।"

এতক্ষণে জগৎসিংহ প্রকৃত অবস্থা প্রণিধান করিলেন। তখন ভূতলে জানু সংলগ্ন করিয়া বলিলেন, "সাহানশাহের আদেশ-পালন এ দাসের পরম ধর্ম্ম। আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় আমি বাদশাহের সমীপে ও মহারাজের চরণে অবিচলিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

তখন মানসিংহ আসন ত্যাগ করিয়া জগৎসিংহের সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তবে আইস বৎস, মস্‌নদে উপবেশন কর। আমি তোমার পিতা হইলেও অধুনা তোমার শাসনাধীন প্রজা মাত্র। যে মুহূর্ত্তে বাদশাহের সনন্দ তোমার হস্তগত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার হইয়াছ। তোমাকে সুবেদারের আসনে স্থাপিত করা আমার কর্ত্তব্য।"

জগৎসিংহ পিতার চরণে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণধূলা মস্তকে স্থাপন করিলেন। মানসিংহ পুত্রের হস্তধারণ করিয়া সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি সাহানশাহের আজ্ঞাক্রমে সর্ব্ব-সমক্ষে এই সভামধ্যে যুবরাজ জগৎসিংহকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারের সিংহাসনে সমাসীন করিতেছি। ভরসা করি, নবীন সুবেদারের শাসনকালে অধীনস্থ প্রদেশসমূহে শান্তি বিরাজ করিবে; প্রজাগণ সর্ব্বপ্রকারে নিরুপদ্রব থাকিবে; যুদ্ধ-বিগ্রহ হেতু অকারণ শোণিতক্ষয় হইবে না।"

নবীন সুবেদার কহিলেন, আমি প্রাণপণে বাদশাহের ইষ্ট-সাধনে নিযুক্ত থাকিব, শাসন বিষয়ে পূজনীয় পিতৃদেবের পরিগৃহীত পদ্ধতির অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিপুঞ্জের ও অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দের অনুরঞ্জন করিব।"

তখন মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "জয় নবীন সুবাদারের জয়!"

সভাসদ্ ও পারিষদ্‌গণ সেই বাক্যের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, "জয় নবীন সুবেদারের জয়!"

সভাস্থ অগণ্যপ্রায় সৈনিক ও দর্শক সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় নবীন সুবেদারের জয়!"

সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মিলন

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার যুবরাজ জগৎসিংহ পিতার সহিত মিলিত হইয়া সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতা-পুত্রে একসঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় যুবরাজকে মাতৃকাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়া মহারাজ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ প্রথমে উর্ম্মিলা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার তিন বিমাতাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের চরণে জগৎসিংহ ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা যুবরাজকে বিবিধ শুভাশীর্ব্বাদ জানাইলেন এবং তাঁহার বিগত ক্লেশসমূহের উল্লেখ করিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন, "তুমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর আছ, বোধ হয়, বিশ্রামেরও প্রয়োজন হইয়াছে। তোমার সহিত সুখদুঃখের অনেক কথা আছে। সময়ান্তরে তাহার ব্যবস্থা হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আইস।"

জগৎসিংহ নীরবে উর্ম্মিলা দেবীর অনুসরণ করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে এক সুসজ্জিত কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া উর্ম্মিলা দেবী কহিলেন, "এই কক্ষ-মধ্যে তুমি বিশ্রাম কর; আমি তোমার আহার্য্য ব্যবস্থা করিতে যাই।"

জগৎসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পার্শ্বদেশ হইতে এক সাশ্রুনয়না সুন্দরী বেগে আসিয়া তাঁহার বক্ষের উপর নিপতিত হইলেন। সেই সুন্দরী তিলোত্তমা।

যুবরাজ অবাক্! এ কি স্বপ্ন, না সত্য ঘটনা! অদ্য কি প্রেতাবিষ্ট মানবের ন্যায় তাঁহার সকল কার্য্যেই ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে? সহসা উন্মাদ-রোগাক্রমণে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতেছে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল। কিন্তু সত্যই তো সেই সাশ্রুনয়না সুন্দরী তাঁহার প্রাণের প্রাণস্বরূপা তিলোত্তমা ভিন্ন আর কেহই নহেন। সত্যই তো সেই হৃদয়-বিনোদিনী তাঁহার বুকের উপর নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। মনুষ্যের সহসা এক দিনে এরূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইতে পারে কি? অশেষ যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সহসা এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্যের সম্মিলন ঘটিতে পারে কি? অসম্ভব হইলেও এ ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমার নয়নে জল, অধরে হাসি। বড়ই অদ্ভুত দৃশ্যের সমাবেশ। জগৎসিংহ সেই প্রেম-পুত্তলীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন;—বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন, "তিলোত্তমা, তুমি যে এখানে?"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে তিলোত্তমা বলিয়া ডাকিলে তোমার অন্যায় কার্য্য হইবে। ভুবন-বিখ্যাত অম্বরেশ্বরের-পুত্রবধূ বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবীন সুবেদারের পত্নীকে কেহই তো নাম ধরিয়া ডাকিতে সাহস করে না।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "এ কথা ঠিক। অপরাধের নিমিত্ত পরে সমুচিত শাস্তি গ্রহণ করিব। এক্ষণে কৃপা করিয়া বল, এখানে তুমি কিরূপে আসিলে?"

তিলোত্তমা আবার হাসি মিশাইয়া বলিলেন, "শ্বশুরের গৃহে, স্বামীর আশ্রয়ে আমি কিরূপে আসিলাম, এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি আপনি আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিয়াছি।"

তখন জগৎসিংহ সেই সুশীলার বদন চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সত্য করিয়া বল, কিরূপে কি হইল?"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে জগৎসিংহকে তত্রত্য সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন, "তুমি অতিশয় পরিশ্রান্ত আছ, অগ্রে আহারাদি করিয়া, বিশ্রাম করিয়া স্থির হও, তাহার পর সকল কথা বলিব।"

যুবরাজ বলিলেন, "আজি এত অসম্ভব কাণ্ড ঘটিতে দেখিতেছি যে, তাহা স্মরণ করিয়া অবাক্ হইতেছি। সকলের মীমাংসা না হইলে আমি স্থির হইতে পারিব না।"

তিলোত্তমা ব্যজনী লইয়া যুবরাজের দেহে বায়ু-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ তাঁহার হস্ত হইতে ব্যজনী লইয়া বলিলেন, "অম্বরেশ্বরের পুত্র-বধূর নিশ্চয়ই অনেক দাসী আছে। তাহারাই পাখা করিবে। আমি বুঝিতেছি, সকল রহস্যই

তোমার জানা আছে। কৃপা করিয়া অগ্রে আমার কৌতূহল নিবারণ করিয়া সুস্থির করিয়া দেও।"

জগৎসিংহ অতি আদরে তিলোত্তমাকে আকর্ষণ করিয়া আপনার অঙ্কে ধারণ করিলেন। অবরোধের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর গড়মান্দারণে ছাদের উপর তিলোত্তমা যে ভাবে জগৎসিংহের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, আজি বহুদিন পরে আবার সেই সুখের উপাধানে, সেইরূপ মস্তক বিন্যস্ত করিলেন। কিন্তু সে দিনে আর এ দিনে কত প্রভেদ! সে দিনের কি ভয়ানক আশঙ্কা, কি বিভীষিকাপূর্ণ বিষাদের ছায়া! এ দিনের কি অতুলনীয় আনন্দ, কি প্রত্যক্ষ স্থায়ী সুখ!

এইরূপ অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া তিলোত্তমা একে একে সমস্ত কথাই যুবরাজের গোচর করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহের শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা, তথায় বিমাতা বিমলার সহিত মহারাণী উর্ম্মিলার নিকট গমন, সেই করুণাময়ীর সহায়তা-লাভ, তাঁহারই কৃপায় মহারাজের সহিত পরিচয়, তিলোত্তমার সেবায় মহারাজের সন্তোষ, মহারাণীর কৌশলে মহারাজের ক্ষমা, পুত্রবধূরূপে গ্রহণ ইত্যাদি সকল কথাই তিলোত্তমা ধীরে, সংক্ষেপে ও মধুর ভাষায় জগৎসিংহকে জানাইলেন।

সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জগৎসিংহ বলিলেন, "বুঝিয়াছি তিলোত্তমা, তোমারই বুদ্ধিতে, তোমারই কৌশলে আমার এই সকল শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া মনের ভাব বুঝাইবে? কি বলিয়া সে আর তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে? আমার মুক্তি বোধ হয়, তোমারই কৌশলে সাধিত হইয়াছে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তুমি প্রেমান্ধ, তাই প্রকৃত ব্যাপার দেখিতে পাইতেছ না। আমি চেষ্টা করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিয়াছি, অবজ্ঞাত হীনভাবে জীবনপাত না করিয়া, আপনার ন্যায়সঙ্গত স্থান আমি গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই। তোমার মুক্তির নিমিত্ত আমি কিছুই করি নাই; করিতে আমার সাধ্য কি আছে? নবাব-নন্দিনী আয়েষা শক্তি, বুদ্ধি, কৌশল সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়া। তিনিই আগ্রা গমন করিয়া তোমার মুক্তি ঘটাইয়াছেন; বোধ হয়, তোমার এই পদোন্নতি তাঁহার চেষ্টার ফল। তুমি শুনিয়াছ কি না জানি না, বাদশাহের আদেশ আসিয়াছে, আমার নিমিত্ত লক্ষ মুদ্রা আয়ের জায়গীর প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয়ই সেই নবাব-নন্দিনী ঘটাইয়াছেন। আমাদের এই সকল কল্পনাতীত সুখোদয় উপস্থিত হইয়াছে, এই সকলই আয়েষার অনুগ্রহের ফল। যদি এ সকলের নিমিত্ত কাহারও নিকট আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, তাহা হইলে আজীবন সেই শক্তিময়ী আয়েষার নিকট আমাদিগকে চির-বিক্রীত হইয়া থাকিতে হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; জানি না, কিরূপে সেই দেবীর ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারিব!"

তিলোত্তমা তখন সাদরে জগৎসিংহের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিলেন, "আমি জানি। তুমি এ দাসীর কথা শুনিবে বল?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "এরূপ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ তিলোত্তমা? তোমার বাক্য অন্যথা করিব, ইহাও কি সম্ভব? তোমার ন্যায়সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিতে হইলে যদি অসাধ্যসাধন করিতে হয়, তাহাতেও আমি কখনও পশ্চাৎপদ হইব না।"

তখন তিলোত্তমা উভয় হস্তে জগৎসিংহের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আয়েষাকে পত্নীভাবে গ্রহণ কর।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "প্রাণেশ্বরি, তোমার এই প্রস্তাব শুনিয়া তোমার সরলতা, উদারতা ও সহৃদয়তার বার বার প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কথায় তোমার বুদ্ধির কোনই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না; যে নারী কেবল কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের নিমিত্ত, প্রাপ্ত উপকারের প্রতিশোধস্বরূপে, ঋণ-মুক্ত হইবার বাসনায় অন্য নারীকে সপত্নীর আসন প্রদান করিতে পারে, তাহার হৃদয় যে অতি উচ্চ, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রণিধান করিয়া, সানন্দে বার বার তোমার প্রশংসা করিতেছি।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "প্রশংসা কর বা না কর, আমার নিন্দা করিতেছ কি জন্য?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "নিন্দা কিছুই করিতেছি না। আয়েষাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করার সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার বুদ্ধির কোনই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।"

"কেন? মহারাজের, মহারাণীর এবং অপর সকলেরই এই বাসনা। আয়েষাকে মহারাজ ও মহারাণী এ জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। তিনি সম্মত হন নাই; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুমি মনে করিলেই তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন হইবে।"

"বড় ভুল বিশ্বাসকে তোমরা মনে স্থান দিয়াছ। তোমরা আয়েষার হৃদয়-সিন্ধুর একটি তরঙ্গও দেখিতে পাও নাই। মহারাজ জানেন, মহারাণী জানেন, বিবাহ করিলেই স্ত্রী হয় এবং ভালবাসিলেই ভালবাসা হয়। কিন্তু প্রেমময়ী আয়েষা তাহা জানেন না। আয়েষা জানেন, যেখানে হৃদয়ের বিনিময় নাই, সেখানে শত সহস্র পুরোহিত বা মোল্লা একত্র হইয়া অশেষ মন্ত্রপাঠের পর বিবাহ ঘটাইয়া দিলেও সে বিবাহ, বিবাহ হয় না। যে ভালবাসা আপনি জন্মিয়া, আপন মনে বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণকে ভাসাইয়া না রাখে, সে ভালবাসা, ভালবাসা নহে; আয়েষার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, কেন না, এ ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিনিময় হইবার কোন ভরসা নাই। আয়েষা আমার নিমিত্ত হৃদয়ে অগাধ ভালবাসা পোষণ করিতেছেন জানি; কিন্তু আমার হৃদয়ের বীণা সে ভালবাসার সুরে বাজিতে জানে না। আমি আয়েষাকে যথেষ্ট ভালবাসি সত্য; কিন্তু সে ভালবাসা আয়েষার ভালবাসার অনুরূপ নহে। সুতরাং আমি তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তিনিও আমার পত্নী হইতে কখনই সম্মত হইতে পারেন না।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "কেন তুমি আয়েষাকে হৃদয় দিতে পারিবে না? কেন তুমি তাঁহাকে তাঁহার মত ভালবাসিতে পারিবে না?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "বড় বালিকার ন্যায় প্রশ্ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, 'কেন দিনে রাত্রি হয় না, কেন রাত্রিতে দিন হয় না? কেন জলে আগুন থাকে না?' সরলে, যাহা হইবার, তাহাই হয়; যে জন্য যাহার সৃষ্টি, সে সেই কাজ করে।"

তিলোত্তমা বলিলেন, "তাহা হইলেও যত্নে, চেষ্টায়, প্রবল বাসনায় অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায়। তুমি চেষ্টা করিলে অবশ্যই আয়েষাকে হৃদয় দিতে পার, নিশ্চয়ই তাঁহার সুরে তুমি হৃদয়ের বীণা বাঁধিয়া লইতে পার।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "হৃদয় একটা, যখন ইচ্ছা তখনই তাহা যাহাকে তাহাকেই দেওয়া যায় না। যে হৃদয়ে একমাত্র তোমারই পূর্ণ অধিকার, তাহাতে আর কাহারও স্থান হইতে পারে না। এক আকাশে অগণ্য তারকা থাকিতে পারে, কিন্তু দুইটি সূর্য্য বা দুইটি চন্দ্রের স্থান হয় না। তোমার ভালবাসার সুরেই আমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে শিখিয়াছে; আর কোন সুর ইহাতে আসিবে কেন? আয়েষা ক্ষুদ্র তারকার মত আকাশের একপার্শ্বে জ্বলিবার সামগ্রী নহেন। যে সুরে আয়েষার ভালবাসার গান বাজিতে পারে, আমার বীণার সে সুর নাই।"

তিলোত্তমা অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। রাজপুত্রের বাক্যের মর্ম্ম তিনি প্রণিধান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি কি মনে করিতেছ, সেই শোভার ফুল আপনি শুকাইয়া যাইবে? অপাত্রন্যস্ত প্রণয়ের তীব্র জ্বালা ভোগ করিতে করিতে সেই অতুল আলোক আপনি নিবিয়া যাইবে?"

জগৎসিংহ বলিলেন, "জানি না, বিধাতার কি বাঞ্ছা। কিন্তু বোধ হয়, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আয়েষার নিয়তি। আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসি; তাঁহার গুণে আমি একান্ত মুগ্ধ; তাঁহার রূপ অতুলনীয় বলিয়াই আমার মনে হয়; আমি তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে বদ্ধ। তাঁহার প্রয়োজনে আমি অকাতরে প্রাণ দিতে পারি; তথাপি তিনি যাহা পাইলে সুখী হইবেন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিতে আমার সাধ্য নাই; কেন না, তাহা আমার নাই। যে ভালবাসায় নরকও স্বর্গ হয়, যে ভালবাসায় মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে, সে ভালবাসা আমি আমার অঙ্কস্থিতা এই সুর-সুন্দরীকে নিঃশেষরূপে দিয়া ফেলিয়াছি; আয়েষা সেই ভালবাসার প্রার্থী। সে ভালবাসার সকলই এই দেবীর চরণে সমর্পিত হইয়াছে, সুতরাং সে দেবীকে দিবার উপযুক্ত সামগ্রী আমার নাই।"

তিলোত্তমা নীরব। বড়ই প্রগাঢ় প্রেমের কথা। আয়েষা পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণপ্রেম ব্যতীত কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ক্ষুদ্রা নারীর ন্যায়, মহারাজ মানসিংহের অগণ্যা মহিষীর ন্যায় প্রণয়াস্পদকে স্বামী বলিবার অধিকারমাত্র লাভ করিলেই আয়েষা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার এ ক্লেশ নিবারণের বুঝি আর উপায় নাই।

জগৎসিংহ বলিলেন, "কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছিলে। আয়েষার নিকট কৃতজ্ঞতার জন্য চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার হৃদয়ে আমাদের সম্বন্ধে অগাধ প্রেম, তিনি কি কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশায় অথবা বাধ্য-বাধকতা ঘটাইয়া প্রেম উদ্দীপন করিবার বাসনায় আমাদের বিবিধ উপকার করিতেছেন? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি একবারও আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিতেন, অন্ততঃ একবারও আমার সহিত প্রণয়ের প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেন। সে দেবীর হৃদয় অগাধ সিন্ধুস্বরূপ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমরা তাহার তরঙ্গমালার একটিও দেখিতে পাও নাই।"

দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে মহারাণী উর্ম্মিলা বলিলেন, "কুমার!"

তিলোত্তমা অপর দ্বার দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ বলিলেন, "আসুন মা।"

যুবরাজ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাণী উর্ম্মিলা বিবিধ খাদ্য-সামগ্রীপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্র হস্তে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আশার শেষ

মহারাজ মানসিংহ মহিষী ও অনুযাত্রিকগণসহ আগ্রায় গমন করিয়াছেন। যুবরাজ জগৎসিংহ স্বাধীনভাবে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাত্রাকালে মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আন্তরিক আশীর্ব্বাদরাশি তাঁহার শিরের উপর বর্ষণ করিয়াছেন।

মহারাণী উর্ম্মিলা গমন কালে রাজলক্ষ্মী তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ তিলোত্তমার অভাবে অনেক কষ্ট পাইবেন বলিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের সন্তোষসাধনার্থ মনের বাসনা অন্যরূপ হইলেও তিলোত্তমা তাঁহাদের সহিত গমন করিতেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ একাকী থাকিলে নানা প্রকার কষ্ট পাইবেন বিবেচনায় মহারাজ ও মহারাণী আপাততঃ তিলোত্তমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অবিধেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। যে দিন মহারাজা ও মহারাণীরা প্রস্থান করেন, সে দিনের সে বিদায়ের দৃশ্য আমরা এ স্থলে উপস্থিত করিব না; সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রোরুদ্যমানা তিলোত্তমার প্রণামের পর আশীর্ব্বাদের সময় কঠোর হৃদয় বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছিল এবং মহারাণী উর্ম্মিলা বধূমাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া যেরূপ রোদন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেককেই অতিশয় ব্যথিত হইতে হইয়াছিল।

একাকী জগৎসিংহের বিশেষ কষ্ট হইবে বিবেচনায় মহারাজা অন্যতম পুত্র কুমার মহাসিংহকে পাটনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহাসিংহ এক জন সুদক্ষ সেনাপতি, সাহসী যোদ্ধা এবং যশস্বী সম্রাট্‌কর্ম্মচারী। জগৎসিংহ অপেক্ষা মহাসিংহ বয়সে দুই বৎসরের কনিষ্ঠ।

যুবরাজ জগৎসিংহের অনেক আত্মীয় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিলোত্তমার প্রায় সকল আত্মীয় পাটনায় আগমন করিলেন। বিগত দীর্ঘকালব্যাপী দুর্দ্দৈবের পর যুবরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিমলা বড়ই ব্যাকুলা হইলেন। কিন্তু সে সময় পাটনা ত্যাগ করিয়া গড়মান্দারণের দিকে গমন করা যুবরাজ জগৎসিংহের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় অগত্যা কন্যাজামাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বিমলা পাটনায় আসিলেন; সুতরাং আশ্‌মানীও আসিল; আর আশ্‌মানী আসিতেছে দেখিয়া দিগ্‌গজও পেঁটারা গুছাইয়া সঙ্গ লইল। কাজেই সকলকে সঙ্গে লইয়া অভিরাম স্বামীকে পাটনায় আসিতে হইল; সুতরাং গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজও আবার পাটনায় আসিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। এতদ্ব্যতীত অনেক দাসদাসী লোকজন তাঁহাদের সঙ্গে আসিল।

বিমলা জামাতৃ-ভবনে বাস করিলেন না; সুতরাং গঙ্গাতীরে এক মনোহর অট্টালিকায় তাঁহার আবাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার পুরুষ সঙ্গী সকলেই স্বতন্ত্র ভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজের অনুমতি লইয়া তিলোত্তমাও বিমাতার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কান টানিলেই মাথা আইসে, যুবরাজ জগৎসিংহও স্বকীয় প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ এই আবাসে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বড়ই আনন্দে কাল কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক মাস অতীত হইয়া গেল।

প্রান্তে সেই ভবনের এক কক্ষে অভিরাম স্বামী ও বিমলা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বিমলা বলিতেছেন, "যাহা হইবার, সকলই হইয়া গিয়াছে; যে অসহনীয় দুঃখের জ্বালা এত দিন নীরবে সহিয়া আসিতেছি, তাহা আর সহ্য করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তিলোত্তমা সর্ব্বপ্রকারেই পূর্ণসুখের অধিকারিণী হইয়াছে; মহারাজ তাহাকে পুত্রের দাসী বলিয়া স্বীকার করিবেন, এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। আমাদের অদৃষ্টক্রমে ত এক্ষণে তিনি তাহাকে পরমসমাদরে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার স্বামী ধনে, মানে ও পদে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "তোমার অবিবেচনায় যাবতীয় দুর্ঘটনা ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বলিয়া এক দিন তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। আজি আবার আমি তোমার বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি, মহারাণী উর্ম্মিলা তোমার প্রতি চিরদিন কৃপাময়ী। তাঁহারই আশ্রয়ে তুমি বহু দিন পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছ; তাঁহারই কৃপায় তোমার স্বামী মানসিংহের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় তুমি মনোমত ব্যক্তিকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলে। সেই মহারাণী পুরুষোত্তম আসিয়াছেন জানিয়া, তুমি যে তিলোত্তমাকে লইয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলে, ইহাতে তোমার প্রভূত সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। সেই করুণাময়ী মহারাণীর কৌশলে আজি তিলোত্তমার এই সম্ভবাতীত ভাগ্যোদয়।"

বিমলা বলিলেন, "মহারাণী উর্ম্মিলা দেবীর চরণে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি। ভগবান্ তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারিণী করুন। এক্ষণে মহারাণীর দয়ায় আমাদের বাঞ্ছনীয় সকল ফলই লাভ করা হইয়াছে। আপাততঃ পিতঃ, আমি সংসারে থাকি কেন?"

অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসিলেন, "কি করিতে মনস্থ করিতেছ?"

বিমলা বলিলেন, "যাঁহার জন্য এ জীবন, তিনি যখন এ জগতে আর নাই, তখন আমি আর এ জীবন রাখি কেন?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "জীবন ত্যাগ করায় পাপ যথেষ্ট, ইষ্ট কিছুই নাই। বৎসে, আমার উপদেশ গ্রহণ কর—তুমি জীবন্মৃতা হও, তাহাতে সকলই শুভ ও আনন্দময় হইবে। সমস্ত বাসনা বর্জ্জন করিয়া তুমি অতঃপর পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইতে অভ্যাস কর, ইহাই আমার পরামর্শ।"

বিমলা বলিলেন, "আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু পিতঃ, এ বিষম হৃদয়-জ্বালার নিবৃত্তি আর কিছুতেই আছে কি?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "আছে বই কি! সুখদুঃখে সমজ্ঞান হইলেই সকল যন্ত্রণা শেষ হইবে।"

বিমলা বলিলেন, "সে জ্ঞান কই? বুঝিতেছি, সেরূপ বোধ হইলেই কষ্টের সমাপ্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানলাভের উপায় কোথায়?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "মা, তাহা উপদেশ ও সাধনাসাপেক্ষ। আমি যে কারণে এত দিন এখানে বদ্ধ ছিলাম, তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে অতঃপর এই সাধনা বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায়-গ্রহণ করিব। বোধ হয়, আমাদের আর পাটনায় থাকবার প্রয়োজন নাই। প্রায় এক মাসকাল কন্যা-জামাতা লইয়া তুমি আনন্দ করিয়াছ; বোধ হয় এই সুদীর্ঘ লৌকিক আনন্দে তুমি বুঝিয়া থাকিবে যে, এরূপ আনন্দেও সুখ নাই। আর এ বৃথা নিরানন্দময় আনন্দে কাজ কি মা? এক্ষণে অক্ষয়, অনন্ত আনন্দের পথ আমি তোমাকে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। অধুনা এ স্থান হইতে বিদায় হইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না?"

বিমলা বলিলেন, "যে আজ্ঞা, অদ্যই তাহার ব্যবস্থা করিব। প্রথমে তিলোত্তমার নিকট, তার পর রাজপুত্রের নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। রাজপুত্র এখনই এ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আশা নাই, ততক্ষণ তিলোত্তমার সহিত কথা শেষ করিয়া রাখিব।"

যখন বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভবনমধ্যে এই সকল কথা কহিতেছিলেন, তখন ভবনের বাহিরে এক কৌতুকাবহ দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ভবনের তোরণপার্শ্বস্থিত এক বৃক্ষনিম্নে লচ্‌মণির পা ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। কেমন করিয়া কি হইল, বুঝাইবার জন্য একটু পূর্ব্বকথা কহিতে হইবে।

গজপতি বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছেন। তিনি জানিতেন, "যাহার গোড়ায় 'আ' শেষে 'নী', তিনিই আমার প্রণয়িনী।" ইহা জ্যোতিষের বচন এবং তাঁহার ললাট-লিপি; সুতরাং এ কথা মিথ্যা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অভিরাম স্বামীর নিকট

বিমলার পত্র লইয়া গজপতি আর একবার পাটনায় আসিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে। সেই সময়ে মথুরাসিংহের দলভুক্ত পূর্ব্ব-পরিচিত সেই রহস্যপ্রিয় জ্যোতির্ব্বিদ্ সৈনিকের সহিত গজপতির দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়। গজপতি তাহাকে চিনিতে না পারিলেও সেই সৈনিক গজপতিকে চিনিয়া ফেলে। বিশেষ আমোদ হইবে মনে করিয়া সৈনিক আর এক জন সৈন্যকে আপনার গুরু খাড়া করিয়া গজপতিকে তাহার নিকট লইয়া যায়। গুরুদেব গজপতির কপাল দেখিয়া বলেন যে, "তথায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, 'যার গোড়ায় 'আ' শেষে 'নী', সেই তোমার প্রণয়িনী! এরূপ ললাট-লিপি যখন নিঃসন্দেহ, তখন গজপতির বড়ই জোর বাড়িয়া গেল। কিন্তু হইলে কি হয়, ঘটনা বড়ই প্রতিকূল হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী কথাচ্ছলে গজপতির সহিত রঙ্গরস উপলক্ষে বিমলাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। আশমানীও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই ঘটনার পর হইতে বিমলা ও আশমানী এ সম্বন্ধে বড়ই সাবধান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশমানী আর গজপতির সম্মুখে আইসে না, আসিলেও কোন কথা কহে না; সাবধানে অন্যদিকে সরিয়া পড়ে। চন্দ্র-সূর্য্য যে শাস্ত্রের সাক্ষী, সে শাস্ত্রও কি তবে মিথ্যা?

গজপতি স্থির করিয়াছেন, আশমানীর এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে তাঁহার অধিকার আছে। সমস্ত মুলুকের যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, সেই যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। সুতরাং তাঁহার নিকট নালিশ করা আবশ্যক। জগৎসিংহ যে সময়ে গঙ্গা-তীরস্থ ভবনে আগমন করেন, গজপতিও সে সময়ে আসিয়া তোরণ-পার্শ্বে অপেক্ষা করেন। যুবরাজের আগম ও নির্গম তিনি দেখিতে পান, কিন্তু কোন কথা বলিতে—রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেও তাঁহার সাহস হয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে খোলা তলোয়ার লইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সকল রক্ষী থাকে, তাহাদিগকে দেখিয়া গজপতির হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; সুতরাং মাথা বাঁচাইবার ভাবনায় নালিশের ভাবনা উড়িয়া যায়।

এরূপ সময়ে একদিন তিনি লচ্‌মণির চক্ষে পড়িয়া গেলেন। যুবরাজ আসিতেছেন দেখিয়া দিগ্‌গজ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়াছিলেন। রাজপুত্র ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর দিগ্‌গজ প্রচ্ছন্ন স্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ অন্যদিক্ হইতে লচ্‌মণি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। গজপতির সহিত এরূপ আমোদ যে অভিরাম স্বামীর বিরাগজনক, ইহা লচ্‌মণি জানিত না; সুতরাং এ সম্বন্ধে সাবধান হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে নাই। এক্ষণে সহসা গজপতির সাক্ষাৎ পাইয়া একটু আমোদ করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। মুখ ভার করিয়া একটু রাগের ভাব দেখাইয়া সে গজপতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

দিগ্‌গজের আর পূর্ব্ববেশ নাই। এখন সে ধুতি পরিয়া গায়ের উপর নামাবলী দিয়াছে, গলায় তুলসীর মালা পরিয়াছে, ললাটে ও নাসাগ্রে তিলক ধারণ করিয়াছে। এই বিশুদ্ধ বেশবান্ নাগরের হাত ধরিয়া লচ্‌মণি বলিল, "তবে হে চোর! অনেক সন্ধানে তোমাকে আবার আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

হঠাৎ লচ্‌মণির সাক্ষাৎ পাইয়া গজপতিও সুখী হইল। মনে করিল, "ধূমাৎ বহ্নিঃ"; যখন লচ্‌মণিরূপ মেঘ দেখা দিয়াছে, তখন আশমানীরূপ বৃষ্টিও ঝরিতে পারে। সেবারেও এরূপ ঘটিয়াছিল। লচ্‌মণি তাহার তৃষ্ণার মেঘ—জল নহে; আগত-প্রায় গাড়ীর আওয়াজ—গাড়ী নহে; শ্রীরাধিকার শ্রীচরণের নূপুরধ্বনি—শ্রীরাধিকা নহে; দূরবর্ত্তী সুরভি-কুসুমের গন্ধ—কুসুম নহে; আগমনশীল নরপতির সমৃদ্ধিজনিত ধূলা—নরপতি নহে; সুতরাং লচ্‌মণিকে দেখিয়া পূর্ণানন্দ না হইলেও গজপতির অনেক ভরসা হইল। যথেষ্ট আনন্দ হইল। বলিল, "তুমি—লচ্‌মণি—তুমি। তা তোমার আশমানী কোথায়?"

লচ্‌মণি বলিল, "আশমানী কোথায়, আমি কি জানি? কেন, আমাকে তোমার কি মনে ধরে না? যদি এমন করিয়া পায়ে ঠেলিবে মনে ছিল, তবে আমাকে মজাইলে কেন? আমি তোমার জন্যে পাগল হইয়া বেড়াইতেছি, একি তোমার একবার মনে হয় না?"

দিগ্‌গজ বলিল, "খুব মনে হয়। আমিও তোমার জন্যে প্রায় পাগল। তবে কথা কি জান, আশমানীকে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। তাহার সহিত অনেক দিনের প্রণয়। তাহাকে হঠাৎ একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারা যায় না। তুমি একবার দয়া করিয়া ডাকিয়া দিতে পার?"

লচ্‌মণি বলিল, "আমার কি দায় পড়িয়াছে? আপনার শত্রুকে কে কোথায় ডাকিয়া দুধের বাটি খাইতে দেয়? আমি তাহাকে কখনই ডাকিব না। আমি তোমাকে এবার আর ছাড়িব না। তুমি এখন আমার হইয়া থাকিবে কি না বল?"

দিগ্‌গজ বলিল, "নিশ্চয় থাকিব। কিন্তু সুন্দরি, আশমানীর সহিত একেবারে ছাড়াছাড়ি করিয়া তোমার হইয়া থাকিবার আগে একবার তাহার নিকট শেষ বিদায় লওয়া উচিত নয় কি? দোহাই তোমার, তুমি তাহার উপায় করিয়া দেও।"

লচ্‌মণি বলিল, "কখনই না। আমি তোমাকে আশমানীর সহিত একটা কথা কহিতেও দিব না; দূরে দাঁড়াইয়া একবার তাহাকে দেখিতেও দিব না। আশমানীকে যদি কখনও তোমার নিকটে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি দুইজনকেই ঝাঁটা-পেটা করিব।"

বিষম সমস্যা। দিগ্‌গজ অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "তবে কি আশমানীর সহিত এ জন্মে আমাকে আর একবারও সাক্ষাৎ করিতে দিবে না?"

লচ্‌মণি বলিল, "কখনই না।"

তখন গজপতি কাঁদিতে কাঁদিতে লচ্‌মণির চরণ ধারণ করিয়া বলিল, "সুন্দরি! তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমাকে মারিয়া ফেলিলে তোমার কি লাভ হইবে?"

লচ্‌মণি অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিল, "তুমি মরিয়া যাও, সেও ভাল; তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাইতে পারিব, তবু আশমানীর হইতে দিব না।"

যখন দিগ্‌গজ কাতরভাবে লচ্‌মণির চরণতলে রোরুদ্যমান, তখন অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র লচ্‌মণি বেগে পলায়ন করিল। পলায়নের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকিলেও দিগ্‌গজ পলাইতে পারিলেন না। তিনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভিরাম বলিলেন, "মূর্খ! এই স্ত্রীলোকেরা তোমাকে লইয়া তামাসা করে, এ সামান্য কথাটা বুঝিবার মত বুদ্ধিও কি তোমার নাই? আমি শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি তোমাকে বুঝাইয়াছে, তোমার কপালে এই প্রণয়ের কথা লিখিত আছে। মিথ্যা কথা! আমি জ্যোতিষের সকল অংশই রীতিমত আলোচনা করিয়াছি। তোমার ললাটে এরূপ কোন কথাই লিখিত নাই, ইহা আমি বিশেষ জানি। যদি আমার অনুগ্রহ তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে অতঃপর এই সকল কুৎসিত ব্যবহার তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে আমার সঙ্গে আইস।"

অগত্যা গজপতি অধোমুখে গুরুর অনুসরণ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অশান্তি

জগৎসিংহের শাসনকালের প্রারম্ভে এই সুবিশাল প্রদেশে কোনই অশান্তি দৃষ্ট হইল না। সর্ব্বত্র প্রকৃতিপুঞ্জ নিরুপদ্রব ও নিশ্চিন্তভাবে কালপাত করিতে থাকিল। বিভিন্ন প্রদেশত্রয়ের কুত্রাপি অসন্তোষ রহিল না। কোথাও বিদ্রোহ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। স্বাধীনভাবে প্রেমময়ী পত্নীর সঙ্গ-সুখে ও নবার্জ্জিত পদ-প্রতিষ্ঠার গৌরব ভোগ করিতে করিতে যুবরাজ জগৎসিংহ পরমানন্দে কাল কাটাইতে থাকিলেন।

কিন্তু বোধ হয়, এ সংসারে চিরানন্দের ব্যবস্থা নাই। যেখানে আনন্দের কুসুম ফুটিয়া উঠে, সেখানেই দুষ্ট কীট অলক্ষিতভাবে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং শোভা ও সৌন্দর্য্য বিকৃত ও বিরূপ করিয়া দেয়। সহসা উড়িষ্যা হইতে রাজা রামচন্দ্র দেব সংবাদ পাঠাইলেন, নবাব ওস্‌মান খাঁ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজনও যথেষ্ট চালাইতেছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই উড়িষ্যায় বিষম অশান্তির উদয় হইবে।

এই সংবাদ নবীন সুবেদারকে নিতান্ত বিচলিত করিল। কুমার মহাসিংহের সহিত তিনি এতদ্বিষয়ক পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের নিমিত্ত সকল ব্যবস্থা স্থির রাখিয়া সতত প্রস্তুত থাকাই আবশ্যক বলিয়া উভয় ভ্রাতা মনে করিলেন। মোগলপক্ষে প্রভূত আয়োজন আরম্ভ হইল।

অচিরে পুনরায় সংবাদ আসিল, উড়িষ্যার পাঠানগণ নবাব ওস্‌মান খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে চালিত হইয়া বিষম ব্যাপার ঘটাইয়াছে। পুরী পুনরাক্রান্ত ও পাঠানগণের অধিকৃত হইয়াছে। রাজা রামচন্দ্র

দুর্গান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, সে দুর্গও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে।

পাঠানদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে কুমার মহাসিংহ প্রভৃত আয়োজন সহকারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। ভদ্রকের সন্নিহিত প্রদেশে বিপক্ষগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তথায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাব ওস্‌মান স্বয়ং সৈন্য-চালনা করিলেন এবং উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী ওস্‌মানকে আশ্রয় করিলেন। মোগলপক্ষের অতি লজ্জাজনক পরাজয় হইল। মহাসিংহের বিস্তর সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল; যাহারা জীবিত থাকিল, তাহারাও প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিল। স্বয়ং মহাসিংহকেও শেষে রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

বিজয়ী পাঠানগণ সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। কিন্তু অদম্য উৎসাহশীল ও নববলে বলীয়ান্ ওস্‌মান কেবল উড়িষ্যার আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বঙ্গদেশের অভিমুখেও তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাসিংহ নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

যুবরাজ জগৎসিংহও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তখন পাঠানগণ বঙ্গদেশের ভূরিভাগ অধিকার করিয়াছেন। অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র মেদিনীপুর, সমগ্র মল্লভূমি, সমগ্র কোলহান এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের বহু অংশ পাঠানগণের করতলগত হইল। প্রত্যেক যুদ্ধেই ওস্‌মানের জয় হইতে লাগিল। তাঁহার সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়া শত্রুপক্ষীয়েরাও মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার বাহুতে যেন অনৈসর্গিক শক্তি, তাঁহার হৃদয়ে যেন অনন্ত উদ্যম, বিজয়শ্রী যেন তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী। সকলেই বুঝিল, উড়িষ্যার অধিকার মোগলদিগের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে, বুঝি বা বাঙ্গালা বিহারও অচিরে নবাব ওস্‌মানের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত অবনতশিরে অপেক্ষা করিতেছে।

ওস্‌মানের এই জয়োল্লাসে আয়েষার আনন্দের সীমা রহিল না। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলেও তিনি এই সমর-ব্যাপারের প্রধান নায়িকা ছিলেন। অনেক যুদ্ধে তিনি আপনার দাসদাসী সঙ্গে লইয়া ওস্‌মানের অনুগমন করিতেন। অনেক যুদ্ধে রণবিরতিকালে ওস্‌মান আয়েষার শিবিরে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। আয়েষার মন্ত্রণা ও বুদ্ধিকৌশলে অতি সহজেই ওস্‌মান জয়লাভ করিতে লাগিলেন। আয়েষার রোগমুক্তির পর ওস্‌মান তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ সফল হইল। ওস্‌মানের উৎসাহ অপরিসীম। জগৎসিংহ আসিয়াও ওস্‌মানের জয়শ্রীর অনুমাত্র অপচয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে জগৎসিংহ সম্মুখ-যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে ওস্‌মানকে বিনাশ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অচিরে সুযোগ উপস্থিত হইল।

ওস্‌মান বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, বর্দ্ধমান জয় করিতে পারিলেই বাঙ্গালার আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করতলগত হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি প্রথমে গড়মান্দারণ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। গড়মান্দারণ পাঠানদিগের হস্তগত হইলে এবং তথায় সৈন্যাদি সমাবেশ করিতে পারিলে বর্দ্ধমান জয় করার কোনই অসুবিধা থাকিবে না। এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া, নবাব ওস্‌মান এক দল উৎকৃষ্ট যোদ্ধা গড়মান্দারণের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। জগৎসিংহ তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন, এ সংবাদ ওস্‌মানের অবিদিত ছিল না। সে স্থান হইতে কখন একবার শ্বশুরালয়ে আগমন করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এইরূপ অনুমান করিয়া নবাব সৈন্যদিগকে গড়মান্দারণ সন্নিহিত অরণ্যাদি প্রচ্ছন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা সহসা কোন যুদ্ধাদি না করিয়া জগৎসিংহ সে দিকে আইসেন কি না, লক্ষ্য রাখিবে। যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সজীব অবস্থায় বন্দী করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহাকে বধ করিতে হইবে। তাহার পর সমুচিত সময়ে ওস্‌মান স্বয়ং আসিয়া স্বর্গীয় বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ ও যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবেন।

পাঠানসৈন্যগণ উপদেশ অনুসারে গড়মান্দারণ-সন্নিহিত প্রদেশে জগৎসিংহকে লুক্কায়িতভাবে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল। জগৎসিংহ কিন্তু একবারও গড়মান্দারণের দিকে আসিলেন না। তিনি বর্দ্ধমান হইতে অল্প-সংখ্যক নির্ব্বাচিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রকাশ্য রাজপথ তিনি অবলম্বন করিলেন না; সঙ্কীর্ণ

স্বল্প-ব্যবহৃত পথ ধরিয়া সহসা ওস্মানকে আক্রমণ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। নবাব ওস্মানও সহসা জগৎসিংহকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। উভয় যোদ্ধাই প্রায় সমান বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। উভয় বীরই প্রায় যথাসময়ে স্বল্পমাত্র নির্ব্বাচিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে যাত্রা করিলেন।

সুবর্ণরেখা নদীতীরে জগৎসিংহ সংবাদ পাইলেন, ওস্মানের সম্প্রদায় অদূরে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ওস্মানকে আক্রমণ করিবার ইহাই সমুচিত সুযোগ বলিয়া যুবরাজ মনে করিলেন। তদর্থে প্রস্তুত হইয়া তিনি ধাবিত হইবেন, এমন সময় ওস্মান শত্রুর অভিপ্রায় অনুভব করিতে পারিয়া, যুদ্ধ-বিরতি-সূচক পতাকা হস্তে দিয়া এক দূতকে জগৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

যুবরাজের সম্মুখাগত হইয়া দূত সসম্মান নিবেদন করিল, "অদ্যকার যুদ্ধে বোধ হয়, উভয় পক্ষের একই লক্ষ্য। নবাবকে নিপাত করাই বোধ হয় যুবরাজের বাসনা এবং যুবরাজকে বিনাশ করাই বোধ হয় নবাবের অভিপ্রায়। এরূপ খণ্ড যুদ্ধের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অকারণ সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি নরহত্যা না ঘটাইয়া নবাব ও যুবরাজ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেই সহজে এক পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যুবরাজের কি অভিপ্রায়?"

যুবরাজ যুদ্ধোদ্যম নিরস্ত করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "আমি এ প্রস্তাবে অসম্মত নহি। তুমি নবাবকে বলিবে, আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছি। নবাবের যদি বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে আমি সংবাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করি।"

দূত অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল; জগৎসিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, শিবিরে দূত প্রবেশ করিল। অবিলম্বে শিবির হইতে সশস্ত্র ওস্মান নির্গত হইয়া জগৎসিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটে যুবরাজের অশ্ব সজ্জিত ছিল; কিন্তু ওস্মান পদব্রজে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, জগৎসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন না; তিনিও সমুৎসাহে ওস্মানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

উভয় বীর নিকটস্থ হইলে জগৎসিংহ বলিলেন, "আপনার সহিত সেই দেখা আর এই দেখা। ভরসা করি, এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হইবে। কারণ, অন্ত এ স্থান হইতে এক জনমাত্রই ফিরিবার সম্ভাবনা।"

ওস্মান কহিলেন, "আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেই আমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবারও আবার আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে মিলিত হইয়াছি। আপনি আমার পরম শত্রু। আমি স্বহস্তে শত্রু নিপাত করিবার বাসনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করিয়াছি। ভরসা করি, এবার আমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "আমরা বৃথা বাক্যব্যয় করিবার নিমিত্ত এ স্থানে মিলিত হই নাই। আপনি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন।"

ওস্মান সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি প্রস্তুত; আপনি জীবনরক্ষার উপায় করুন।"

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দূরে থাকিয়া উভয়পক্ষীয় বীরেরা চিন্তাকুলভাবে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উভয়েরই নিপুণতা ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিল। সহসা ওস্মানের অসি রাজপুত্রের অসিঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। ওস্মান তৎক্ষণাৎ বর্শা লইয়া রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও অসি ত্যাগ করিয়া বর্শা গ্রহণ করিলেন।

ওস্মানের পরিত্যক্ত বর্শা যুবরাজের গ্রীবাদেশের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ছিন্ন করিয়া দূরে চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য শিক্ষা-কৌশলে ওস্মান নক্ষত্রবেগে ঘুরিয়া গিয়া সেই বর্শা উঠাইয়া লইলেন। রাজপুত্রের পরিত্যক্ত বর্শা ওস্মানের মস্তকে লাগিল। উষ্ণীষ উড়িয়া গেল, কিন্তু মস্তকে বিশেষ আঘাত লাগিল না। বিচিত্র দক্ষতা সহকারে জগৎসিংহ পুনরায় বর্শা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ওস্মানের হস্তত্যক্ত বর্শা আসিয়া তাঁহার ঢালে লাগিল। জগৎসিংহ সেই বর্শা ওস্মানকে পুনর্গ্রহণ করিবার সুযোগ দিলেন না। তিনি তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং ওস্মানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। বর্শা ওস্মানের মস্তকে লাগিল। অস্থি ভিন্ন হইল না বটে, কিন্তু চর্ম্ম ছিন্ন হইল এবং মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগিল। কিয়ৎকাল ওস্মান চতুর্দ্দিকে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগৎসিংহ এই সুযোগে একটু দূরে সরিয়া আসিলেন এবং ওস্মানের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অতিশয়

শক্তি সহকারে বর্শা প্রক্ষেপ করিলেন। ওস্মান তৎকালে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে অশক্ত; সুতরাং পার্শ্বস্থ দর্শকগণ বুঝিল, রাজপুত্র-পরিত্যক্ত বর্শাঘাতে এবার নিশ্চয় নবাবকে গতাসু হইতে হইবে। জগৎসিংহ বিপুল শক্তি সহকারে বর্শা প্রক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ যেন ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া সেই ক্ষেত্রে এক সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। সুন্দরী চিন্তার ন্যায় সূক্ষ্মগামিনী হইয়া নিমিষমধ্যে সেই নিক্ষিপ্ত বর্শা ও ওস্মানের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। সকলের বদন হইতেই অজ্ঞাতসারে যন্ত্রণাব্যঞ্জক 'উহ্' শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। ওস্মানের ক্ষণিক অবসন্নতা তখন অপগত হইয়াছে। জগৎসিংহ শিহরিয়া উঠিলেন এবং আর্ত্তভাবে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার হস্তত্যক্ত বর্শা তখন সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া দেহ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই সুন্দরী ওস্মানের বক্ষের উপর পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ওস্মান, গুণময় ভাই, আমি এ জীবনে তোমার অশেষ যন্ত্রণার হেতু হইয়াছি; প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন আমাকে তোমার ক্লেশের কারণ না হইতে হয়।"

সেই সুন্দরী আয়েষা। তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ কাহারও মনে থাকিল না। ওস্মান সেই সুন্দরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বর্শা নিষ্কাশন করিলেন। জগৎসিংহ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায়! আমার বর্শায় বিদ্ধ হইয়া আজি জগতের সাররত্ন—আমার পরম হিতৈষিণী দেবী মহাপ্রস্থান করিতেছেন। কেন নবাবের অস্ত্রাঘাতে পূর্ব্বেই আমার এ অকৃতজ্ঞ প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই?"

আয়েষা বলিলেন, "রাজপুত্র, নিকটে আসুন। ওস্মান, প্রেমময় ভাই, আমার আর সময় নাই; বলিবার বিশেষ কোন কথাও নাই। রাজপুত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার দেহে অস্ত্রাঘাত করেন নাই; সুতরাং এ জন্য তাঁহাকে দোষী করিও না। অদৃষ্টের বশে আমি চিত্তের উপর প্রভুতা হারাইয়া নিজে আজীবন দুঃখ পাইলাম, তোমাকেও দুঃখের সাগরে ভাসাইলাম। অভিন্নহৃদয় ভ্রাতঃ, তুমি প্রেমময়, তোমার প্রেমের কণিকা পাইলেও লোক ধন্য হয়। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমার এই অলৌকিক প্রেমভোগের অধিকারে আমি বঞ্চিত না হই।"

শিবিরের হকিম তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আয়েষা বলিলেন, "হকিমের কোন প্রয়োজন নাই। এ আঘাতের কোন প্রতীকার নাই। রাজপুত্র, আমি আপনাকে বড় ভালবাসিয়াছিলাম, কোন প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমার প্রাণের সকল ভালবাসা আপনার চরণে অর্পণ করিয়াছিলাম। যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া লইতে আমার সাধ্য ছিল না। আর এক দিকে আমার নিমিত্ত যে অগাধ ভালবাসার সমুদ্র পড়িয়া ছিল, তাহা আমি দেখিয়াও দেখি নাই! সেই অবিবেচনায়, সেই অন্ধতায় আমি সংসারে অনেকের হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন করিয়া আজি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি। রাজপুত্র, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না জানিতাম; কিন্তু আমার জীবনের জীবন ওস্মানের বক্ষে বর্শা বিদ্ধ হইবে আশঙ্কায় আজি আমাকে দেখা দিতে হইল। আয়েষা অভাগিনি! তাহার জীবন শীঘ্র যাইলেই পরম মঙ্গল।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "যাহার নিকট জীবন অসংখ্য উপকারে বদ্ধ, যাহার তুলনা এ সংসারে নাই, যাহার নিকট কৃতজ্ঞতা কখনই শেষ হইবার নহে, আজি আমার হস্তে সেই আয়েষার প্রাণান্ত হইতেছে, এ অসহনীয় দুঃখ অতঃপর আমার চির-দিনের সঙ্গী।"

আয়েষা বলিলেন, "যুবরাজ, ভুলিয়া যান, আয়েষার বিষাদময় জীবনের সকল কথা ভুলিয়া যান। প্রার্থনা করি, আপনি পরম সুখে জীবন-পাত করুন। তিলোত্তমা ভগ্নীকে এ অভাগিনীর কথা আর বলিয়া কাজ নাই। আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় দেন।"

রাজপুত্র অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। আয়েষার ক্ষতমুখ হইতে প্রবলবেগে রুধিরপাত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। তিনি কষ্টে বলিতে লাগিলেন, "ওস্মান—প্রেমময়—তোমার মুখ আর ভাল দেখিতে পাইতেছি না। বুঝি, আর বিলম্ব নাই। জীবনে তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। এইবার তোমাকে চরম কষ্ট দিয়া প্রস্থান করিতেছি। ওস্মান, ভাই, এই অন্তিম সময়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে চিরবিদায় দাও।"

ওস্মানের চক্ষুতে জল নাই, মুখে শব্দ নাই, হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস নাই। সেই যোদ্ধসজ্জায় সজ্জিত

বীর যেন পাষাণ-পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। তাঁহার অঙ্কে সেই শোণিতনিষিক্তা মরণ-কবলিতা ভুবনমোহিনী।

জগৎসিংহ কাতরভাবে বলিলেন, "নবাবসাহেব! নবাব-নন্দিনী আপনার নিকট বিদায় চাহিতেছেন।"

ওস্মানের সংজ্ঞা হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "প্রাণেশ্বরি, তুমি বিদায় চাহিতেছ? যাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে আমি বিশ্ব অন্ধকার দেখিতাম, যাহার প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া জীবনের সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতাম, তাহাকে বিদায়! জীবন-সঙ্গিনি, কিছু অগ্রে যাইতে বাসনা করিয়াছ? যাও, তোমার ওস্মান শীঘ্রই তোমার অনুসরণ করিবে।"

আয়েষা বলিলেন, "কথা কহিতে পারি না—কথা শেষ হইয়াছে। আমার মা—আমার দুঃখিনী মাকে শান্ত করিও ওস্মান! তুমি আমার প্রতি চির করুণাময় জানিয়া তোমার কোলে মৃত্যু—বড় সুখ। ওস্মান! কি শোভা! তোমাতে আমাতে—স্বর্ণরথে—বিমানে—ভাই ভগ্নী কি মধুর—আহা, যাই—ওস্মান—"

আর কথা আয়েষার মুখ হইতে বাহির হইল না। সকলেই দেখিল, সেই সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা সহসা নিবিয়া গেল! সকলেই বুঝিল, সেই শোভার ফুল অকালে ঝরিয়া পড়িল।

শেষ

অতি রমণীয় প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে আয়েষার বরবপু সমাধিস্থ করা হইল। অনেকে দেখিতে পাইত, এক বিষাদাচ্ছন্ন পুরুষ প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেই সমাধি-সন্নিধানে আসিয়া এবং কবরের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। সেই পুরুষ ওস্মান।

এই দুর্ঘটনার পর উৎসাহ ও উদ্যম ওস্মানকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিল; যে বলে ওস্মান বলীয়ান্ ছিলেন, তাহাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; আরও দুই একটি যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সকল যুদ্ধেই ওস্মান সহজে পরাজিত হইলেন। পাঠানদিগের সমস্ত অধিকারই মোগলদিগের হস্তগত হইল। ওস্মান সে জন্য একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন না। উড়িষ্যায় পাঠান-আধিপত্যের সমাপ্তি হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে পাঠান-প্রাধান্য নির্ম্মূল হইয়া গেল।

ওস্মানের জীবনান্ত হইলে, তাঁহার বাসনানুসারে আয়েষার সমাধিপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর কলেবর সংরক্ষিত হইল।

সম্পূর্ণ

মৃন্ময়ী

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থোপহার

পরমার্চ্চনীয়

শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন মাতুল মহাশয়ের শ্রীচরণে

তদীয় একান্ত স্নেহাস্পদ ও অনুগ্রহভাজন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন

গ্রন্থ সাধারণ-সমীপে প্রচারিত হইবামাত্র গ্রন্থকারের মনে কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ জন্মে; কিন্তু এই গ্রন্থকারের হৃদয় তৎপরিবর্ত্তে দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। গ্রন্থরচনাপক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ততাই ইহার কারণ। গ্রন্থ প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু কে জানে অদৃষ্টে কি আছে। হয় তো এই অবিমৃষ্যকারিতা-নিবন্ধন আমার ইহকালের সমস্ত আশাভরসা নির্ম্মূল হইবে, হয় তো ইহা আমার দারুণ লজ্জা ও ক্ষোভের কারণ হইবে এবং হয় তো এই ঘটনায় আমার ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে সে বিবেচনা বৃথা। মনুষ্য-মাত্রেরই স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করা কর্ত্তব্য। আমাকেও অবশ্যই এই দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে।

আমি সাধ্যানুসারে গ্রন্থমধ্যে অস্বাভাবিকতা, অশ্লীলতা, রূঢ়তা, গ্রাম্যতা প্রভৃতি দোষ নিবিষ্ট করি নাই। আমার দৃষ্টিতে যদিও গ্রন্থ সে সমস্ত দোষ-বর্জ্জিত হইয়া থাকে, তথাপি ভিন্নদৃষ্টিতে হয় তো রাশি রাশি সেরূপ দোষ নির্ব্বাচিত হইবে; সুতরাং সে কথার উল্লেখ অনাবশ্যক।

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক অপর গ্রন্থের কোন ভাব এই গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করি নাই। সকল গ্রন্থের সংবাদ কিছু আমার আয়ত্ত নহে; সুতরাং অজ্ঞাত গ্রন্থের কোন ভাব ইহার মধ্যে যদি আসিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি দোষী নহি।

আমার এই সামান্য পুস্তকখানি প্রচারিত হওয়াতেই আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। অপিচ, বঙ্গীয় কাব্যলেখকচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রসময়ী-প্রসূত লেখনী সুবিখ্যাত পুস্তক কপালকুণ্ডলাকে এতদ্দারা হয় তো বিকৃতদশাপন্ন করিলাম ভাবিয়া আমি আরও সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি এই অসমসাহসিকতার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমার এই গ্রন্থপাঠে সহৃদয় পাঠকের আনন্দ জন্মিবে, আমি এমন ভরসা করি না; তবে যদি ইহার বিপরীত ঘটে, তাহা হইলে আমি আশাতিরিক্ত ফল পাইব।

যে সকল মহাত্মা এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সন্তোষ সহকারে ইহা মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন, তাঁহাদিগের নাম এ স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার সহিত তাঁহারা গালি খাইয়া মরিবেন কেন?

এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে আর একটি কথা নিতান্ত আবশ্যকবোধে এ স্থলে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। মৃন্ময়ী কপালকুণ্ডলার উপসংহারভাগ মাত্র। ইহা মুদ্রিত করিতে হইলে কপালকুণ্ডলার গ্রন্থকার বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বহরমপুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় সে অনুমতি দেওয়াইবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছেন।

এই আমার প্রথম উদ্যম। নিতান্ত নিরুৎসাহ ও সাধারণের বিরাগভাজন হইলে, ইহাই আমার শেষ উদ্যম। ইতি।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"—মেঘদূতম্।

চৈত্র-বায়ু বিতাড়িত বিশাল গঙ্গা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া এক খণ্ড তট-মৃত্তিকা তদুপরিস্থ কপালকুণ্ডলা সহ নদীনীরমধ্যে নিপতিত হইল। সন্নিহিত নবকুমার পত্নীর এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে কাতর হইয়া গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিলেন। সেই ভাগীরথীর পবিত্র সলিলমধ্যে নিমজ্জিত যুবক-যুবতীর অদৃষ্টে অতঃপর কি ঘটিল, তাহা কপালকুণ্ডলার পাঠক-পাঠিকা জ্ঞাত নহেন। আমরা অনুসন্ধানে প্রমাণ পাইয়াছি যে, ভীষণ বামাচারী কাপালিক কিয়ৎকাল তাঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্বয়ং গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিল এবং অনতিকালমধ্যে নবকুমারের মৃতপ্রায় দেহ তীরে উঠাইয়া আনিল। বহুদ্রব্যগুণজ্ঞ কাপালিকের যত্নে নবকুমারের দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চারিত হইল; কিন্তু তৎকালে কপালকুণ্ডলার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই শোকাবহ ঘটনাই বনবিহারিণী সুখবোধবিহীনা, কপালিনীর জীবনে শেষ মনে করিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণমনে ক্ষান্ত আছেন; কিন্তু আমরা তৎপরেও সবিশেষ অনুসন্ধানে কপালকুণ্ডলার বিষয়ে আরও অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কৌতূহলপরবশ পাঠকগণ এই গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

মৃন্ময়ী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

তটিনী-তটে

"বিনা সীতাদেব্যাঃ কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ।
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং কিল জগদরণ্যং হি ভবতি॥"
—ভবভূতি (উত্তর-রামচরিত)।

বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমে সুবিখ্যাত নীতিকুশল সম্রাট্ আকবরের উত্তরাধিকারী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ফাল্গুন মাসে একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম-নিম্ন প্রবাহিণী তটিনী-তটে একটি যুবক কর-কপোল-সংলগ্ন হইয়া চিন্তিতাবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য্যদেব সমস্তদিন দুঃসহ কর-প্রসারণে বিশ্ব-সংসারকে কাতর করিয়া এক্ষণে বিশ্রামলাভাশয়ে পশ্চিম-গৃহে গমন করিতেছেন। সায়ংকাল সমাগতপ্রায়। যে স্থানে যুবক বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, সপ্তগ্রামের যে অংশ নিবিড় বনাচ্ছন্ন, তথায় মনুষ্যের বড় যাতায়াত নাই। যুবক একমনে একান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টি সমভাবে একদিকে পতিত রহিয়াছে। এরূপ স্থানে এমন সময় যুবক বসিয়া কি ভাবিতেছেন? সায়ংকাল সমুপস্থিত বোধে সন্নিহিত কাননে বিহঙ্গমগণ কূজন সহকারে যে সুস্বর বৃষ্টি করিতেছে, যুবকের শ্রুতি কি তৎপ্রতি নিবিষ্ট ছিল?—না। পদপ্রান্তে শৈলসুতা ভাগীরথী তরঙ্গ-হিল্লোল সহকারে উচ্ছলিতা হইতেছেন, যুবক কি তন্মনা হইয়া তাহাই ভাবিতেছেন?—তাহা নহে। অদূরে তমসাকাঙ্ক্ষী শৃগালদল সন্ধ্যা-সমাগমদর্শনে স্ব স্ব গুহা-বিনির্গত হইয়া উল্লম্ফন ও পর পর গাত্রলেহন করিতেছে, তিনি কি সেই দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন?—তাহাও নহে। নদী-নীর নিপতিত ব্রততীসমূহ ব্রীড়াবিপন্না নবোঢ়া বঙ্গাঙ্গনার স্বামি-সমাগমে ক্ষণাগ্র ক্ষণপশ্চাৎ গতির ন্যায় গঙ্গা-প্রবাহে একবার দূরগত এবং পরক্ষণেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, তিনি কি তাহাই দেখিতেছেন?—তাহাও নহে। ভীতি-সমাকুল কচ্ছপাদি জলজন্তু সকল সন্ধ্যা-সমীর-সেবনাশয়ে ক্ষণে ক্ষণে জলোপরি ভাসমান হইয়া পরক্ষণেই ব্যগ্রতা সহকারে অতল জলে অদৃশ্য হইতেছে, তিনি কি তদ্দর্শনে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন?—না, এ সকল কিছুই নহে। যুবক দারুণ চিন্তাসাগরে ভাসিতেছেন। তাঁহার এত যে কিসের চিন্তা, তাহা তিনি ভিন্ন অন্যে বলিতে অক্ষম। যুবকের সুপ্রশস্ত ললাট দিয়া স্বেদ-বারি বিগলিত হইতেছে এবং উজ্জ্বল লোচন দিয়া অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইতেছে। তিনি স্বভাবজাত তৃণাসনে সমভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চক্ষুর নিমেষ নাই তাঁহার বামহস্তে গণ্ডদেশ সংস্থাপিত, দক্ষিণহস্ত জানুসংলগ্ন। সর্ব্ব-শরীর স্পন্দহীন। সময় সময় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার সজীবত্বের সমর্থন করিতেছে। তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিলে বোধ হইত যেন, কোন সুগঠিত দেবমূর্ত্তি নদীতটে সংস্থাপিত রহিয়াছে।

সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে একটি মোহিনী রমণী মূর্ত্তি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে যুবকের দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। এ বিজন বনে সেরূপ অসামান্যা সুন্দরী সমাগম-দর্শনে তাঁহাকে বন-দেবী ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা করা অসম্ভব। সুন্দরী মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপে যুবকসন্নিহিত হইয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যুবকের দৃষ্টি যুবতীর প্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যক্ত হইল। সুন্দরী যুবতী নিঃশব্দে থাকিলেন। অনেকক্ষণ পরে যুবক কহিলেন, "পদ্মাবতি! এখানে কেন?"

যুবতী কহিলেন, "নবকুমার! দুর্ভাগিনী পত্নীকে আর কত কষ্ট দিবে?"

নবকুমার উত্তর করিলেন, "তুমি আমাকে বারংবার এ কথা বলিয়া বিরক্ত করিও না। আমি তোমাকে কি কষ্ট দিতেছি?"

পদ্মা। নাথ! তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ না? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ; ইহা কি আমার কষ্টের সমূহ কারণ নহে?

নবকুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাহা আমি জানি না। তুমি কেন এখানে আমার অনুসরণ করিলে?"

পদ্মা। তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া থাক, এই স্থানটি আমাদের কথাবার্ত্তার সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনায় আমি অনেক অনুসন্ধানে অতি কষ্টে এখানে আসিয়াছি আমাকে আর কষ্ট দিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর নয়নোপান্তে অশ্রুবিন্দুর সমাবেশ হইল। যুবক তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমাকে আর আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি যবনী, তাহা কে না জানে?"

এই কথায় যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন। তিনি কাঁদিলেন; নবকুমার তাহা বুঝিতে পারিলেন। যুবতী অনেকক্ষণ পরে নয়ন-বারি নিবারণ করিয়া উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমি যবনী সত্য, কিন্তু আমি যবনী হই আর যাহাই হই, আমি তোমার পত্নী, তোমারই দাসী। রমণীর স্বামীই গতি, স্বামীই মুক্তি, স্বামীই পালক এবং স্বামীই শিক্ষক। নাথ! স্বামি-সহবাস যে স্ত্রীর সকল সুখের মূল, এ হতভাগিনী তো সে শিক্ষা পায় নাই? তোমার নিকট হইতে সে সকল ধর্ম্মনীতি শিক্ষা লাভ করিবার পূর্ব্বেই হত-বিধাতা আমাকে তোমার পবিত্র সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। আমার আর সে জ্ঞানলাভ হইল না। অজ্ঞান অবলার যত কিছু অপরাধ হওয়া সম্ভব, প্রাণেশ্বর! আমি যে সকল অপরাধেই অপরাধিনী। যদি সে সকল অজ্ঞানকৃত পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, তবে আমি তোমার চরণ-তলে জীবন ত্যাগ করিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিব। আমি এক্ষণে স্বামিসুখ জানিয়াছি; আর তাহা ত্যাগ করিব না। অজ্ঞান অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমি নানাবিধ পাপ-মার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু হৃদয়েশ! সহসা আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে; আমার চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে পুনরায় সরল অন্তঃকরণে পত্নীভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি কিয়ৎ-পরিমাণে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। জীবিতেশ! তোমার চরণ ভিন্ন আমার গতি নাই। আমি তোমার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া এ কলুষিত দেহ পবিত্র করিব।"

পদ্মাবতী এই বলিয়া পুনরায় নয়নাবৃত করিলেন। নবকুমার সমস্ত কথা শুনিলেন। তিনি বাক্‌রহিত হইয়া রহিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত মনোবেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া কহিলেন, "পদ্মাবতি! আমি নরাধম। আমি সংসারে যেরূপ পাপ করিয়াছি, কিছুতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আমি নিরপরাধা, সংসারবোধবিহীনা, সাধ্বী পত্নী মৃন্ময়ীর অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। সে দুঃখ আমার হৃদয় হইতে কখনই অপনীত হইবে না। এই অকিঞ্চিৎকর পাপ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই নিদারুণ শোকের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিবে। আমি অন্য সুখ প্রার্থনা করি না, মৃন্ময়ীরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণবায়ু এ নরকুলকলঙ্কের দেহাশ্রয় ত্যাগ করে, ইহাই আমার প্রার্থনা। মাতঃ গঙ্গে! তুমি ভবিষ্যৎজ্ঞান-বিহীনা নিরপরাধা মৃন্ময়ীকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ; এ হতভাগ্যকে আর কেন যন্ত্রণা দাও? আমাকেও চরণে স্থান দিয়া সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর মা!"

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধারাই প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "পদ্মাবতি! সংসার আমার এক্ষণে বিষ-স্বরূপ হইয়াছে। আর আমার কিছুতে স্পৃহা নাই। একমাত্র মৃন্ময়ী বিহনে আমার সংসার অন্ধকার ও আমার কায়-মন শূন্য হইয়াছে। পদ্মাবতি! তুমি আর অনর্থক আমার জন্য কষ্ট ভোগ করিও না। তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সেই অবস্থায় সুখে অবস্থান কর। কেন বৃথা আশার অনুসরণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছ? তুমি যবনী বলিয়া আমার তাদৃশ আপত্তি নাই, কিন্তু আমি আর সংসারী হইব না। আমি এইরূপেই জীবনপাত করিব, স্থির করিয়াছি। আমি আর কোন রমণীকে আমার ঘৃণিত জীবনের

সহচরী করিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। পদ্মাবতি! তুমি আমার সংসর্গে কেবল কষ্ট পাইবে, আমার আশা ত্যাগ কর।”

এই বাক্য শুনিতে শুনিতে পদ্মাবতীর মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “নাথ! তুমি আমাকে অন্যায় প্রবোধ দিতেছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তোমার সংসর্গে অসুখী হই, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি তোমারই, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না।”

নবকুমার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন, “পদ্মাবতি, অন্ধকার হইয়াছে, গৃহে যাও। এ বিষয়ের বিবেচনা পরে হইবে।”

এই বলিয়া স্বয়ং দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন। পদ্মা কহিলেন, “প্রাণেশ্বর! অধীনীর একটি কথা রাখ। কল্য একবার আমার আবাসে পদার্পণ করিও।”

নব। সে জন্য আমি এক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারি না।

এতক্ষণ উভয়ে বাহ্য-জ্ঞানবিরহিত হইয়া কথা-বার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন; সুতরাং বনভূমি যে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। সহসা উভয়ের চৈতন্য হইল।

পদ্মা কহিলেন, “নাথ! আমাকে ভুলিও না, এইমাত্র শ্রীচরণে প্রার্থনা।”

এই কথার পর উভয়েই আবাসোদ্দেশে অগ্রসর হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন বনমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃতনিশ্চিতে

“————— ————— —————jucky joys
And golden times, and happy news of price.”

Shakespear.

পূর্ব্বোল্লিখিত অরণ্য অতিক্রম করিলেই একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। এইটি নবকুমারের বাসগৃহ। গৃহটি অরণ্যসংলগ্ন। অন্তঃপুরের অঙ্গন অতি প্রশস্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। বেলা দ্বিপ্রহর-সময়ে সেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া দুইটি নারী কথোপকথন করিতেছেন। রমণীদ্বয়ের একটি রূপযৌবনসম্পন্না বঙ্গাঙ্গনা। তাঁহার পরিচ্ছদ-প্রণালী দেশীয়া রমণীর ন্যায়। দ্বিতীয়ার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাঁহাকে যবনী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক। যুবতী নবকুমারের ভগিনী; তাঁহার নাম শ্যামাসুন্দরী। দ্বিতীয়ার নাম পেষমন্—পদ্মাবতীর পরিচারিকা। শ্যামা জিজ্ঞাসিলেন, “পেষমন্! তুমি সত্য বলিতেছ? পদ্মাবতী সত্যই এখানে আছেন? তাহা তো এত দিন আমরা জানি না।”

পেষমন্ কহিল, “দিদিঠাকুরাণি! আমি তো সেই সংবাদ দিতেই আসিয়াছি। তিনি আজ সাত মাস এখানে আছেন।”

শ্যামা একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, “তাহা তো আমাকে কেহই বলে নাই! আহা! তাঁহাকে কত দিন দেখি নাই। পেষমন্, তিনি এখন কি তেমনই আছেন? তা তুমি বা জানিবে কেমন করিয়া? তাঁহার সঙ্গে দেখা হওয়ার কি কোন উপায় হয় না?”

পেষমন্ যে উদ্দেশে আসিয়াছিল, সহজেই তৎসিদ্ধির সূত্র দেখিল। সানন্দে কহিল, “আমি আপনাকে তাহাই জিজ্ঞাসিতে আসিয়াছি। তাঁহার বড় সাধ যে, আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তিনি এখানে আসেন। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট আপনার কথা বলেন আর কত দুঃখ করেন।”

শ্যামা আনন্দে সব ভুলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী যে যবনী হইয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার গৃহাগমনে যে লোকাপবাদ হইতে পারে, তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, “তিনি আসিবেন, ইহার আর আজ্ঞা কি পেষমন্? ইহা আবার জিজ্ঞাসা? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সে কার্য্য নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহাকে বলিবে, তিনি যখন সুবিধা বুঝিবেন, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখনই যেন আইসেন।”

পেষমন্ “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিল।

শ্যামাসুন্দরী গৃহপ্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় একটু স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখকান্তি

গম্ভীর হইল; পরক্ষণেই তাহা বিমর্ষভাবাপন্ন হইল; দেখিতে দেখিতে তাঁহার আয়ত ইন্দীবর-নয়নদ্বয় হইতে মুক্তা-ফলস্থূল অশ্রুবিন্দু সকল অজ্ঞাতসারে নিপতিত হইয়া ধরা সিক্ত করিতে লাগিল। শ্যামা তাঁহার ভ্রাতৃজায়া মৃন্ময়ীকে বড়ই ভালবাসিতেন; তিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। তিনিই আদর করিয়া তাঁহার মৃন্ময়ী নাম রাখেন; সুতরাং সেই প্রাণাধিকা মৃন্ময়ীর অকালমৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি শোক-সন্তপ্তা আছেন। অদ্যকার ঘটনার সকল কথা মনে পড়িল। এই ঘটনায় তাঁহার মৃণোর মুখ মনে পড়িল; তাঁহার জীবনান্ত-ঘটনা মনে পড়িল। তিনি সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। ক্রমে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এখন তাঁহার মুখ দেখ, এখন তথায় হর্ষের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে। এ কি। যুবতী শ্যামা কি উন্মাদিনী?—তাহা নহে। তাঁহার মানস-সরোবরে এখন আবার বিভিন্ন প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। এখন তাঁহার অগ্রজের প্রথমা স্ত্রীকে স্মরণ হইল। বিবাহের পর একবারমাত্র তিন মাসের জন্য পদ্মা শ্বশুরবাটী আসিয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃসন্ধি; তখন বয়স দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সে আজ কত দিনের কথা! তাহার পর তাঁহার জীবন কত পরিবর্ত্তন পরিগ্রহন করিয়াছে! পদ্মা এক্ষণে যৌবনের উদীচ্য-সীমায় অবতীর্ণ। পদ্মার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; সুতরাং পদ্মাও মুসলমানী হইয়াছেন। তদবধি আর পদ্মার সংবাদ লওয়া হয় নাই। পদ্মার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। সে কত দিনের কথা! এত কালের পর আবার পদ্মা এই দেশে। তিনি যাহাই কেন হউন না—শ্যামাসুন্দরীর ভ্রাতৃজায়া, সুতরাং তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী। এত দিনের পর আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা কি আনন্দের বিষয় নহে? শ্যামা এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিলেন, হৃদয়স্থিত আনন্দালোক তাঁহার বদনেও রশ্মি বিকীর্ণ করিল। তিনি টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। আনন্দের কাজই এই। আনন্দ বৃদ্ধকে যুবক এবং নিরানন্দ যুবককে বৃদ্ধ করিয়া তুলে। যুবতী শ্যামাও এক্ষণে আনন্দে বালিকা-ভাবাপন্ন। তিনি আপন মনে গা দুলাইতেছেন, হাত নাড়িতেছেন ও হাসিতেছেন। যাঁহাদের হৃদয় সময়ে সময়ে এরূপ আনন্দোন্মত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা বুঝিবেন, শ্যামাসুন্দরী প্রকৃত বাতুলের কর্ম্ম করিতেছেন না।

যখন পদ্মা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পদ্মা সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ননন্দা শ্যামা ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। বাল-সহচরী শ্যামা ও পদ্মাও হৃদয়মধ্যে সম্বন্ধ-বন্ধন ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র বন্ধন জন্মিয়াছিল, সে বন্ধন প্রণয়। পার্থক্য, ধর্ম্মান্তর, নিরুদ্দেশ প্রভৃতি কারণে সে বন্ধনটি কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। অদ্য সমস্ত কথা মনে হইল। দর্শন-লালসায় প্রণয়-রজ্জু আকৃষ্ট হইল। শিথিল বন্ধন দৃঢ়-সংলগ্ন হইয়া আসিল। তিনি কতক্ষণে সাক্ষাৎ-সময় সমাগত হইবে, প্রীতি-প্রফুল্ল মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামা এইরূপ আনন্দরসে পরিপ্লুতা রহিয়াছেন, এমন সময় তথায় নবকুমার প্রবেশ করিলেন। নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার আনন্দবেগ সংবর্দ্ধিত হইল। তিনি ভাবিলেন, দাদা পদ্মার এ দেশে আগমনবার্ত্তা কিছুই অবগত নহেন। তাঁহাকে এই সংবাদ দিই। আবার ভাবিলেন, না,—তাহা বলিয়া কাজ নাই। যদি দাদা আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমাদের সাক্ষাতের ব্যাঘাত জন্মিবে। আবার ভাবিলেন, ইহাতে দাদার কি ক্ষতি? ভাল, বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া বলিলেন, "দাদা! আমাদের বড়বউ এখানে আছেন।"

নবকুমার এ কথায় বিস্মিত না হইয়া কহিলেন, "শ্যামা! এ ত নূতন নহে।"

শ্যামা। তুমি তবে জান। আমরা কিন্তু তা এত দিন জানিতে পারি নাই, আজ জানিলাম।

নব। কে বলিল?

শ্যামা। তাঁহার দাসী।

নব। কেন?

শ্যামা। তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তাই জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আসিতে বলিয়া দিয়াছি।

নবকুমার কিছু বলিলেন না। এ মৌন সম্মতির লক্ষণ নহে, ইহা বিরক্তিব্যঞ্জক। তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে গমন করিলেন।

নবকুমারের মনের ভাব শ্যামা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং নবকুমারের মৌনভাব সম্মতিসূচক বিবেচনায় পরম আহ্লাদিত হইলেন। মৃন্ময়ীর গঙ্গাজলে নিপাতপ্রাপ্তির পর হইতে নবকুমার কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। শ্যামা এ ঘটনাতেও তাহাই মনে করিলেন। শ্যামার সিদ্ধান্ত কি অন্যায়?—কখন নহে। যাহাদের হৃদয়ে চাতুরী নাই, জগতে তাহারাই সুখী।

শ্যামা মনের সুখে গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিগত চিন্তনে

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল॥
সখি রে! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অতল জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥"

—জ্ঞানদাস।

সপ্তগ্রামের বাজারের প্রান্তভাগে সুপ্রশস্ত রাজ-মার্গপার্শ্বে একটি সুদৃশ্য দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। তাহারই উর্দ্ধতন একটি প্রকোষ্ঠে দুইটি রমণী উপবিষ্টা। উভয়েরই যাবনিক পরিচ্ছদ; তাঁহাদের গৃহসজ্জাও যাবনিক রুচির পরিচয় দিতেছে। পাঠকমহাশয় উভয় রমণীকেই অবগত আছেন। গঙ্গাতীরে নবকুমারের সন্নিহিতা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন, ঐ সুন্দরী সেই পদ্মাবতী। পদ্মা এক্ষণে তাঁহার অভ্যস্ত যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার বদন দিয়া তেজোগর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছে। রূপের সীমা নাই। তিনি এক্ষণে প্রসন্না। আনন্দ তাঁহার দেহের প্রত্যেক অংশে আধিপত্য করিতেছে। সে দিন যে মলিনা, কাতরা, ভূষণহীনা, রোরুদ্যমানা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে দেখুন, চিনিতে পারিবেন না! যুবতী পদ্মার শরীরে অলঙ্কার বড় শোভা পায়; এ জন্য তিনি অদ্য শরীরের যেখানে যাহা সাজে, সেখানে তাহাই পরিয়াছেন। পদ্মা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন ও সময়ে সময়ে ঘর্ম্ম দূর করিবার নিমিত্ত একখানি রুমালে মুখ মুছিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে কিঙ্করী পেষমন্ উপবিষ্টা।

পদ্মা সপ্তগ্রামে আসিয়া ঐ বাটীতে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আসার পর তাঁহার স্বামী নবকুমার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া দুই এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন; কিন্তু তাহাতে পদ্মার মনোরথ অণুমাত্রও পূর্ণ হয় নাই। পতি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী পদ্মাবতীকে পাঠক মহাশয়েরা পতিপার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়াছেন এবং সে মিলনে পদ্মাবতীর মনস্কামনা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত আছেন। পতির অপরিস্ফুট প্রণয়রত্ন উদ্ধারার্থে পদ্মা বিবিধ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্য তিনি আবার সেই উদ্দেশ্যসাধনোদ্দেশে নূতন কল পাতিয়াছেন। এই কল কিরূপ ফলোপধায়ক হয়, তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার লক্ষ্য এবার অব্যর্থ হইবে, এই বিবেচনায় পদ্মা অদ্য এত হৃষ্ট।

পেষমন্ অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সপ্তগ্রামে আর কত দিন থাকিবে? আগ্রার কথা সকল মনে করিয়া দেখ; তুমি সেখানে কি সুখে ছিলে! এখানে কি সুখে আছ?"

পদ্মাবতী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পেষমন্! জীবনের অবশিষ্ট কাল সপ্তগ্রামেই অতিবাহিত করিব। এখানে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে সুখসম্ভোগ করি, আগ্রার বাদশাহ-অন্তঃপুরে বিবিধ দাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া অগাধ সমৃদ্ধিমধ্যে তাহার এক কণিকাও লাভ করিতে পারি নাই। পেষমন্! ইন্দ্রিয় সুখভোগের যতদূর চরিতার্থতা সম্ভবে, আমার তাহা কিছুই বাকী নাই। পাপসাগরে যত দূর অবগাহন করিলে তাহার তল স্পর্শ করা যায়, আমি তত দূরই করিয়াছি। আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; এ পাপ হইতে আর নিস্তারের উপায় নাই। তুমি বুঝিতেছ না পেষমন্! আমার হৃদয়ে এককালে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে! অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। যাহা হইবার হইয়াছে, আমি এক্ষণে শান্তির কাঙ্গালিনী। অবিশ্রান্ত পাপে আমার মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ অসাড় হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। স্বামী কি পরম পদার্থ, তুমি জান না; আমিও এত দিন জানিতাম না। দরিদ্র পতির চরণসেবাও যে পৃথ্বীপতি বাদশাহের ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিবৃত্তির উপকরণমাত্র

হওয়ার অপেক্ষা কত ভাল, পেষমন্, তাহা আমি এত দিনে বুঝিয়াছি। অবলাকুলভূষণ সতীত্ব-রত্নকে পঙ্কিল হ্রদ-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভূলোক-দুর্লভ সম্পত্তি সুখসম্ভোগ করার অপেক্ষা উক্ত রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাঙ্গালিনীবেশে কুটীরে বাস করাও যে কত শ্রেয়ঃ, তাহা আমি এখন জানিতে পারিয়াছি। হায়! এত দিন সে জ্ঞান হয় নাই। মেদিনীপুরের সেই চটি মনে পড়ে পেষমন্? আহা, সেই দিন আমার জীবনের প্রধান দিন! মেদিনীপুরের সেই চটিতে সহসা এই পাপোন্মত্তার মনে জ্ঞানের রশ্মি ও পবিত্র সুখের রস প্রবেশ করিয়াছে। আর কি ইহা ছাড়া যায়? ইহার তুলনায় অন্য যাবতীয় সুখ অতীব হেয়। পেষমন্! তুমি কি না জান! আমি মনে করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ আমার করতলস্থ করিতে পারিতাম। এই সুখের লোভে আমি তাহা অকাতরে ত্যাগ করিয়াছি। রূপযৌবনসম্পন্ন জগদারাধ্য বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে আমি পদানত করিয়াছিলাম। এই সুখের আশায় আমি তাহা সন্তুষ্টচিত্তে ত্যাগ করিয়াছি। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, আর না, ও সকল কথা আর মনে করিও না। জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি এ সুখের আশা ত্যাগ করিব না, পেষমন্।"

পদ্মাবতী বিদুষী। বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। বাল্যাবস্থা হইতে কুসংসর্গ ও ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসা তাঁহার বিদ্যাজনিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এত দিনের পর সেই জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। আর তাহাকে কে আবরণ করে? পেষমন্ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত অবস্থান বশতঃ অনেক পুস্তকাদির আস্বাদন পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কখনই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। ভ্রমকূপে পতিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা এ সুখের আস্বাদ কি প্রকারে জানিবে? পেষমন্ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সহসা পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পেষমন্! ঠাকুরঝির সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় হয় নাই?"

পেষমন্ কহিল, "হইয়াছে—এখন যাওয়া যাউক।"

পদ্মা উঠিলেন। কি মনে হইল, একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পেষমন্! একখানি গাড়ী আন।"

পেষমন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। রূপসী পদ্মাবতী বিজাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালিনী সাজিলেন। পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, "পেষমন্! দেখ দেখি, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

পেষমন্ কহিল, "বাঙ্গালীর পোষাক কি ভাল দেখায়? ও ছাই দেখাচ্ছে।"

পদ্মা পেষমনের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি দর্পণসন্নিহিত হইয়া আপনার মুখ আপনিই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল। নিদারুণ চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক আশ্রয় করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "চল, সন্ধ্যা হইয়াছে।"

উভয়ে উঠিলেন। পেষমন্ কহিল, "জুতা পায়ে দিলে না, চলিতে পারিবে কেন?"

পদ্মা হাসিয়া বলিলেন, "আর সেকাল নাই পেষমন্! এখন সব পারিব।"

উভয়ে ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"রোগ-শোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"
—হিতোপদেশ

শ্যামা সন্ধ্যা-সময়ে ছাদের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে প্রীতিপ্রদ বাসন্তীয় বায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, দুইটি রমণী তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিল। অমনই তাঁহার পদ্মাবতীর কথা মনে পড়িল। অতি দ্রুত ছাদ হইতে নামিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই পদ্মাবতী উপস্থিত।

প্রথম দর্শনমাত্র উভয়েরই হৃদয় আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। আনন্দের আতিশয্য হেতু উভয়েই নীরব। কাহারও মুখে কথাটি নাই। নয়ন মনের অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। উভয়েরই চক্ষু দিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

রোদন শোকের চিহ্ন, এ কথা সকলেই বলেন, কিন্তু এ রোদন তাহা নহে। এ রোদন আনন্দব্যঞ্জক; এ রোদনের প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দুর মধ্যে আনন্দের লহরী-লীলা লক্ষিত হইতেছে; ইহার সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজমান।

ক্রমে মনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। উভয়ে উপবেশন করিলেন। শ্যামা মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতীর অতুল সৌন্দর্য্যের

কর্ণমাত্রেরও অপচয় হয় নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দেহায়তন বৰ্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র। দেহ সম্পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার অনুপম রূপরাশি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ আনন্দোল্লাস কমিয়া আসিল। তখন পদ্মার ভাবান্তর জন্মিল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে আনন্দরশ্মি অপনীত হইল। তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। এ রোদন আনন্দের রোদন নহে; ইহা হৃজ্জাত দুঃসহ যন্ত্রণার রোদন। পদ্মাবতী দীর্ঘকাল পরে তাঁহার স্বামিভবন পুনরায় দেখিলেন। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি বক্র না হইলে এই স্বামিভবনে তিনি সমাদরে থাকিতেন। তাঁহার গৌরবের সীমা থাকিত না। তাঁহার সহিত কথা কহিতে তাঁহার স্বামী, ননন্দা অথবা তৎসম্পর্কীয় অন্য কেহই সঙ্কুচিত হইতেন না। স্বামিসেবায় ও স্বধর্ম্মে থাকিলে তাঁহার অন্তরে যত সুখ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, সে সমস্ত অদ্য তাঁহার মনে পড়িল। সে সকল সুখের পরিবর্ত্তে তিনি যে সকল আপাতমনোহর সুখসম্ভোগ করিয়াছেন, তাহাও মনে উদিত হইল। উভয়ের তারতম্য তিনি অনেক দিন বুঝিয়াছিলেন—অদ্য এই উপলক্ষে আবার তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই যন্ত্রণা কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত করিবার নিমিত্ত পদ্মাবতী বস্ত্রাঞ্চল বদনে দিয়া অবনতমুখে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সে কত কথা তাহার সংখ্যা নাই। শ্যামা পদ্মার নিরুদ্দেশের পর স্বকীয় অগ্রজের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। পদ্মাবতীও দুই একটি স্থান ব্যতীত তাঁহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস বর্ণন করিলেন।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি এখানে এতদিন আছ, সে সংবাদটিও কি আমাদের দিতে নাই?"

পদ্মাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কি তোমাকে দেখিতে বা সংবাদ দিতে অনিচ্ছা, কিন্তু আমি কি আমার সে মুখ রাখিয়াছি? আমার মত দুর্ভাগা পৃথিবীতে দুটি নাই। পাছে আমার জন্য তোমরা লোকের কাছে গঞ্জনা খাও, এই ভয়ে এত দিন দেখা করি নাই; সংবাদও দিই নাই। কিন্তু এক স্থানে আর কত দিন এমন করিয়া থাকা যায়, তা বল? তাই ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, তোমাকে বলিয়া পাঠাই, তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই করিবে।"

শ্যামা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সংবাদ না দিবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। যদি তোমাদের কাছে সংবাদ দিলে তোমরা আমাকে উপেক্ষা কর, যদি তোমাদের কাছে আসিলে কথা না কও, যদি তোমরা আমার আগমনে লজ্জা পাও, এই সকল ভয়েই এতদিন সংবাদ দিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তার পর ভাবিলাম, আমার সংবাদ দেওয়ায় দোষ কি? যদি তাঁহারা ঘৃণা করেন, কথা না কন, তবে তো পাপীয়সীর সংখ্যাতীত পাপের সমুচিত শাস্তিই হইবে; আর ভাবিতাম কি জান, যদি তোমাদের কাছে গিয়া আগেকার মত আদর না পাইলাম, যদি স্বামিগৃহে স্বামীর সঙ্গে কথাটিও কহিতে না পাইলাম, যদি তথায় আমাকে অস্পৃশ্যরূপে থাকিতে হইল, তবে তথায় যাওয়ার ফল কি? এক্ষণে মনে মনে স্থির করিয়াছি, এ পাপ প্রাণ আর রাখিব না। জীবনের যে সুখ, তা সব দেখিলাম। স্বামীর চরণসেবা ভিন্ন রমণীর আর কোন সুখ নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। যখন আশায় ছাই পড়িয়াছে, তখন আর বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? ভাবিলাম, মরিবার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া মরিব। তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমাকে একবার দেখিব বলিয়া বড় সাধ ছিল, আজ তাহা সফল হইল। এখন আমার মরিবার আর বাধা নাই। আমার একটি ইচ্ছা আছে—মরিবার পূর্ব্বে একবার স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিব। কিন্তু সে আশা দুরাশা—"

যাহা বলিতেন, তাহা বলিতে পারিলেন না। পদ্মার হৃদয়ভেদী কথা সকল শুনিতে শুনিতে শ্যামার নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে; অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে বড় বউ। সে জন্য আর অনুতাপ করিও না। মরিতেই বা যাইবে কেন? মরিলেই কি পাপমুক্ত হইবে? আত্মহত্যা তো আরও পাপের কার্য্য। বিধাতা তোমার জন্য যেমন মতি দিয়াছেন, তেমনই কার্য্য করিয়াছ। তাহাতে যে পাপ হইবার হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহা তো আর ঘুচিবে না। তবে কেন জীবন ত্যাগ করিবে? যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাল যায়, আর পাপস্পর্শ না হয়, তাহাই কর; আমার

ইচ্ছা যে, তুমি এক্ষণে যেমন সপ্তগ্রামে আছ, তেমনই থাক, আর আগ্রায় বা স্থানান্তরে যাইও না ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, এক একবার দেখা সাক্ষাৎ করিয়াও তো মন জুড়াইতে পারা যাইবে।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি! অগত্যা তাহাই করিব বই আর কি? ইহার অপেক্ষা ভাল আমার অদৃষ্ট আর কি হইতে পারে?"

ইত্যবসরে পেষমন্ নিবেদন করিল, "রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

পদ্মা এই কথা শুনিয়া শ্যামার প্রতি নেত্রপাত করিলেন। শ্যামা কহিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তোমাকে যে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।"

পদ্মা। তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। সপ্তগ্রাম আর ছাড়িব না। এখন হইতে প্রত্যহই দেখা করিব। দেখিতে দেখিতে জীবন কাটাইব।

পদ্মা নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্যামা অগত্যা সম্মত হইলেন।

পেষমন্ ভিন্ন পদ্মার সঙ্গে আর কোন পরিচারিকা আইসে নাই। এ জন্য শ্যামা তাঁহার একজন দাসীকে সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

পদ্মা মনে করিলে দাস, দাসী, বাহক, যানাদি সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতেন; কিন্তু সে সকল বাহ্যাড়ম্বরে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি এক্ষণে আপনাকে সামান্য গৃহস্থ-পত্নী মনে করিয়া তদুপযোগী থাকিতে অভ্যাস করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দশটা, পূর্ণকৌমুদীময়ী; প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। এইরূপ সময়ে পদ্মাবতী স্বামিভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ শ্যামা একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে শ্যামা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তর্ক-বিতর্ক

"Je la pains, je la blame, et je suis son appui *—Voltaire,

সপ্তগ্রামে পণ্য-বীথিকার অনতিদূরে একটি প্রশস্ত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। প্রান্তর কেবলমাত্র শ্যামল-তৃণাবৃত। মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃহৎ তিন্তিড়ী, অশ্বথ ও বটবৃক্ষ। এই প্রান্তরের এক সীমায় দুইটি যুবা পরিভ্রমণ করিতেছেন। যুবকদ্বয়ের একটি আমাদের পরিচিত—নবকুমার; অপর নবকুমারের পরমাত্মীয়—উমাপতি চক্রবর্ত্তী। নবকুমার বিপদ্ সম্পদ্ সকল সময়েই উমাপতির পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। উমাপতির সহিত তাঁহার প্রণয় দুশ্ছেদ্য। উভয়েরই স্বভাব একরূপ, উভয়েই একবিধ গুণের পক্ষপাতী, উভয়েই সরল, উভয়েই বিবিধ গুণসম্পন্ন ও বিদ্বান্; সুতরাং তাঁদের প্রণয় যে দৃঢ় হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? উমাপতির নিবাস সপ্তগ্রাম। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। এইজন্য পিতার অভাবেও তাঁহার শিক্ষার ব্যাঘাত হয় নাই। উমাপতির বয়স অন্যূন পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। এই অল্পবয়সে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। নবকুমারের সহিত তাঁহার পঠদ্দশার মিত্রতা।

উমাপতি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সুন্দর বদন-শোভা আয়ত লোচন, চম্পকবর্ণ এবং সুললিত ও পরিণত দেহ মনোহর সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক।

নবকুমারের সাগর-যাত্রীর নৌকা হইতে বালিয়াড়ির চরে অবস্থিতি—তথায় কাপালিক-সংমিলন—কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক জীবনোদ্ধার—কপালকুণ্ডলার সহিত বিবাহ ও সস্ত্রীক দেশে আগমনসময়ে চটিতে অপরিচিতা লুৎফ-উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ, লুৎফ-উন্নিসার সপ্তগ্রামে আগমন ও তাঁহার নবকুমারের সহিত আত্মসম্বন্ধ প্রকাশ—কাপালিকের আগমন ও তাহার প্ররোচনায় এবং পদ্মাবতীর কৌশলে কপালকুণ্ডলার চরিত্রবিষয়ে নবকুমারের সন্দেহ—সে সন্দেহভঞ্জন হইবামাত্র সহসা জাহ্নবীগর্ভে পতিত হইয়া কপালকুণ্ডলার অকালমৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত কথাই উমাপতি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি নবকুমারের অবস্থা চিন্তা করিয়া অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। নবকুমারের শোকবিকল চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা বিস্তর প্রবোধ দিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রবোধ সমস্তই ব্যর্থ হইত। নবকুমারের হৃদয় মৃন্ময়ীর সহিত গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, শূন্য দেহ অবশিষ্ট

* I pity her. I blame her. and am her support

আছে মাত্র। তাহাতে উপদেশ-বীজ বপন করিলে অঙ্কুরের প্রত্যাশা বৃথা। এ কথা উমাপতি বুঝিতেন; তথাপি দীর্ঘকাল প্রবোধ দিলে যদি উপকার সম্ভবে, এই বিবেচনায় তিনি কখনই উপদেশ দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য তিনি নবকুমারকে সবিশেষ অনুরোধ ও যুক্তি প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সকল প্রযত্নই বিফল হইয়াছে।

গঙ্গাতীরে পদ্মাবতীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার বিবরণ নবকুমার অদ্য উমাপতিকে বলিলেন। তথায় তাঁহাদের উভয়ের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে যথাযথ জানাইলেন। পদ্মাবতীর আগমন ও তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন এবং পদ্মাবতীর সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রভৃতি যে সমস্ত কথা নবকুমারকে শ্যামা বিদিত করিয়াছিলেন, নবকুমার সে সকলও প্রিয়-বয়স্যকে জানাইলেন। উমাপতি অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন, "ভাই নবকুমার! পদ্মাবতীর মনের ভাব বুঝিতেছ কি? পদ্মাবতী পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অসতী থাকিলেও তাঁহার মন যে এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

নবকুমার বলিলেন, "আমার মনেও অবিকল ঐ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পদ্মার এক্ষণে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গত কার্য্য-সকলের নিমিত্ত তাহার যথেষ্ট অনুতাপ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বকৃত পাপকার্য্যসমূহের জঘন্যতা অনুভব করিয়াছে; পদ্মা এক্ষণে ধর্ম্মের কাঙালিনী—পতিপদভিখারিণী; এই জন্য সে আগ্রার রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে দয়া হয় সত্য, কিন্তু একটি কারণে পদ্মা আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। পদ্মাই তো মৃন্ময়ীর অকালমৃত্যুর কারণ। সে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া মৃন্ময়ীর সতীত্বপক্ষে ভ্রমপূর্ণ সন্দেহ সমুৎপাদন করিয়া দিল। সে যদি সেরূপ না করিত, তাহা হইলে এ সকল দুর্ঘটনা কিছুই ঘটিত না। সেই তো কাপালিকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই অশুভ ঘটাইল। ভ্রাতঃ, তুমি তো সকলই জান। আমার হৃদয়ে সে ঘটনাটি শেলস্বরূপে বিদ্ধ রহিয়াছে।"

উমাপতি কহিলেন, "নবকুমার! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। পদ্মাবতী সে বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে অপরাধিনী, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি—কাহার অপরাধ অধিক? তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াই সে দুর্ঘটনার প্রধানতম কারণ নয় কি? কাপালিক-প্রদত্ত তীব্র সুরা-সেবনে তুমি অজ্ঞানান্ধ হইলে; তোমার হিতাহিত-বিবেচনা রহিত হইয়া গেল, কাপালিককে তুমি ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিতে লাগিলে; তাহার কথা তোমার বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল; সে তোমাকে যাহা বলিল, তুমি তাহাই শুনিলে। সে বলিল, 'মৃন্ময়ী দুশ্চরিত্রা,—ঐ ব্রাহ্মণ তাহার প্রণয়ী।' তুমি তাহাই বিশ্বাস করিলে। সে বলিল, 'মৃন্ময়ীকে আর তুমি গৃহে লইও না।' তুমি তাহাতেই সম্মত হইলে। ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, কাহার অপরাধ অধিক? কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী, এতদুভয়ের অধিক দোষী কে? তুমি একটি কথাও মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে না। মৃন্ময়ীর দোষ সত্য কি না, জানিলে না। যখন জিজ্ঞাসা করিলে ও যখন তোমার সন্দেহ তিরোহিত হইল, তখন বিধাতা মৃন্ময়ীকে আজন্ম-ক্লেশ, দারুণ অপবাদ প্রভৃতি হইতে নিস্তার করিবার নিমিত্ত সাদরে স্বক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। মৃন্ময়ী বিধিবিপাকে গঙ্গাজলে নিপতিতা হইলেন। কাপালিক-প্রদত্ত সুরার তেজ তখন তোমাকে কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিয়াছিল, তোমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি 'হা মৃন্ময়ী' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে। কিন্তু অকালে জাগরূক হওয়ার যে ফলোদয় সম্ভাবিত, তোমার তাহাই হইল। তুমি আর মৃন্ময়ীকে পাইলে না। স্রোতস্বিনীর গভীর গর্ভনিপতিতা অবলাকে উদ্ধার করা কি কখন সম্ভব? কাপালিক যত্ন করিয়া তোমাকে জল হইতে উত্তোলন করিল। তুমি তখন মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ী! শব্দে রোদন করিতে লাগিলে। সে রোদনের ফল কি? বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, মৃন্ময়ীর শোচনীয় মৃত্যুসম্বন্ধে পদ্মাবতীর অপরাধ কত অল্প। পদ্মাবতী পুনরায় স্বামী লাভ করিবার পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—সে পথের প্রধান কণ্টক মৃন্ময়ী। কোনরূপে মৃন্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বঞ্চিতা করিতে পারিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই সময়ে সে দেখিল, মৃন্ময়ী আরও এক ব্যাধের লক্ষ্য। সে ব্যক্তি কাপালিক। পদ্মা তাহার সহিত যোগ দিল। পদ্মা ঘোরতর দুশ্চরিত্রা বটে, তথাপি তাহার মন অবলার মন। এককালে মৃন্ময়ীর জীবনহানি

করা তাহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। মৃন্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বিমুক্তা করাই তাহার উদ্দেশ্য; ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কেমন, তোমার কি ইহা বোধ হয় না?"

নবকুমার সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। কথাগুলিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার অন্তর্হিত হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "উমাপতি! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই বটে। এ বিষয়ে পদ্মার দোষ অতি অল্প; এমন কি, নাই বলিলেও হয়। আমি তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছিলাম। আমিই পাপী—পদ্মা নহে। পদ্মা আপনার উদ্দেশ্যসাধনে চেষ্টা করিয়াছিল—সংসারে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে কে না চেষ্টা করে? আমার পাপ অতি গুরুতর; কি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? আমার যে নরকেও স্থান হইবে না।"

উমাপতি দেখিলেন, নবকুমারের অত্যন্ত শোক উপস্থিত; এ জন্য তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে না দিয়া কহিলেন, "নবকুমার! পদ্মাবতী প্রকৃত অপরাধিনী নহে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ। বিধাতা এক্ষণে তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছেন। তাহার অন্তরে বিষধর ভুজঙ্গম সকল দংশন করিতেছে; যন্ত্রণার সীমা নাই। তাহার ইহজন্মে যে কিছু শান্তি, তুমিই তাহার একমাত্র উপায়। পতিলাভ লালসাই তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা; অতএব তাহার অবস্থা একটু বিবেচনা করা উচিত। যদি কোন উপায়ে তাহার বিপুল ক্লেশ-ভারের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে পার, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?"

নবকুমার উত্তর করিলেন, "ভাই উমাপতি! আমি তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু তৎপ্রতীকারের কোন উপায়ই দেখিতেছি না। আমি তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি; তুমিও না হয় তাহার সে সকল কার্য্য বিস্মৃত হইলে; কিন্তু লোকে তাহাকে ক্ষমা করিবে কেন? সে যবনী, ম্লেচ্ছা, আচারভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, তাহাকে অন্যে ক্ষমা করিবে কেন? তুমি কাহার মুখে হাত দিবে? পদ্মাবতীর জন্য আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং জাতীয় সমাজ ত্যাগ করা কি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?"

উমাপতি কহিলেন, "তাহা বটে! কিন্তু শ্যামার পরামর্শ মন্দ নয়। তুমি পদ্মাবতীকে পত্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করিলে এবং তোমাকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইলেই পদ্মাবতী চরিতার্থ হইবে। কেমন, এই কি তাহার চরম আশা বলিয়া বোধ হয় না? যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে শ্যামার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে। পদ্মাবতী এখন যেমন স্বতন্ত্র বাটীতে রহিয়াছেন, তেমনই থাকুন।"

নবকুমার অনেকক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহা করিলেই চলিবে। আপাততঃ বেলা অধিক হইল, চল, গৃহাভিমুখে যাওয়া যাউক।"

এই বলিয়া উভয়ে ঐ সম্বন্ধে বিবিধ কথাবার্ত্তার আন্দোলন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সিদ্ধ-সঙ্কল্পে

"Live while ye may yet happy pair;
Enjoy short pleasures for long woes are to succeed."

—Milton.

সম্মুখে যে সুন্দর সৌধটি দেখা যাইতেছে, পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, উহাই পদ্মাবতীর আবাস। ইহারই একতম প্রকোষ্ঠে এক্ষণে একটি যুবক একখানি পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; একটি সুন্দরী যুবতী যুবকের পদদ্বয়ে স্বীয় বদনকমল রক্ষা করিয়া নয়ন-জলে তাহা সিক্ত করিতেছেন। যুবক ও যুবতী নবকুমার ও পদ্মাবতী, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

নবকুমার পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। পদ্মার রোদন তখনও থামে নাই। পদ্মা করপল্লবে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃণালবিনিন্দিত বাহুবল্লী বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। নবকুমার বলিলেন, "পদ্মা! বৃথা রোদনে প্রয়োজন কি? সময় অতীত হইলে বিবেচনা অনর্থক। এক্ষণে উপস্থিতমত সদুপায়

চিন্তা কর। যাহাতে পরিণামে সুখে অতিবাহিত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা কর।"

পদ্মা রোদন সংবরণ করিয়া কহিলেন, "নাথ! উপায় অনুপায় সমস্তই তোমার হাত। দাসীর জীবন তোমারই পদতলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় রাখ, না হয় মার। তাহাতে আর আমার দুঃখ নাই। আশা ছিল, এ পাপ-জীবনে এক দিন পতি-পদ চুম্বন করিয়া সুখী হইব, অদ্য তাহা সফল হইয়াছে। আর জীবনের মায়া নাই। আর মৃত্যুতে কাতরা নই। এখন মৃত্যু হইলে অপেক্ষাকৃত সুখে মরিতে পারিব। যদি বল, তবে কাঁদিতেছ কেন? তাহার উত্তর এই ;—নাথ, অদ্য তোমার চরণতলে স্থান পাইয়া আমি যে পরিমাণে সুখ লাভ করিলাম, সমস্ত জীবনমধ্যে এক দিনও সেরূপ সুখসম্ভোগে সমর্থ হই নাই। আপাততঃ যাহা সর্ব্বসুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, আমি সেই সুখের অনুসরণে ক্রমেই অধিকতর পাপ-পঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, পতি-পদে স্থানপ্রাপ্তা সতীর সুখের তুলনায় সে সুখ কি ঘৃণিত! কি অকিঞ্চিৎকর! জীবিতেশ! আমি সেই ঘৃণিত সুখের লালসায় জীবনের প্রথম সময় অতিবাহিত করিয়াছি। তাহাতে ইহলোক-পরলোক উভয়ত্রই সুখের আশা তিরোহিত হইয়াছে। নাথ! আমি তাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি। আমি এত দিন এ পাপ-জীবন কোন্ কালে ত্যাগ করিতাম। যে আশায় এত দিন তাহা করি নাই, তাহা অদ্য সফল হইল। আমার অপর আশা নাই। আমি অদ্য তোমার নিকট যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট, ততোধিক অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পদ্মা আর বলিতে পারিলেন না। আহ্লাদে, শোকে, ক্ষোভে, মনস্তাপে ও অনুতাপে তাঁহার মনে এক অভিনব অসহনীয় ভাবঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক কালে এত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে প্রভুত্ব করিতে লাগিল যে, তাহাদের প্রকোপ সহ্য করা নিতান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরও অসাধ্য। সামান্য-রমণী তাহা কি প্রকারে সহ্য করিবে? পদ্মাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পদ্মাবতীর চৈতন্যহীন জড়দেহ নবকুমারের পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। নবকুমার পদ্মাবতীকে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন; দেখিলেন, পদ্মাবতী চেতনাশূন্য। সহসা এবম্বিধ বিপৎসমাগম দর্শনে নবকুমার ব্যস্ত হইয়া দাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ জল ও তালবৃন্তাদি আনয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার স্বয়ং যথাসাধ্য যত্নে পদ্মার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পদ্মার চৈতন্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। নবকুমারের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, ক্রমে গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবকুমারের বদন প্রফুল্ল হইল। ক্রমে পদ্মার চৈতন্য হইতে লাগিল, তাঁহার শিরা সকলে রক্তের গতি দেখা গেল, গণ্ড আরক্ত হইল, ক্রমে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। নবকুমার পদ্মাবতীকে পুনরায় সচেতন দেখিয়া আনন্দে পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইলেন। পদ্মাবতীর উপর যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তোমার সহস্র অপরাধ থাকিলেও আমি ক্ষমা করিলাম। প্রিয়ে! তুমি রমণীরত্ন! তোমাকে আমি বিস্তর ক্লেশ দিয়াছি। সংসার যায়, যাউক; লোকসমাজে অপমানিত হই, হইব; অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক; অদ্য প্রকাশ্যে বলিতেছি—পদ্মাবতি! তুমি আমার পত্নী। তোমাকে আর কষ্ট দিব না।"

পদ্মাবতী ভীরবেগে উঠিয়া দাসীগণকে অপসৃত হইতে আজ্ঞা করিলেন এবং স্বীয় সুগোল নবনীতনিভ ভুজযুগল দ্বারা নবকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বক্ষোমধ্যে মস্তক বিন্যস্ত করত কহিলেন, "নাথ! এ অভাগিনীর কপালে এত সুখ আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আমি স্বর্গে না সংসারে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, মায়ার মোহিনী ক্ষমতা কি আমার চক্ষুকে আবরণ করিয়াছে?"

অপরাধ করিয়া অপরাধী যদি সরলতা সহকারে স্বীকার না করে এবং তজ্জন্য লজ্জিত হইয়া বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সংসারে তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকে না। এক জনের দোষ দেখিলে, ক্ষতিবৃদ্ধি হউক বা না হউক, সকলেই তাহার উপর কুপিত ও বিরক্ত হয় সত্য, কিন্তু দোষী

ব্যক্তি যদি ব্যক্তিসাধারণকৃত ঘৃণা ও অপমানাদি সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, যদি পুনরায় স্বীয় সততার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে এবং যদি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে কুপিত ও বিরক্ত ব্যক্তিরাও দয়া করে। লোকে আর তাহাকে ঘৃণা করে না। তাহার অপরাধ ক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায়, তাহার গুণে কলঙ্ক ঢাকা পড়ে।

পদ্মাবতীর ঘটনাই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করাও নবকুমার দারুণ লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। তিনি তাহাকে ঘৃণা করিতেন, কখন তাহার সহিত সম্পর্ক ছিল, ইহা মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পদ্মার একান্ত পতিপদচিন্তা, পূর্ব্বকৃত পাপসমূহের নিমিত্ত বিলক্ষণ অনুতাপ, সতীধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমস্ত ভোগসুখত্যাগ প্রভৃতি দর্শনে নবকুমারের চিত্ত ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল; তাহার প্রতি দয়া জন্মিল। পদ্মাবতী যে নবকুমারকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রেমের বিনিময়ে প্রেম আবশ্যক। পদ্মাবতী যদি নবকুমারকে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে নবকুমার অবশ্যই তাহার বিনিময়ে করিতেন। কৈ, তাহা ত তিনি করেন নাই! —অবশ্যই নবকুমার তাহা বিনিময় করিয়াছিলেন; কিন্তু সেটি প্রকারান্তরে; তাঁহার অন্তরে অন্তরে পদ্মার প্রতি যে ঘৃণা, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা প্রণয়েরই রূপান্তর মাত্র। প্রণয়ই উহার বীজ। তাহার সহিত মনুষ্যের কোন সংস্রব নাই, তাহার দোষগুণে কে আস্থা করে? নবকুমারের প্রণয় তাঁহার প্রাণেই ছিল, অন্যে জানিতে পারে নাই।

প্রণয়ী স্বয়ং সকল সময়ে প্রণয়াস্পদের প্রতি তাঁহার প্রণয়ের পরিমাণ বুঝিতে পারে না। দিন দিন তিল তিল করিয়া প্রণয় বর্দ্ধিত হয়। প্রণয়ী প্রথমে এইমাত্র বুঝিতে পারে যে, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসার পরিমাণ কি, তাহা তিনি তখন জানিতে পারেন না। যদি সহসা প্রণয়াস্পদের সহিত বিরহ হয়, যদি সহসা তাহার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখনই হৃদয় শোকাকুল হইয়া তাহার প্রতি প্রণয়ের পরিমাণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই নিয়ম অনুসারে পদ্মাবতীকে নবকুমার কি পরিমাণে ভালবাসিতেন, পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারেন নাই। অদ্য পদ্মাবতীর পীড়ায় তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

যে নবকুমার কিছু দিন পূর্ব্বে পদ্মাবতীকে যতদূর সম্ভব ঘৃণা করিতেন, ক্রমে পরিবর্ত্ত-বিলাসী কাল তাঁহারই হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিল। তিনি ক্রমে ঘৃণা করুণায় এবং অশ্রদ্ধা শ্রদ্ধায় পরিণত করিলেন; ক্রমে তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। আবার এখন সেই নবকুমার সেই পদ্মাবতীর জন্য কাঁদিতেছেন; তাহার জন্য আত্মীয়, সমাজ, জাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন; তাহাকে সানন্দে আলিঙ্গন করিতেছেন। কাল, তুমিই ধন্য!

কপালকুণ্ডলা (মৃন্ময়ী), এই সময় কোথায় তুমি? অতলজলে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ,—দেখিতেছ না! এক দিন কাপালিকের ভয়ানক খড়্গামুখ হইতে যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি একবার তোমাকে মন দিয়া আবার কাড়িয়া লইয়া অপরকে অবাধে তাহা দান করিতেছে। সত্যই কি নবকুমার পদ্মাবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে বিস্মৃত হইলেন?—না, তাহা নহে। পূর্ণচন্দ্র-বিরাজিত নভোমণ্ডলে সহসা একখানি মেঘ উদিত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বসংসারকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংসার কি তাই বলিয়া চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে? তাহা থাকে না। যতক্ষণ মেঘ থাকে, সংসার ততক্ষণ অন্ধকার থাকে; মেঘও সরিয়া যায়, আবার সংসারে দিব্য আলোকও প্রকাশ পায়; আবার চন্দ্র ও তারাগণ কিরণ বর্ষণ করে। যতক্ষণ মেঘ থাকে, ততক্ষণই কি চন্দ্র-তারার কার্য্য বন্ধ থাকে? তাহাও থাকে না। তাহারা অদৃশ্য থাকে মাত্র। নবকুমারের হৃদয়াকাশের অবস্থাও সেইরূপ। তথায় মৃন্ময়ীর প্রণয়-চন্দ্রিকা পূর্ণদীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল; সহসা পদ্মাবতীর প্রণয় মেঘস্বরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আবরণ করিল। যতক্ষণ ইহা থাকিবে, ততক্ষণ তাহা আবরিত থাকিবে মাত্র, তাহার কার্য্য বন্ধ হইবে না। তাহা মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্যভাবে স্বীয় কার্য্যসাধন করিবে।

নবকুমার ও পদ্মাবতী বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া ভাবসাগরে ভাসিতেছেন, এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা তাঁহাদের আনন্দের বাধা জন্মাইল। নবকুমার শুনিতে পাইলেন, প্রকোষ্ঠান্তর হইতে উমাপতি তাঁহাকে ডাকিতেছেন। কথা কর্ণে

প্রবেশমাত্র পদ্মাবতী ব্যস্ততাসহকারে নবকুমারের গলদেশ হইতে হস্ত গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে পেষমন্ আসিয়া বলিল, "বিশেষ প্রয়োজনের জন্য একটি লোক আপনাকে ডাকিতেছেন।"

নবকুমার অগত্যা ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং পদ্মাবতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পদ্মাবতী অন্য উপায়াভাবে অনিচ্ছায় বিদায় দিলেন এবং কহিলেন, "নাথ! দাসীকে ভুলিও না। ইহাই শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

নবকুমার পদ্মাবতীকে বুঝাইয়া এবং অবিলম্বে আহ্বানের কারণ জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পদ্মাবতীর সুখ-সূর্য্য উদিত হইতে না হইতেই অকালজলদজালে আচ্ছন্ন হইল। তিনি অতিকষ্টে মালা রচিত করিয়া গলদেশে ধারণ করিবেন, এমন সময় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি বিপুল পরিশ্রমে যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মক্ষম হইবার সময়েই অভিনব বাধা সমুৎপন্ন হওয়ায় তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নব বিপদে

"——————deep troubles toss
Loud sorrows howl, envenom'd passions bite
Ravenous calamites our vitals seize,
And threatening fate wide opens to devour"—
—Young.

নবকুমার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তথায় উমাপতি নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। নবকুমার ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন। তথায় উমাপতিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষভাবাপন্ন দেখিয়া নবকুমার সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! কি হইয়াছে? আমাকে কেন ডাকিতে গিয়াছিলে? তুমি বিমর্ষ কেন?"

উমাপতি কহিলেন, "তোমাকে ডাকিয়াছি—কারণ আছে। বলিতেছি, চল।"

উভয়ে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলে উমাপতি কহিলেন, "ক্ষণপূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তোমার ভগ্নীপতি মথুরানাথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্র এই রহিয়াছে, দেখিলেই জানিতে পারিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের নিমিত্ত তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া উমাপতি নবকুমারের হস্তে একখানি পত্র দিলেন। নবকুমার তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন :—

"শ্রীচরণেষু—

প্রণামান্তে নিবেদনমেতৎ,

সম্প্রতি আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়াছি। এ ব্যাধির সময়ে আপনাকে ও আপনার ভগ্নীকে দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে পত্রপাঠমাত্র আপনারা উভয়ে আসিয়া একবার দেখা দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। আর কি বলিব? অতি কষ্টে লিপি সমাধা করিলাম; ইতি তারিখ ২৭শে চৈত্র।"

পত্র পড়িয়া নবকুমারের চক্ষুতে জল থামিল না। যখন পত্র অধীত হয়, তখন শ্যামা অন্তরাল হইতে সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে কাঁদিতেছেন না। তাঁহার অন্তরের এখন যে অবস্থা, সে অবস্থায় রোদন আইসে না; যখন অসহ্য মানসিক ক্লেশ ঈষৎ শিথিল হয়, তখনই রোদনের সময়। শ্যামার হৃদয়ে এখন যে যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা কাঁদাইবার নহে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমে উমাপতির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি একবার কাঁদিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চক্ষু এক্ষণে জবাকুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

উমাপতি কহিলেন, "ভাই, কাতর হইও না। স্থির হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "যাওয়া স্থির করিতে হইতেছে।"

উমা। আমি বলি, অদ্য আহারাদির পরই তোমরা নবদ্বীপে যাত্রা কর।

নব। হাঁ, সেই ভাল। এক্ষণে নৌকা স্থির করা আবশ্যক।

উমা। আমি নৌকা স্থির করিয়া আসিতেছি, তোমরা অবিলম্বে আহারাদি শেষ করিয়া লও।

উমাপতি প্রস্থান করিলেন। নবকুমার ও শ্যামা সত্বর প্রস্তুত হইলেন। অনতিবিলম্বে উমাপতি নৌকা স্থির করিয়া আসিলেন। নবকুমার ও শ্যামা

যাত্রা করিলেন। উমাপতি নৌকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। উমাপতি কহিলেন, "নবকুমার! শীঘ্র সংবাদ পাই যেন।"

"তাহা পাইবে।" এই বলিয়া নবকুমার উমাপতির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কানে কানে কহিলেন, "যদি পার, তবে পদ্মাবতীকে এ সংবাদটি দিও।"

উমাপতি স্বীকার করিলেন। নবকুমার, শ্যামা, এক জন চাকর, নবদ্বীপ হইতে আগত ব্যক্তি এবং এক জন দাসী নৌকায় উঠিলেন; নৌকা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিল।

আমরা এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে শ্যামা-সুন্দরীর শ্বশুরালয় সম্বন্ধীয় দুই একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্যামার যখন নয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মথুরানাথ তৎকালে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক মাত্র। মথুরানাথের পিতা অত্যন্ত কুলাভিমানী। তিনি শ্যামার সহিত বিবাহের পর মথুরানাথের ক্রমান্বয়ে আবার দুইটি বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্যামা সম্পন্ন লোকের দুহিতা, তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হইবে না, এ কথা মথুরানাথের পিতা জানিতেন; সুতরাং তিনি শ্যামাকে স্বগৃহে আনেন নাই। মধ্যে মধ্যে মথুরানাথ সপ্তগ্রামে শ্বশুরগৃহে আসিতেন। মথুরানাথের অপর দুই পত্নী তাঁহার গৃহেই থাকিতেন। এই দুই রমণীর স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবাপন্ন ছিল, তাহাতে আবার সপত্নী সম্পর্ক, সুতরাং তাঁহারা যে সর্ব্বদা কলহবিদ্বেষে কালযাপন করিতেন, তাহা বলা বাহুল্য; প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মথুরানাথের মধ্যমা স্ত্রী পরলোকগতা হইয়া সপত্নী-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছেন। মথুরানাথের তৃতীয়া স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী দেখিতে অতি সুন্দরী। এক্ষণে তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ হইবে। তাঁহার অনেকগুলি গুণ ছিল। কিন্তু যে সকল গুণে শ্যামার অন্তর শোভিত ছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় কুমুদিনীর গুণ সকল নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে। মথুরানাথ শ্যামার সৌন্দর্য্য কখন বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাদৃশ ধনী ছিলেন না এবং পিতার অমতেও কখন কোন কর্ম্ম করিতেন না; এ জন্য তিনি সর্ব্বদা শ্যামাকে দেখিতে পাইতেন না। যে বৎসর তাঁহার মধ্যমা স্ত্রীর বিয়োগ হয়, সেই বৎসরেই তাঁহার পিতা গঙ্গালাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরেই মথুরানাথের এমন কতকগুলি বিপৎপাত হয় যে, তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত শ্যামার দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি রুগ্ন-শয্যায় পতিত হইয়া তিনি শ্যামাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

এতদ্ভিন্ন মথুরানাথের সংসারে তাঁহার বিধবা মাতা ছিলেন। তিনি একবার মাত্র প্রথমা পুত্রবধূ শ্যামাকে দেখিয়াছিলেন; তখন শ্যামা বালিকা। নবকুমার সময়ে সময়ে দুই একবার নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। মথুরানাথের মাতা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মথুরানাথ স্বয়ং অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বিদ্যার সুমিষ্ট আস্বাদ বিশেষরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সুরসিক ছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজন বনে

"————————————হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিন-মুখী, শরতের শশী
রাহুর তরাসে যেন। সে বিরলে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা; ঝর ঝর ঝরি,
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি।"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যে সময়ের ঘটনা-সকল এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে সে গ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে গোপালপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটিতে অত্যন্ত বন। তথায় লোকের বাস অতি অল্প। পথ-ঘাট ভাল নয়। গোপালপুরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে একটি নিবিড় বন ছিল। সে বনে দিবসেও মনুষ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইত। এই বনের পার্শ্ব দিয়া গ্রামে গমনাগমনের একটি পথ ছিল। সেই দস্যু, হিংস্র জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ ভয়সঙ্কুল পথে পান্থগণ সহজে পদার্পণ করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অথবা অনেকে একত্র দলবদ্ধ থাকিলে সে পথ দিয়া যাতায়াত করিত।

বেলা নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। পক্ষিগণ নানা দেশ হইতে উদর পূর্ণ করিয়া আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে। হঠাৎ গ্রামমধ্যে কতকগুলি কুকুর এককালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের রব প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে অরণ্য পর্য্যন্ত আসিল। এক জন নিশ্চিন্ত ও সানন্দ কৃষক স্বীয় গাভীকে বাটী লইয়া যাইতে যাইতে মনের সুখে রাধা-শ্যামের প্রেমব্যঞ্জক গীত গাহিতেছে। তাহার সেই উচ্চ রবে বন আমোদিত হইতেছে। বনের অনতিদূরে একটি পথহারা দলভ্রষ্টা গাভী শঙ্কিত-নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতেছে। যাহার গাভী হারাইয়াছে, সে অরণ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া, "শুকি! শুকি!" বলিয়া চীৎকার করিল। পালক-কণ্ঠনিঃসৃত পরিচয় স্বর শুকির কর্ণে প্রবেশ করিল; সে হাম্বারবে সেই দিকে ছুটিল। একটি ঝোপের পার্শ্বে একটা শৃগাল বসিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখিতেছে এবং সময়ে সময়ে মক্ষিকা ও মশার দংশন নিবারণ জন্য পুচ্ছ নাড়িতেছে, পদ দ্বারা গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে অথবা দংষ্ট্রা দ্বারা স্বীয় শরীরের স্থানবিশেষ দংশন করিতেছে। সহসা একটি নকুল ডাকিতে ডাকিতে পথের এক সীমা হইতে অপর সীমায় গমন করিল। ফলতঃ এই সময়ে এই বনের প্রকৃতি দর্শন করিলে মনে প্রীতি ও ভয় এই দুইটি নিতান্ত বিরোধী ভাব এককালে সঞ্চারিত হয়।

এইরূপ সময়ে এই পথে একটি যুবক গমন করিতেছেন দেখা গেল। এই বিপৎসঙ্কুল পথে একাকী যুবক কেন যাইতেছেন? যে পথ মনুষ্য-সমাগম-বিরহে প্রায়শঃ বনাধিকৃত হইয়াছে, সে পথে সন্ধ্যাসময়ে একাকী মনুষ্য! যুবক সত্বর পদবিক্ষেপে গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। সহসা তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কর্ণে একটি শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, সেই শব্দ পুনরায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বে ভীতি-সংবলিত রোদন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। শব্দ রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল। যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই ভয়াবহ, বিপজ্জনক ঘোর বনে কোন অবলা বিপদ্গ্রস্ত হইয়া রোদন করিতেছে—কে তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? যুবক শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, ততই সেই অগোচরা রমণীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুবক বেগে চলিতে লাগিলেন। লতিকায় তাঁহার চরণ বদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি তাহা সবলে ছিন্ন করিতে লাগিলেন; কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ক্ষণবিলম্বে যুবক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে ভয়ানক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি দেখিলেন—এক ভীষণদর্শন মনুষ্য ভয়চকিতা ও

রোরুদ্যমানা এক সুন্দরী যুবতীর করাকর্ষণ করিয়া বলপ্রয়োগ করিতেছে। তরুণী কাঁদিতে কাঁদিতে উক্ত পিশাচের পদতলে পতিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ রোদনে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পামর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুবতীকে যেরূপ শব্দে সম্বোধন করিতেছে এবং যেরূপ জঘন্য প্রস্তাবে যুবতীর সম্মতি পাইবার নিমিত্ত বিবিধ লোভজনক কথা বলিতেছে, তাহা শুনিলে নিতান্ত স্নিগ্ধ শোণিতও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রমণীর বিবিধ কাকুতিমিনতি কিছুই পাষণ্ডের হৃদয়ে স্থান পাইল না। নরাধম দেখিল, তরুণীর চীৎকারের পথ বন্ধ করিতে না পারিলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এই বিবেচনায় দুর্বৃত্ত সুন্দরীর মুখ বাঁধিতে চেষ্টা করিল। যুবক আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তে একটি যষ্টি ছিল। এই প্রহরণমাত্র সম্বলে তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং দুরাত্মা সতর্ক হইতে না হইতেই তাহার শির লক্ষ্য করিয়া যষ্টি দ্বারা ভীষণ প্রহার করিলেন। যষ্টি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; পামর অত্যন্ত আঘাত পাইল। সে বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল। যুবক তাহাকে চিন্তা করিতে সময় না দিয়া, তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া, তাহাকে ভূতলে শায়িত করিলেন ও তাহার বক্ষে জানু দিয়া উপবেশন করিলেন। পামর স্বীয় রক্তবর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে দৃষ্টির প্রত্যেক কণিকায় প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-কামনা প্রকাশিত হইতেছে। যুবক তাহাতে কাতর হইলেন না। ভীতা, সমুচিতা সুন্দরীকে বিপন্মুক্ত করা হইল, ইহাতেই তাঁহার অপার আনন্দ জন্মিল।

সুন্দরী তরুণী এখনও অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছেন। যুবক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। যুবতী অমনই মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যুবক দেখিলেন, রমণী অসামান্যা সুন্দরী, যৌবনোন্মুখী বালিকা। যুবতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য যুবক-হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন, "তোমার আর ভয় কি? এখনও কাঁপিতেছ কেন? যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে তোমার পরিচয় দেও, আমি তোমাকে নিরাপদে গৃহে রাখিয়া আসিতেছি।"

এই সময় সুসময় বোধে যুবকের ভীষণ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত দুরাত্মা চেষ্টা করিতে লাগিল। যুবক বজ্র-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দুর্বৃত্ত, স্থির থাক্, নচেৎ এখনই তোর জঘন্য জীবন যমালয়ে পাঠাইয়া জগতের পাপভার লাঘব করিতে সঙ্কোচ করিব না।"

এই বলিয়া যুবক প্রথমে তাহার পদদ্বয় দৃঢ় বদ্ধ করিলেন; পরে তাহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষ তাহার শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং সেই বদ্ধ হস্ত-পদ একস্থানে করিয়া কঠিনরূপে বন্ধন করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোর অপকৃষ্ট জীবন বধ করিয়া আমার আত্মাকে কলুষিত করিতে চাহি না, অন্য উপায়ে তোর ঘৃণিত প্রাণের শেষ হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোকে আমি যে অবস্থায় রাখিয়া চলিলাম, বিধাতা যদি তোর নিতান্ত অনুকূল হন, তবেই তুই নিস্তার পাইবি; নচেৎ এই তোর জীবনের শেষ মনে কর।"

তরুণী এই সময়ে যুবকের মনোহর, সম্পূর্ণ ও সুগঠিত কান্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। উপকারকের ছায়া হৃদয়পটে সুন্দররূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্তই হউক, সেরূপ রূপ কখন নয়নগোচর করেন নাই বলিয়াই হউক, অথবা উপকারকের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি জন্মে বলিয়াই হউক, সেই যুবতী নয়নানন্দমূর্ত্তি হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এই সময় যুবক পাপিষ্ঠকে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিতমনে যুবতীর নিকট আগমন করিলেন। অমনই রমণী লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। আবার তাঁহার চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। আবার তিনি শিহরিতে লাগিলেন।

যুবক কহিলেন, "ভয়ের কারণ সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে, আর ভয় কি?"

যুবতী উত্তর করিলেন না। যুবক পুনরপি যুবতীর পরিচয় ও এতদ্ঘটনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। যুবতী অতি সংক্ষেপে ধীরে ধীরে মধুর কম্পিত ও ভয়-বিকম্পিত স্বরে এতদ্ঘটনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন।

যুবক শিহরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে কোথায় রাখিয়া আসিলে তুমি নির্ব্বিঘ্ন হইবে?"

যুবতী বলিলেন, "গোপালপুরে আমাদের বাটী।"

যুবক। গোপালপুরে। সেখানে তো আমি সর্ব্বদা আসিয়া থাকি। তোমার পিতার নাম শুনিতে পাই কি?

যুবতী। কালিদাস ভট্টাচার্য্য।

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন এবং সবিস্ময়ে কহিলেন, "বিধাতাকে ধন্যবাদ! ভাগ্যে আমি সময়মত উপস্থিত হইয়াছিলাম! ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি বিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি তাঁহার কন্যা? তোমাকে তো কখনও দেখি নাই?"

আকাশমার্গ ভেদ করিয়া দ্বিজরাজ এক্ষণে স্বীয় হৈমরথ চালনা করিতেছেন। তারাগণ যেন পতি-বিরহে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া 'তুমি কোথা যাও' বলিয়া রথের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। পৃথিবী হাস্যময়ী; সর্ব্বত্র আলোকময়। বিহঙ্গমগণ সময়ে সময়ে ঝঙ্কার দিতেছে; বোধ হয়, রজনীর এতাদৃশ শুভ্রতা দর্শনে তাহাদের দিবাভ্রম জন্মিতেছে, তদ্ধেতু সন্ধ্যা-সহ উষা সমাগত বোধে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

যুবক কহিলেন, "আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। ক্রমে অধিক রাত্রি হইতেছে। চল, তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

যুবতী এ প্রস্তাবে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যুবক অগ্রসর হইলেন। যুবতী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা নিবিড় বনে লুকাইয়া গেলেন।

এ যুবা কে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা বুঝিয়াছেন কি? এ যুবা আমাদের পরিচিত উমাপতি। গোপালপুরে উমাপতির মাতুলালয়, এজন্য তিনি সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। কোন বিশেষ কার্য্যে তাঁহার অদ্য এই অসময়ে এই অপথ দিয়া ব্যস্ত হইয়া যাইতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলয়ে

"আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥"
—চণ্ডীদাস।

গোপালপুর নিস্তব্ধ। মানবগণ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের চেষ্টা দেখিতেছে। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি গৃহের লোক-সকল কেবল ঘুমায় নাই। গৃহটি দেখিলে তাহা সম্পন্ন লোকের আবাস বলিয়া অনুমিত হওয়া অসম্ভব। জীর্ণ আলয়, কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ভবনে চারিটিমাত্র প্রকোষ্ঠ; সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গন নিতান্ত বিস্তৃত নহে, তাহার অপরপার্শ্বে একখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। ভবনের এক প্রকোষ্ঠে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপালোকে বসিয়া দুই জন লোক কথা কহিতেছে ও কাঁদিতেছে। ইহার এক জন পুরুষ ও অপরা নারী। পুরুষের বয়স অনূ্যন পঞ্চাশদ্বর্ষ হইবে। দ্বিতীয়া তাঁহারই স্ত্রী। তাঁহার বয়স চল্লিশ বর্ষের ন্যূন নহে।

পুরুষ কহিলেন, "আমি আর কি করিব বল? যথাসাধ্য সন্ধানের ত্রুটি করিলাম না। এখন বিধাতার ইচ্ছা! একে রাত্রিকাল, তাহাতে দারুণ অন্ধকার, আমি এখন যাই কোথায়? গিয়াই বা করিব কি? নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিই বা কেমন করিয়া? হরিহরের কত লোক সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা আমি কি অধিক সন্ধান করিতে পারিব? তা বলিয়া তো নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারি না। ভগবান্ আমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছেন! যাই, আবার যাই।"

নারী কহিলেন, "না। তুমি গিয়া আর কি করিবে? আমি এখন ভাবিতেছি যে, যাহা অদৃষ্টে ছিল, তা তো হইল। এখন কালি সকালে লোকের কাছে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?"

পুরুষ কহিলেন, "ভগবান্! সকলই তোমার ইচ্ছা! সমাজচ্যুত হইলাম, পৈতৃক স্থানভ্রষ্ট হইলাম, একটি কন্যাহীন হইলাম। সকল সহিয়া, একটিমাত্র কন্যা লইয়া এই স্থানে লুক্কায়িতভাবে বাস করিতেছি, এ ও ভগবন্, তোমার প্রাণে সহিল না? এ চিরদুঃখীকে কষ্ট দিতে তোমার এত আনন্দ? দেও, তাতে ক্ষতি নাই। আমাকে কষ্ট দেও, আমি অনেক সহিয়াছি, অনেক সহিতে পারি; কিন্তু বাছা আমার কখন ক্লেশের বার্ত্তা জানে না, তাহাকে এত ক্লেশ দেওয়া, দয়াময়! তোমার কি উচিত? তোমার কার্য্য তুমিই জান! আহা! সে না জানি কি বিপদেই পড়িয়াছে!"

এই সময় তাহাদের গৃহের পশ্চাতে মনুষ্যের পদশব্দ হইল, উভয়ে সতৃষ্ণ নয়নে অঙ্গন-দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটি অস্পষ্ট মানুষমূর্ত্তি প্রবেশ করিতেছে দেখিলেন। উভয়ে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে সে দিকে

ধাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে ও! মুক্তকেশী?"

এ প্রশ্নের উত্তর বাক্যে হইল না। মুক্তকেশী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাতৃগলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া ইহার উত্তর সমাধা করিলেন। হারাকন্যা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায় যে অপার আনন্দ জন্মিল, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা সকলে কতক্ষণ সেই স্থানে থাকিয়া পর্য্যায়ক্রমে শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মুক্তকেশী কহিলেন, "বাবা! ইনিই আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন?"

এই বলিয়া উমাপতিকে দেখাইয়া দিলেন।

উমাপতিকে দেখিয়া কালিদাস ভট্টাচার্য্য সহজেই চিনিতে পারিলেন এবং আনন্দে কহিলেন, "কে ও, উমাপতি না?"

উমাপতি "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "উমাপতি! এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, তোমাকে লক্ষ্যই করি নাই। তুমি কিছু মনে করিও না বাবা।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি ইঁহাকে জান না? ইনি আমাদের পর নহেন। ইনি হরিহরের ভাগিনেয়।"

উমাপতি কহিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় হই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। মাতুল মহাশয়ের নিকট বিশেষ আবশ্যক আছে।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "উমাপতি, রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ এখানে থাকিলে ক্ষতি কি? আমাদের অদ্য যে আনন্দ জন্মিয়াছে, তুমিই তাহার কারণ, অতএব তোমার সহিত অধিকক্ষণ থাকিয়া এই বিষয়ের কথোপকথন করিলে এই আনন্দ আরও বাড়িবে।"

উমাপতি একটু চিন্তিত হইলেন; কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে মাতুল-সমীপে আসিতেছিলেন,—পথে এই বিপদ্। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি কখন একাকী অসময়ে সেই জনহীন পথে আসিতেন না; সুতরাং তাঁহার এখানে রাত্রিযাপন করিয়া কার্য্যে হানি করা অবিধেয়, ইহা উমাপতি বুঝিলেন। আবার ভাবিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশীকে দর্শন অথবা তাঁহার সান্নিধ্যে যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, সেটুকু পরম সুখময়। সে সুখের আশা ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। উমাপতি এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে মুক্তকেশীর বদনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, মুক্তকেশী একদৃষ্টিতে তাঁহাকেই দেখিতেছেন। উমাপতির বোধ হইল যেন, সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ ও মায়া মাখান রহিয়াছে। উমাপতি সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন এখন অতি সামান্য বোধ হইতে লাগিল। সে স্থানের পরিবর্ত্তে যদি কেহ তাঁহাকে তখন স্বর্গরাজ্যের অক্ষয় সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হয়, তাহাও উমাপতি গ্রহণ করেন কি না সন্দেহ!

স্থিরনিশ্চয় করিয়া উমাপতি কহিলেন, "তাহাই হইবে। অদ্য এখানেই থাকিলাম।"

উমাপতি আবার মুক্তকেশীর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন তাহা আনন্দে হাসিতেছে। তাঁহার মনশ্চক্ষু কল্পনাবলে মুক্তকেশীর বদনের নানাবিধ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রান্ত উমাপতি কল্পনাদৃষ্ট অবাস্তর ও অপ্রকৃত ঘটনা বাস্তব ও প্রকৃত মনে করিয়া সুখী হইলেন।

ভট্টাচার্য্য সানন্দে উমাপতির হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। মুক্তকেশী ও তাঁহার মাতা অনুসরণ করিলেন। দীপালোকে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন করিলেন। বালিকা মাতৃস্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। এখনও সময়ে সময়ে মুক্তকেশী চমকিতা ও কম্পমানা হইতে লাগিলেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে দুহিতার নয়নমার্জ্জনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার কটি বেষ্টন করিয়া বসিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আর ভয় কি মা? বল দেখি কি হয়েছিল?"

উমাপতি কহিলেন, "সে সমস্ত আমি সংক্ষেপে শুনিয়াছি। বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

মুক্তকেশী উমাপতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, অমনি তিনি অবনতমুখী হইয়া রোদন ও ভয়-বিকম্পিতস্বরে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সে অনেক কথা। আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাত করাইব।

বৈকালে প্রত্যহ যেরূপ মুক্তকেশী গাত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আলয়-সন্নিহিত সরোবরে গিয়া থাকেন, অদ্যও সেইরূপ গিয়াছিলেন। অন্যদিন তাঁহার মাতা সঙ্গে থাকেন; অদ্য বিশেষ কার্য্য হেতু তিনি যাইতে পারেন নাই। প্রতিবেশী কেহ না কেহ তথায় প্রায়ই উপস্থিত থাকে, অদ্য কেহই ছিল

না। মুক্তকেশী একাই ব্যস্ততা সহকারে গাত্র ধৌত করিতেছিলেন। অবিলম্বে কার্য্য সমাপ্ত করত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিলেন। এমন সময় সহসা সন্নিহিত ক্ষুদ্র বন হইতে এক ব্যক্তি অলক্ষিতভাবে আসিয়া একেবারে মুক্তকেশীর হস্ত ধারণ করিল। বালিকা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহার কৃষ্ণকায়, পরুষভাব, রক্ত চক্ষু, তাম্রবর্ণ কেশ এবং বীভৎস আকৃতি দর্শনে মুক্তা প্রায় জ্ঞানহীনা হইলেন। পলায়ন করা অসাধ্য। তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা কখনই তাঁহার ন্যায় কোমলাঙ্গী বালিকার সাধ্য নহে। তিনি রোদন করিবেন কি চীৎকার করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে তজ্জন্য ব্যস্ত হইতেও হইল না, অবিলম্বে দুর্বৃত্ত তাঁহার মুখ বাঁধিয়া বাক্যকথনের শক্তি হরণ করিল; মুক্তকেশী অজ্ঞান হইলেন। পরে দুরাচার তাঁহাকে পূর্ব্বকথিত অরণ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল। তথায় গিয়া মুক্তার বন্ধনমোচন করিল। তিনি তখনও অজ্ঞান। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া সে ব্যক্তি দূরে বসিয়া ছিল। অধুনা তাঁহার জ্ঞানোদয় দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মুক্তকেশী কাঁদিতে লাগিলেন, সে আরও হাসিতে লাগিল।

মুক্তকেশী বলিলেন, "আমার মা-বাপ আমাকে এতক্ষণ না দেখিয়া কত কাঁদিতেছেন, আমার জন্য তাঁহারা কত খুঁজিতেছেন। আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, আমি বাড়ী যাই; আমার বাপ মার আর কেহই নাই।"

সে এ সকল কোন কথা কানে করিল না, বরং এ কথায় উপহাস করিতে লাগিল। সে কিছুই লক্ষ্য বা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া মুক্তকেশীকে কত লোভ দেখাইতে লাগিল এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া বল-প্রয়োগের উদ্যম করিল। মুক্তকেশী অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুষ্ট দেখিল, রোদনের পথ বন্ধ না করিলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এই বিবেচনায় সে রোদন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ মুক্তকেশীর মুখ বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিধাতা মুক্তকেশীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন তথায় উমাপতিকে উপস্থিত করিলেন। অবশিষ্ট ঘটনা পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "জগদম্বে! তুমি সকলই করিতে পার। উমাপতি! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! কমলার কৃপায় তোমার কিছুরই অভাব নাই। প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ কর। অদ্য তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, ইহা জন্মান্তরেও শুধিবার নহে। আমি তোমার মাতুলের আশ্রিত। সুতরাং আমি তোমার পর নহি। তার পর কি হইল, তুমি তাহা জ্ঞাত আছ—বল।"

উমাপতি মুক্তকেশী-কথিত ঘটনার অবশিষ্টাংশ যাহা জানিতেন, তৎসমস্ত বলিলেন।

এই সকল কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে সকলে বিবিধ আনন্দজনক বাক্যালাপ করিলেন এবং আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুখ-স্বপ্ন

"Among the many pretended arts of divination there is none which so universally amuses as that by dreams."

—Spectators.

উমাপতি দক্ষিণস্থ একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার শয্যার অনতিদূরে একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছিল। নিদ্রাদেবী এখনও তাঁহার হৃদয়ে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন নাই। উমাপতি নয়ন নিমীলিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নিদ্রার আধিপত্যে নহে। তিনি নানাবিষয়িণী চিন্তায় নিবিষ্টমনা ছিলেন। একটির পর একটি সুখময়ী চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রবেশ করিতেছে এবং অতি অল্পক্ষণ তথায় অবস্থান করত আর একটির জন্য পথ মুক্ত রাখিয়া স্বয়ং প্রস্থান করিতেছে। সৎকার্য্য সম্পাদন করিলে মনে স্বভাবতঃ বিমল আনন্দ জন্মে। আনন্দই সুখের মূল। উমাপতি অদ্য যে সৎকার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তাঁহার

হৃদয় একণে আনন্দে ভাসিতেছে। আনন্দের প্রভাবে মনের স্থিরতা থাকে না। নিরানন্দে একটি চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; কিন্তু আনন্দে সেরূপ হয় না। আনন্দে তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ সুখময়ী চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

উমাপতি শয্যায় শয়ান হইয়া এইরূপ অসংলগ্ন যুগপৎ সমাগত চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতেছেন। নানাবিষয়িণী চিন্তার সহিত একটি মুগ্ধকরী চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রগাঢ়রূপে সমাসীন হইল, সে চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি সেই চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ, আনন্দ, আশা অসীম হইয়া উঠিল। একটি রমণীর চিন্তায়—তাহারই রূপধ্যানে, তাহারই মনোহর স্বভাব সন্দর্শনে উমাপতির জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেচনা, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি প্রহরিবেষ্টিত চিত্ত পরাভূত হইয়াছিল। সে রমণী মুক্তকেশী। উমাপতি মুক্তকেশীর রূপগুণাদির বিষয় যত আন্দোলন, যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। ততই তাঁহার মন প্রবলবেগে ক্রমশঃ সেই দিকে পরিধাবিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভূলোকদুর্লভ রমণীচরিত্রে যে নিদারুণ অনপনেয় কলঙ্ক-পঙ্ক সংলিপ্ত হইতেছিল, তিনি তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। সে জন্য তাঁহার নিরহঙ্কার মনে গর্ব্বের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মুক্তকেশীর মন কি উন্নত! তিনি দয়াময়ী দেবী! যে নরাধম তাঁহার প্রতি তাদৃশ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার উপরও মুক্তকেশীর দয়া! মুক্তকেশী সংসারের সার। তাহার মন মূল্যবান্ রত্নখনি। তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। তিনি কামিনীকুল-কমলিনী। এত শোভা, একাধারে এত গুণ, এত পবিত্রতা— উমাপতি আর কখন দেখেন নাই। মুক্তকেশীর সমস্তই তিনি আশ্চর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। যে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তকেশী-রত্নকে দর্শন করে নাই, তাহার জন্মই বৃথা। সে সংসারের কি দেখিয়াছে,—কিছুই না। সংসারে কি আর রূপবতী রমণী নাই?—থাকিতে পারে, কিন্তু মুক্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রমণী আছে কি না এ বিষয়ে উমাপতির সন্দেহ জন্মিল।

উমাপতি এই চিন্তায় এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি দেখিতে লাগিলেন—মুক্তকেশী ব্রীড়াবনত-বদনে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তিনি যেন শুনিতে লাগিলেন, মুক্তকেশী তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মধুর হাস্যসহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ধ্যান করিতে করিতে উমাপতি নিদ্রার কোমল আশ্রয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

নিদ্রাগমে তিনি মুক্তকেশীর চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। উমাপতি নিদ্রিতাবস্থায় মুক্তকেশীসংক্রান্ত সুখময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যেন তিনি কোন পরম রমণীয় গিরিকন্দরে উপবিষ্ট আছেন। তথায় সুস্বনে মলয়মারুত প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে নির্ঝরিণীসকল প্রপাতপরম্পরায় নিপতিত হইয়া ঘোর গম্ভীর শব্দ সমুৎপন্ন করিতে করিতে নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে এবং বায়ুকে বারিকণাসম্পৃক্ত করিয়া শীতলতা প্রদান করিতেছে। যথায় তিনি উপবেশন করিয়া ছিলেন, সে স্থান শ্যামল, সমশীর্ষ, নবদূর্ব্বাদলসমাচ্ছন্ন। সম্মুখে একটি গিরিনিঃসৃতা সঙ্কীর্ণা প্রবাহিণী পন্নগসদৃশ বক্রগতিতে গমন করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণ দিকে গগনস্পর্শী নগরাজ অভ্রভেদী মস্তক উন্নত করিয়া বিশ্ব পরিদর্শন করিতেছে। তাঁহার অপর পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষলতাদিসমাবৃত অরণ্য। অরণ্যের স্থানে স্থানে লতাবল্লরী দ্বারা বদ্ধ বৃক্ষনিচয় পরস্পর সংযত হইয়া অপূর্ব্ব মণ্ডপ সকল সৃজন করিয়াছে। তথায় নানা-বর্ণবিভূষিত কলনাদী বিহঙ্গগণ সতত সুস্বর-বর্ষণ করিতেছে। পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র অরণ্য। বহু যত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়া যে সকল বৃক্ষ পুষ্প প্রসব করে না, তাহারাও অকাতরে বিবিধ রাগরঞ্জিত গন্ধময় পুষ্প উৎপাদন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ শিলীমুখ এই সকল পুষ্পজাত মধুপানাশায় গুঞ্জন-সহকারে তথায় বিচরণ করিতেছে। সে স্থানটি অতি রমণীয়। উমাপতির বোধ হইল, সেটি স্বভাবের রমণীতার ভাণ্ডার। তিনি একান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবের সেই পরম রমণীয় শোভা-সন্দর্শনে বিপুল আনন্দ-পয়োধি-নীরে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া স্রষ্টার নৈপুণ্য ও কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। এই সময় তাঁহার অলক্ষিতভাবে পশ্চাতের বন হইতে বনাধিষ্ঠাত্রী মোহিনী দেবী কুসুমসজ্জায় সজ্জিতা হইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তিনি মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে উমাপতি-সন্নিধানে আসিয়া এককালে দুই হস্তে

উমাপতির দুই চক্ষু আবরণ করিলেন; উমাপতি রোমাঞ্চিত হইয়া বলিলেন, "কে তুমি?"

দেবী তাঁহার চক্ষু হইতে হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ছি—তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না?"

উমাপতি সানন্দে দেখিলেন, দেবী অন্য কেহ নহেন—মুক্তকেশী। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "মুক্তকেশি! তুমি যে এখানে?"

মুক্তা। আমি এখানকার শোভা দেখিতে আসিয়াছি। তুমি এখানে আসিয়াছ, আমি তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।

উমা। আমি এখানে আসিয়াছি, তোমাকে কে বলিল?

মুক্ত। যে বলিবার, সেই বলিয়াছে।

এই বলিয়া সুন্দরী স্বীয় হৃদয় লক্ষ্য করত অঙ্গুলিসঞ্চালন করিলেন।

উমা। মুক্তকেশি! তোমার এ বেশ কেন?

মুক্ত। কোন্ বেশ?

উমা। এই মনোহর পুষ্পবেশ?

মুক্ত। কেন? এ বেশ তুমি ভালবাসো না?

উমা। ভালবাসি না? আমি এ বেশ বড় ভালবাসি।

মুক্ত। সত্য?

উমা। আমি তোমার নিকট মিথ্যা কহিব, ইহাও কি সম্ভব?

"তবে তুমি থাক। তোমারও এ বেশ হইবে—আমি তোমাকে সাজাইব।"

এই বলিয়া মুক্তকেশী আবার সেই পুষ্পবনে অন্তর্হিতা হইলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর চমৎকার ভাব ও অসাধারণ সরলতা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মুক্তকেশী বস্ত্রাঞ্চল বিবিধ মনোহর পুষ্পভারে পরিপূর্ণ করিয়া তথায় প্রত্যাগত হইলেন এবং দূর্ব্বোপরি পুষ্পসকল রক্ষা করত কয়েকটি দ্বারা একটি উষ্ণীষ প্রস্তুত করিলেন। সেই উষ্ণীষ উমাপতির মস্তকে দিয়া দেখিলেন যে, অতি সুন্দর হইয়াছে। মুক্তকেশী আহ্লাদে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিতা হইয়া পুষ্প দ্বারা অবশিষ্ট সমস্ত ভূষণ প্রস্তুত করিলেন এবং একে একে সেইগুলি উমাপতিকে পরাইতে লাগিলেন। উমাপতি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদেবীর অনুগ্রহে স্বর্গসুখানুভব করিতে লাগিলেন। মুক্তকেশী উমাপতিকে সমস্ত পুষ্পাভরণ পরিধান করাইয়া কহিলেন, "দাঁড়াও দেখি—কেমন হইয়াছে দেখি।"

উমাপতি দাঁড়াইলেন। মুক্তকেশী দেখিলেন, তাঁহার আর ফুল নাই;—কহিলেন, "আর চারিটি রাঙ্গা ফুল আনিলে বেশ হইত। সাদা মালা দু'গাছির মধ্যে একগাছি রাঙ্গা মালা দিলে খাসা দেখাইত।"

ক্ষণপরে আবার কহিলেন, "ও দুঃখ রাখিব না। সাধ মিটাইব!"

এই বলিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে একগাছি রাঙ্গা মালা উন্মোচন করিয়া তাহা উমাপতির গলদেশে অর্পণ করিলেন। উমাপতি তাঁহার এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন।

মুক্তকেশী বলিলেন, "ছি! কি করিলাম? তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই তোমার কণ্ঠে মালা দিলাম? তুমি হয় তো আমাকে চঞ্চলা মনে করিতেছ?"

উমাপতি বাক্যে উত্তর না দিয়া একটি প্রেম-পবিত্র আলিঙ্গন দ্বারা ইহার উত্তর সমাধান করিবেন মনস্থ করিলেন। তিনি যেমন তদর্থে উঠিবেন, অমনই তাঁহার সুখস্বপ্নেরও অবসান হইল।

উমাপতি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহার দক্ষিণদিকের বাতায়ন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রাতঃকালের যে অংশ দিবারাত্রি উভয়ই সমভাবে মিশ্রিত থাকে, এক্ষণে সেই সময় সূর্য্য আকাশে আবির্ভূত হয় নাই; কিন্তু তিনি এক্ষণে যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তথা হইতে তাঁহার তেজের প্রতিবিম্ব আসিয়া পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশকে রঞ্জিত করিতেছে। দুই একটি বায়স কুলায় ত্যাগ করিয়া প্রাচীর-মস্তকে বসিয়াছে এবং এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে এক একবার ডাকিতেছে। রন্ধনগৃহের পার্শ্বস্থ ভস্মস্তূপে একটি কুকুর নিদ্রিত ছিল; সে এক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফট্ ফট্ শব্দে স্বীয় কান ঝাড়িতে লাগিল। দুই একটি পতঙ্গ তাহাকে বড় ত্যক্ত করিতেছিল; সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বদন ব্যাদন করিতে লাগিল, একটি পেচক রন্ধনশালার মস্তকে উপবিষ্ট থাকিয়া ভীতমনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কি মনে হইল—সে আসন ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত আম্রবৃক্ষের শিরে গিয়া ঝুপ করিয়া উপবিষ্ট হইল। বৃক্ষের যে শাখায় সে উপবেশন করিল, সেটি তাহার ভরে দুলিতে লাগিল।

মুক্ত বাতায়নপথে ঝির ঝির করিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া উমাপতির দেহ শীতল করিতেছিল;

তথাপি উমাপতি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় এইরূপ সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বিস্ময়সহকারে নয়ন উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও সংবর্দ্ধিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশা-সুখে

"হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্।"
—উত্তররামচরিতম্।

উমাপতি নিদ্রাভঙ্গ-সহকারে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশী মুক্ত বাতায়নের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উমাপতিকে দেখিতেছেন। তিনি যেই চক্ষু মেলিলেন, অমনই মুক্তকেশীর চারু বদন দেখিতে পাইলেন। তিনি সে দর্শনকে প্রকৃত বিবেচনা করিতে সাহস করিলেন না; ভাবিলেন যে, এখনও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। অবিলম্বে সন্দেহ তিরোহিত হইল; দর্শন অপ্রকৃত নয় স্থির করিলেন; তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "মুক্তকেশি!"

এই বাক্যটি উমাপতির বদন-বিনির্গত হইবামাত্র মুক্তকেশী লজ্জাসহকারে অন্তর্হিত হইলেন; মুক্তকেশী রজনীতে শয়ন করিয়া নিদ্রাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। নিদ্রার পরিবর্ত্তে উমাপতির সহিত একত্র অবস্থান, তাঁহার সহিত সতত সদালাপ-কামনা তাঁহার মনকে বিচলিত করিল। যে শুভক্ষণে উমাপতি বিজন অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বিপন্না মুক্তকেশীর লুপ্তপ্রায় সতীত্বরত্ন উদ্ধার করিয়া তাঁহার হস্তে পুনরায় অর্পণ করিয়াছেন, সেইক্ষণ হইতে মুক্তকেশীর সরল মনে চিন্তার অঙ্ক পতিত হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উমাপতিগতচিন্তা হইয়াছেন; সরলা বালিকা সেই অবধি উমাপতিকৃত উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহাকে নিজ হৃদয় দান করিয়াছেন। মুক্তকেশী ইতিপূর্ব্বে অনেক যুবক—অনেক সুন্দর সুকান্তি যুবক দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে তো কাহারও ছায়া নাই! তাহাদের দর্শন করিবার নিমিত্ত তো কখন ব্যাকুলা হন নাই। উমাপতির সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় বলিয়া কি তিনি তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না?—তাহা নহে। তদপেক্ষা অনেক সুন্দর বদন তাঁহার দৃষ্টিপথে কতবার পতিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু উমাপতির বদনমধ্যে যে একটি অত্যাশ্চর্য্য সরলতা, আহ্লাদ, উৎসাহ, সহৃদয়তা, সুধীরতা ও প্রেমব্যঞ্জক রমণীয় ভাব বিরাজিত আছে, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দুর্লভ। কিশোরী তাহা আর কোথাও দেখেন নাই। এই কারণেই তিনি অযাচিত স্থলে জীবনের সার ধন হৃদয় দান করিয়াছেন।

জগতে সকলের হৃদয়ে প্রায় সমভাবে একটি নৈসর্গিক নিয়ম বর্ত্তমান আছে। তুমি যদি কাহারও উপকার কর, সে ব্যক্তি সেই স্বতঃসঞ্জাত নিয়ম-প্রভাবে তোমাকে একটু না একটু ভালবাসিবে, তোমার নিকট অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও কৃতজ্ঞ থাকিবে। এ কারণেও তাঁহার মন উমাপতির প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন মুক্তকেশীর সরল মনে সর্ব্বদা উমাপতির বদনেন্দু আবির্ভূত হওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল কি না, তাহা যে বিধাতা মানসিক বৃত্তি-সকলের স্রষ্টা, তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ কতক্ষণে উমাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে তাঁহার মধুমাখা কথা শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবেন, কতক্ষণে তাঁহার দর্শনলাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবেন, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রিতে মুক্তকেশীর নিদ্রা আইসে নাই। অনেক রাত্রিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা তাঁহাকে অচেতন করিয়াছিল। যখন সে নিদ্রা শেষ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, অধিক রাত্রি নাই। এক্ষণে নিদ্রা অনাবশ্যক ও অসম্ভব। শয়ন করিয়া না থাকিয়া মুক্তকেশী গৃহ-বহির্ভূতা হইলেন এবং অলিন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সীমাদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহার পরই উমাপতির প্রকোষ্ঠের মুক্ত বাতায়ন। মুক্তকেশী মনে ভাবেন নাই যে, ভ্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া পদদ্বয় অগ্রসর হইলেই নির্ব্বিরোধে উমাপতির মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন; সুতরাং তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। অন্যমনস্ক হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একবার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। গমনকালে তিনি কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে তিনি মুক্তবাতায়নপথে দৃষ্টি করিলেন। সে পথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে

আর তাঁহার সে স্থান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না। তিনি নড়িলেনও না। ধীরে ধীরে বাতায়ন-সন্নিহিত হইয়া তাহার লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া একচিত্তে উমাপতির কমনীয় কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে উমাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং যে মধুমাখা স্বর শুনিতে মুক্তকেশী এত ব্যাকুল ছিলেন, সেই মধুমাখা স্বর তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিল। অমনই মুক্তকেশী অদৃশ্যা হইলেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুখ ত্যাগ করিয়া কখনই সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সহচরী লজ্জা আসিয়া সজোরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তিনি অগত্যা তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

উমাপতি মুক্তকেশীর অদর্শনের পর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সত্যই মুক্তকেশী এখানে আসিয়াছিলেন? এমন সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুক্তকেশী কেন এখানে আসিয়াছিলেন? তিনি স্থির হইয়া এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার অধর-প্রান্তে আনন্দ ভাসিতেছিল। মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। কেন দেখিতেছিলেন? তিনি যেমন সর্ব্বদা মুক্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, মুক্তাও কি সেইরূপ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন? তাহাই হইবে। পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "স্বপ্ন যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমি অদ্য কি সুখী।"

এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদায়ে

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"
—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

উমাপতি ক্ষণপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতুলালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন; যাইবার সময় তাঁহার একবার মুক্তকেশীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন—তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেই কি মুক্তার সহিত সর্ব্বসমক্ষে সরলভাবে কথা কহিতে পারিতেন? না, তাহা পারিতেন না। তাঁহার সহিত নির্দ্দোষ আলাপ করিবেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, দুই তিন দিন পূর্ব্বে হইলে এরূপ হইত না, পূর্ব্বে যে উমাপতি ও মুক্তকেশী ছিলেন, তাঁহারা তো তাহাই রহিয়াছেন, তবে এরূপ হয় কেন? আমরা বলি, তাঁহারা তাহাই নাই। হৃদয় লইয়া মনুষ্য; বাহ্য আকারে মনুষ্য নহে। তাঁহাদের হৃদয় বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে আর পূর্ব্বকার তাঁহারা নহেন।

যাহা হউক, মুক্তকেশীকে দেখিতে না পাইয়া উমাপতি ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন। তিনি দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দেখিলেন মুক্তকেশী আসিতেছেন। উমাপতি সানন্দে কহিলেন, "মুক্তকেশি, কোথায় গিয়াছিলে?"

মুক্তা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল উত্তর দেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তিনি একবার উমাপতির কমনীয় কান্তি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। সে বাসনা সফল করিবার নিমিত্ত নয়ন উন্নত করিলেন, কিন্তু লজ্জা তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু নত করিয়া দিল। উমাপতির বদনের কিয়দংশের ছায়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে নিপতিত হইয়াছিল মাত্র, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গ হইল।

উমাপতি পুনরপি বলিলেন, "মুক্তকেশি! আমি এখন যাইতেছি।"

মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "কখন আসিবেন?"

উমাপতি কহিলেন, "বোধ করি, বৈকালে একবার আসিব।"

"আসিবেন?"

"আসিব। তবে যাই?"

মুক্তকেশী কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি আবার বলিলেন, "মুক্তকেশি! তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুক্তকেশী ধীরে ধীরে সেই দিকে ফিরিলেন।

উমাপতি একবার পশ্চাতে তাকাইলেন। অমনই মুক্তকেশীর চক্ষু অবনত হইল।

দেখিতে দেখিতে উমাপতি মুক্তার দৃষ্টি

সীমা-বহির্ভূত হইলেন। মুক্তা অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, পরে ক্ষুণ্ণমনে আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মনোরথে

"..................এত বড় আইবুড় ঝি।
বিবাহ না দিলে পরে লোক কবে কি?"
—গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। মুক্তকেশী একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একখানি পিঁড়ির উপর উপবিষ্ট হইয়া আপন মনে একগুচ্ছ কেশরজ্জু বিনাইতেছেন। দুই একটি বিনন ঠিক হইতেছে, পরে আবার ফাঁস ভুলিয়া যাইতেছেন, বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। তিনি আপনমনে কহিতে লাগিলেন, "দূর হউক, আজ আর ইহা হইবে না বৈকাল তো হইল। তিনি আসিবেন বলিয়াছিলেন, এখনও আসিলেন না কেন? হয় তো আসিবেন না, কেনই বা আসিবেন?"

সরলা মুক্তকেশী এইরূপে সময়ে সময়ে কেশরজ্জু বিনাইতেছেন; সময়ে সময়ে তাহা ত্যাগ করিয়া আপন মনে পাগলিনীর ন্যায় বকিতেছেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী অপর ঘরে বসিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাহারই কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, "আহা! খাসা ছেলে! ছেলে তো নয় যেন কার্ত্তিক! কথাগুলিই বা কেমন মিষ্ট! আমার ইচ্ছা করে, উমাপতির সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহ দিই।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "নির্দ্দোষ, রূপবান্, বিদ্বান্, বেশ সঙ্গতি আছে; ফলতঃ যা কিছু দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই সমস্তই উমাপতিতে বিদ্যমান।"

"তুমি সে আশা ছাড়িয়া দেও। তেমন কপাল নয়। এত দিন দেখিলে তো, কিছু জানিতে পারিলে? আর তা ভাবিয়া বসিয়া কাজ হারাইলে কি হইবে? এ পাত্রটি হাতছাড়া করিও না। মুক্তকেশী অনেক দিন বিবাহের বয়স ছাড়াইয়াছে।"

মুক্তকেশী অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপন মনে আপন কার্য্য করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার জনক-জননীর সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহার সে দিকে মন ছিল না। "মুক্তকেশী" এই কথাটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহারই কথা কহিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, জানিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি উৎকর্ণা হইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন, "সে আশা তো ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহার জন্য নয়। কথা কি জান, আমি সমাজভ্রষ্ট হইয়া, স্বস্থান ত্যাগ করিয়া এ বিদেশে বাস করিতেছি। এখানে আমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব কেহ নাই। যে আমার কন্যা গ্রহণ করিবে, সে অবশ্যই আমার সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান করিবে, তবেই গোল। এক আত্মীয় হরিহর। তাঁহার ভরসাতেই ও তাঁহার আশ্রয়েই এখানে বাস। তিনি সজ্জন। বিশেষতঃ তিনি ভালরূপে জ্ঞাত আছেন যে, আমি নির্দ্দোষ; শত্রুচক্রে পতিত হইয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। যে সকল নানা কারণে অদ্যাপি মুক্তার বিবাহ দেওয়া হয় নাই, তাহা হরিহর জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার সম্মতি অনুসারেই এরূপ হইতেছে। মুক্তা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহা কি আমি জানিতেছি না? অন্য লোকের হইলে কত কথা হইত। কেবল হরিহরের ভয়ে আমার বিষয়ে কেহ কোন কথা কহে না। তাহা হইলে কি হয়? বয়স্থা কন্যা পাত্রস্থা না করিলে মহাপাপ হয়। কৌলীন্যের অনুরোধে দেশে মুক্তার অপেক্ষাও অধিক বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা অনেক আছে। সেই কারণে আমি অদ্যাপি লোকের নিকট বিশেষ নিন্দাভাজন হইতেছি না। যাহা হউক, মুক্তার বিবাহ যত দূর সম্ভব শীঘ্র দেওয়াই আবশ্যক হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণী। তুমি যে কারণ বলিলে, সে কারণে হরিহরও তো উমাপতির সহিত তোমার কন্যার বিবাহে অমত করিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ। না, সে বিষয়ে আমার সাহস আছে। হরিহর অস্বীকৃত হইবেন না, আমি বেশ জানি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দিন আমার মনে হয় নাই যে, হরিহরের এমন উপযুক্ত অবিবাহিত ভাগিনেয় আছে।

ব্রাহ্মণী। অবিবাহিত জানিলে কি প্রকারে?

ব্রাহ্মণ। ত, আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তাহার পরে বিবাহ হইলে কখনই আমার অজ্ঞাতসারে হইত না।

ব্রাহ্মণী। যাহা হউক, যাহাতে এই শুভসংঘটন হয়, তাহার যত্ন কর।

সে দিন ব্রাহ্মণ-দম্পতি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিলেন। মুক্তকেশী সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার অধরপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল এবং চারুচন্দ্রাননে এককালে হর্ষ ও লজ্জার বিভা প্রকটিত হইল। লজ্জা কেন? তাহা তিনিই জানেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, উমাপতির সহিত বিবাহ দেওয়া তাঁহার জনক-জননীর অভিপ্রায়। তাঁহারা এই পরামর্শই করিলেন। আবার ভাবিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা আর কি বলিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে পাই নাই অথবা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। না; তাঁহাদের সমস্ত কথা আমি পরিষ্কাররূপে শুনিয়াছি, তাহাতে তো সন্দেহ নাই। আবার বালিকা ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার আনন্দ-তরঙ্গে পূর্ব্বজাত সন্দেহ-বালুকা কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মন হইতে সমস্ত চিন্তা বিদায় গ্রহণ করিল। কেবল আনন্দ, সুখময় আশা ও ভবিষ্যৎ কল্পনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিল। বালিকার দৃষ্টিতে তখন সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হইল। সংসার-বোধ-বিহীনা বালা সকল কার্য্যে ও সকল দিকে আনন্দ ও সরলতার রশ্মি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

মুক্তকেশী পুনরায় রজ্জু বিনাইতে মনঃসংযোগ করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার চিত্ত এখন যে অপূর্ব্ব চিন্তায় নিযুক্ত আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবংবিধ কার্য্যে সংলগ্ন করা কি তাঁহার ন্যায় অস্থিরপ্রকৃতি বালিকার কর্ম্ম? তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সৌকুমার্য্যে

"কবরী-ভয়ে চামর গিরিকন্দরে,
মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর কোকিল,
গতিভয়ে গজ বনবাস॥"
—বিদ্যাপতি।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিকস্থলে মুক্তকেশীকে সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তিনি কিরূপ সুন্দরী, জানিতে সকলের মনে স্বতঃ কৌতূহল জন্মিতে পারে। সেই কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রকৃত পরিচয়-প্রদান নিতান্ত কঠিন কার্য্য। দেশভেদে, জাতিভেদে, মনুষ্যভেদে সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্নবিধ। জগতের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতি-সমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য-লক্ষণ প্রচলিত। কোন জাতি হয় তো তুষার-ধবলাঙ্গী, তাম্রকেশী, বিড়ালাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয় তো ক্ষুদ্র-পদশালিনী, নখর-কুলিশ-প্রহারিণী, খঞ্জন-নয়নলোচনা যোষার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয় তো কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূল চর্ম্ম, স্থূলাধরসম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চ্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণবর্ণ, স্থিরনয়না, কৃষ্ণ-কেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন। কোন জাতি বা চঞ্চল-লোচনা, দ্রুত সজোর-পাদ-বিক্ষেপণী, শুকপক্ষী তুল্য নাসাধারিণী কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি মতের একতা দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্য-পূর্ণ। সৌন্দর্য্যবিষয়ক রুচির ভিন্নতা সহ সৌন্দর্য্য-সাধক অলঙ্কারেরও ভিন্ন ভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। কোন দেশে পুষ্পবেষ্টিত ঝুঁটী নিতান্ত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। কোথাও পক্ষি-পক্ষ চমৎকার ভূষণ বলিয়া গণ্য। কোথায় উল্কি দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। রুচি ভিন্ন বলিয়াই অলঙ্কারপদ্ধতিও ভিন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত জাতি আছে, ইহারা সাংসারিক বিবিধ বিষয়ে একমত; কিন্তু এই সম্বন্ধে ইহাদের অধিক ঐক্য দৃষ্ট হয় না। দেশভেদের ও জাতিভেদের কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যের এ বিষয়ে প্রায়ই একমত দেখা যায় না। যে কারণে গ্রন্থকার মুক্তকেশীকে সুন্দরী মনে করিয়াছেন, হয় তো সেই কারণেই কোন পাঠক মহাশয় তাহাকে সামান্যা ও কুৎসিতা মনে করিবেন; সুতরাং মুক্তকেশীর দেহ সাধারণ-সমীপে উপস্থিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে সম্বন্ধে আর কিছু না বলি, তাহা হইলেও হয় তো কোন পাঠক বলিবেন, "মুক্তকেশী বিশেষ সুন্দরী নহেন, সেই জন্য গ্রন্থকার তাহা চাপিয়া রাখিলেন।" কি বিপদ্! সহৃদয় পাঠক মহাশয়, গ্রন্থকারের বিপদ্ দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন, না হাসিতেছেন? যদি হাসিয়া থাকেন, তবে আর হাসিবেন না। সংসারে

কেবল অদ্য এই সামান্য গ্রন্থকার এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, এমন নহে! পরের সন্তোষ-সমুৎপাদনের জন্য যাঁহারা যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তখন এরূপ বিপদে পড়িয়াছেন। ঈশ্বরানুগ্রহশালী, মহামহোপাধ্যায় অসামান্য কবি সকলও এরূপ বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। 'অন্যে পরে কা কথা' কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস গৌরী-রূপবর্ণন-প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া এবং বিবিধ প্রকারে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। সেই বর্ণনা সকলেরই সন্তোষপ্রদ হইবে কি না হইবে, তৎপক্ষে সন্দিহান হইয়া উপসংহারকালে—

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না-
দেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥"

এই কথা বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিয়াছেন। বিচারক্ষম বিবেচক পাঠকগণ স্থিরচিত্তে দেখিবেন, তখন উক্ত কবির মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। এই জন্যই ইংলণ্ডীয় কবি-চক্রবর্ত্তী সেক্সপীয়র লিখিয়াছেন,—

"Beauty is bought by judgment of
the eye,
Not uttered by base salo of
chapmen's tongue,"

যাহা হউক, আমরা এই বিপদ্ময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া কি বলিব? কোন্ সর্ব্বজনদৃষ্ট সামগ্রীর সহিত এ সুন্দরীর তুলনা করিব? এক জন বর্ত্তমান যশস্বী কবি কোন সুন্দরীকে পাঠকগণের গৃহিণীর ন্যায় এবং পাঠিকাগণের দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অতি সহজ ও সুন্দর উপায়, কিন্তু তাহাতে এক বিষম দোষ জন্মিতেছে, পাঠকপাঠিকা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কারণ, পাঠকগণের বিবেচনায় তাঁহাদের গৃহিণীগণের এবং পাঠিকাগণের বিবেচনায় তাঁহাদের তুল্য সুন্দরী জগতে আর নাই। অধুনা বৎসর কয়েক মধ্যে দুই জন তদ্বৎ সুন্দরী প্রদর্শিত হইলে তাঁহাদের সেই চিরসঞ্চিত সংস্কারের অন্যথা করা হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের ক্ষোভ উদ্দীপন করা হয় এবং হয় তো অভিমানিনী পাঠিকাগণের বিশেষ বিরাগভাজন হইতে হয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; অন্য উপায় অনুসন্ধান করি।

কৃষ্ণনগরের রাজসভা-উজ্জ্বলকারী ভারতচন্দ্র "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া বর্ণনার চরম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা কখনও লক্ষ্মী বা সরস্বতী কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পাঠক মহাশয়েরা কেহ কি দেখিয়াছেন? অসুরনাশিনী মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার প্রতিমাপার্শ্বে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। যদি তাহাই লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে— তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার করি, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সুন্দরীর তুলনা করিতে পারি না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

অন্য উপায়াভাবে আমরা এক্ষণে সোজা কথায় মুক্তকেশীর মূর্ত্তি পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব।

মুক্তকেশীর বয়স অনুমান ষোড়শ বৎসর হইবে। যে বয়সে রমণীগণ বালিকাকালের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করত জগতের আনন্দবিধান করেন, মুক্তার এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তাঁহাকে এখনও সম্পূর্ণাবয়বা, সুগঠিতা, সংবর্দ্ধিত-দেহ-সম্পন্না বালিকা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধকারী; প্রীতি ও আনন্দ-পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নয়ন মন প্রাণ, দেহ সমস্তই তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করে, তথাপি এই সম্মোহন সৌন্দর্য্যমধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক পবিত্র, স্বর্গীয় কমনীয়তা বিরাজ করিতেছে যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি যেন কোথায় লয় পাইয়া যায়, তাঁহাকে স্নেহ করিতে ইচ্ছা করে এবং তাঁহার হিতার্থে কোন কার্য্য দুরূহ বিবেচিত হয় না; তাঁহার সন্তোষ-সাধনার্থে জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে কষ্ট হয় না।

মুক্তার অবয়ব লজ্জায় মাখা, লজ্জা তাঁহার শরীরে সর্ব্বত্র দীপ্তিমান রহিয়াছে। প্রীতি এবং পবিত্রতা সতত যেন তাঁহার বদনকমলে রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আপনি তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে যত্নের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিবেচনা করিতে সাহস করিবেন না সর্ব্বদা তাঁহারই নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এবং সতত তাঁহারই কার্য্যে জীবনপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কখন আপনার মনে কোন ঘৃণিত অভিলাষের উদ্রেক হইবে না।

এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা দর্শকের চিত্তকে

একেবারে আক্রমণ করে ও যন্ত্রণা দেয়; দর্শনমাত্র মন উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অদর্শনে ব্যাকুল হয়। মুক্তকেশীর সৌন্দর্য্য সেরূপ নহে, এতদ্দর্শনে দর্শক অপার আনন্দ অনুভব করেন এবং এ সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহে। তিনি যখন যেখানে থাকেন, যখন তাঁহার মনে ইহা সমুদিত হয়, তখনই তাঁহার মনে আনন্দ জন্মে। ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য্যরাশি দর্শকের অজ্ঞাতসারে দর্শকের চিত্তে প্রবেশ করে, তথাপি তাঁহার কষ্ট হয় না; তিনি সুখে থাকেন। মুক্তকেশীকে দর্শন করিবামাত্র সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। সে আনন্দ কেন জন্মে অথবা তাঁহার শরীরের কোন স্থানের বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিয়া জন্মে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। তাঁহার শরীরের সর্ব্বাংশই সুকুমার। প্রতিভা ও সরলতা যমল ভগ্নীর ক্রীড়াভূমিস্বরূপ সুচারু ললাট, ঘনকৃষ্ণবর্ণবিভাসিত অংস-নিপতিত চিকুরদাম, কুপিতা হংসীসম সুচারু চমৎকার গ্রীবা তাঁহার অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছে। অমল-ধবল লোচনে নিবিড় কৃষ্ণতারা শোভা পাইতেছে; যেন বিমল জলে নীল শতদল ভাসিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও সমুজ্জ্বল। তাহাতে মুক্তকেশীর পবিত্র ভাব প্রতিভাত হইতেছে।

মুক্তকেশীর ভ্রূযুগ আকর্ণবিস্তৃত; সুবক্র এবং কেশাপেক্ষা সমধিক কৃষ্ণ। নাসিকা সরল ও বদনোপযোগী। ওষ্ঠাধর সদা পরস্পর সংমিলিত, হাস্যময়, আনন্দোদ্দীপক; যেন নির্ম্মল যুগল বিম্ব, যখন মধুমাখা হাস্য আসিয়া উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিত, তখন তন্মধ্য দিয়া কুন্দবিনিন্দিত, সমগ্র নির্ম্মল দুই শ্রেণী দন্ত দেখা দিত। তাঁহার বাহুযুগল অতীব সুকুমার; যেন নবনীত-বিনির্ম্মিত। মনুষ্যশরীরে অস্থি থাকে, কিন্তু মুক্তকেশীর বাহু দেখিলেই এমনই বোধ হইত যে, তাহা অস্থিবিহীন। যখন মুক্তকেশী গৃহকর্ম্মসম্পাদনার্থ হস্তচালনা করিতেন, তখন তাহা ছিন্ন হইবে বলিয়া শঙ্কা জন্মিত অথবা যদি তাঁহার হস্তে কোনরূপ একটু চাপ পড়িত, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া বসিবে অথবা এককালে দলা হইয়া যাইবে বোধ হইত। মুক্তকেশীর শরীরের আয়তন বেশ দীর্ঘ ছিল; কিন্তু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তদুপযোগী সংবর্দ্ধিত হওয়ায় তাহার দৈর্ঘ্য শোভারই কারণ হইয়াছিল। তাহার শরীর এরূপ পরিণত, এরূপ প্রফুল্ল, বসন্তজাত নবলতিকার ন্যায় এরূপ সতেজ যে, মুক্তকেশী তৎপ্রভাবেই এই বয়সে পূর্ণ যুবতী।

মুক্তার কণ্ঠস্বর অতীব সুমিষ্ট। তাহা একবার শুনিলে নিরন্তর তাহাই শুনিতে ইচ্ছা জন্মিত; তাহাতেই কর্ণকে আবদ্ধ রাখিতে বাসনা হইত। যখন নিদারুণ শোক-শেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ভয়ানক যাতনা দেয়, যখন হিংস্র প্রতিবেশীর হিংসা-নিরঞ্জন মানব-মন নিতান্ত বিচলিত থাকে, যখন দুরাকাঙ্ক্ষা কখন রাজসিংহাসন, কখন কুবের-ভাণ্ডার দেখাইয়া মনুষ্যকে নিতান্ত অস্থির করে, যখন নানাবিধ পার্থিব যাতনা সমবেত হইয়া মনুষ্যকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপাচরণে পরামর্শ দেয়, তখন এমন কোন স্বর আছে কি, যাহা শ্রবণে হৃদয়ের যাবতীয় যাতনা অপনীত হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হয়, আর সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেই স্বর শ্রবণের নিমিত্ত মন উদাস হয়? এমন স্বর আছে কি? যদি মনুষ্য-স্বরে সেরূপ ক্ষমতা থাকা সম্ভব হয়, তবে মুক্তকেশীর স্বর সেই অনুযায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন; বিদুষী না হইয়াও মুক্তকেশীর মন অনেকাংশে সমুন্নত ছিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভা ছিল, তৎপ্রভাবে তিনি সহজেই অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে শয্যোত্থিত হইয়া এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবজন্তু, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষলতাদির পরিবর্ত্তন ও প্রকৃতির শোভা দর্শনে তাঁহার আনন্দ জন্মিত। তাঁহার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ ছিল; কখন কেহ তাঁহার উপর একটু কুপিতদৃষ্টি অর্পণ করিলে অমনিই তাঁহার লোচন বিস্ফারিত হইয়া জলধারাকুল হইত। এই জন্য মুক্তকেশী জীবনমধ্যে কখন কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাতায়নে

"Two of the fairest in all the heaven
Having some business do entreat her eye
To twinkle in their spheres till they
return,"

Shakespeare (Romeo Juliet)

উমাপতির মাতুল হরিহর রায় দেখিতে শ্যামবর্ণ ও দোহারা ছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষের কিঞ্চিদধিক হইবে। তাঁহার মাথার চুলগুলি গোল

করিয়া কাটা; বয়সধর্ম্মে অধিকাংশই সাদা, তন্মধ্য হইতে একটি সুদীর্ঘ শিখা বিনির্গত ছিল।

তিনি বড় সাদা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের গুণে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গ্রামে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল। কেহই তাঁহার অমতে অথবা তাঁহার অসন্তোষজনক কোন কার্য্য করিত না। হরিহর সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন।

তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার সন্তান হয় নাই, এমন নহে; তাঁহার দুটি পুত্র-সন্তান ছিল, বড় সন্তানটির বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের কিছু কাল পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিদেশগমন করেন। সেই অবধি আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত অনুসন্ধানের ত্রুটি করেন নাই; দারুণ শোকের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বড় পুত্রবধূ সংসারেই ছিলেন। হরিহর অগত্যা মনের বেগ সংবরণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রটি লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার সে সৌভাগ্য সহ্য করিতে পারিল না; নির্ম্মম হইয়া তাঁহার অকস্থিত পুত্রকে অকালে হরণ করিল। ইহার পরে হরিহর সংসারত্যাগী বিরাগী-প্রায় হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে বড় ভালবাসিত বলিয়া এবং উমাপতির বিবিধ অনুরোধে তিনি আবার সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে উমাপতিই তাঁহার সর্ব্বস্ব। উমাপতিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাহারই মুখ তাকাইয়া হরিহর সংসারে থাকিতেন; উমাপতিও শোকাতুর মাতুলকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। মাসের মধ্যে পনর দিন মাতুলালয়ে এবং পনর দিন বাটীতে থাকিতেন। তিনি উভয় পরিবার এক স্থানে করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা অবিধেয় বিবেচনায় সম্পন্ন হয় নাই। সর্ব্বদা গোপালপুরে যাতায়াত হেতু উমাপতি তথায় উত্তমরূপে পরিচিত ও সাধারণের স্নেহভাজন ছিলেন।

পাঁচ দিন অতীত হইল, উমাপতি মাতুলালয়ে আসিয়াছেন। অদ্য মধ্যাহ্নসময়ে মাতুল ও ভাগিনেয় একত্র আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার করিতে করিতে নানাবিধ কথা হইতেছে। উমাপতি সে দিন মুক্তকেশীকে বিপন্মুক্তা করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা হইল। ভট্টাচার্য্য অতি নিরীহ ও ভদ্রলোক, এ কথা হইল। এত দিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় উমাপতির মাতুল কহিলেন, "তাহার বিশেষ কারণ আছে। তাহা তুমি জানিতে পারিবে।"

উমাপতি নীরব রহিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তায় আহারাদি শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে উমাপতি ভ্রমণে নির্গত হইয়া ভট্টাচার্য্য ভবনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে নাই। ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসিতে দিলেন। তিনি বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন স্থির হইল না—কেন? তিনি যে উদ্দেশে যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই হৃদয়েশ্বরী কোথায়? তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তিনি যে প্রকোষ্ঠে সে দিন নিদ্রিত ছিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গ সহকারে যে বাতায়নে মুক্তকেশীর চন্দ্রানন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই দিকে তিনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টবস্তু সমুদায়ের ছায়া হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্লবেশ ধারণ করিল। তিনি অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া দুইটি বিশাল সহাস্য নয়ন দেখিতে পাইলেন; সে নয়ন দর্শনে উমাপতি বুঝিলেন যে, তাহা মুক্তকেশীর সম্পত্তি। তিনি তন্ময় হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন; যত দেখেন, ততই দর্শনেচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। এই সময় উমাপতিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ব্রাহ্মণী একটু প্রয়োজনসম্পাদনে গমন করিলেন। উমাপতি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার তীব্র দৃষ্টি বাতায়নের প্রতি স্থির হইয়া থাকিল। নিম্নে একটি কুকুর শয়ন করিয়া ছিল। সে এই সময় একবার ডাকিয়া উঠিল। উমাপতি তাহা দেখিতে একবার মুখ ফিরাইলেন। দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়া আবার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন—দেখিলেন, বাতায়ন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্য দিয়া প্রফুল্ল হাস্যময়ী সুন্দরী মুক্তকেশীর সম্পূর্ণ বদন উচ্ছাসোন্মুখী প্রবাহিনীর ন্যায় হাস্যময়ী। উমাপতি একচিত্তে সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। বদন অবনত হইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইল না।

এই সময় ব্রাহ্মণী উমাপতির জন্য জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি উমাপতিকে জলখাবার দিয়া মুক্তকেশীকে সম্বোধন করিয়া জল ও তাম্বুল আনিতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা মুক্তকেশী মাতৃ-আজ্ঞা-সম্পাদনে

আগমন করিলেন। তিনি জল ও পান আনিয়া মাতার নিকটে দিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "আমি কি করিব, উমাপতিকে দেও।"

অবনতমুখী মুক্তকেশী উমাপতিকে দিবার নিমিত্ত জল ও পান লইলেন। দারুণ লজ্জাজনিত সঙ্কোচে জল-সহ তাম্বুলপাত্র তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইয়া গেল। স্মিতবিকসিতাননা মুক্তকেশী সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "আ পাগলি! এত লজ্জা কি?"

তিনি স্বয়ং উঠিয়া পুনরায় জল ও পান আনিতে গমন করিলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর সলজ্জ মধুর ভাবটি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিলে উমাপতি জল খাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেন, পরে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিয়া বাটী আসিলেন। আসিবার সময় তিনি পুনরায় মুক্তার পবিত্র মুখ দর্শন করিতে পাইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-সম্বন্ধে

"O, two such silver currents, when
thy join
Do glorify the bunks that bound
them in."
—Shakespear. (King John)

কালিদাস ভট্টাচার্য্য পরামর্শের সপ্তাহদ্বয় পরে হরিহরের নিকট উমাপতি ও মুক্তকেশীর বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব করেন। উমাপতির মাতুল সাদরে সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই দিন হইতে প্রত্যেকে অপরকে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবাহ-সংঘটনে কোন পক্ষেই কোন বাধা নাই। যে দিন প্রস্তাব হইয়াছিল, হরিহর সেই দিন সপ্তগ্রামে তাঁহার ভগ্নী উমাপতির জননীর নিকট লোক দ্বারা সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়া সম্মতি চাহিলেন। উমাপতির জননী অতি সৎস্বভাবা পুরন্ধ্রী। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহার সহোদরই উমাপতির অভিভাবক। প্রকৃতপক্ষেও হরিহর সর্ব্বাংশেই উমাপতির অভিভাবক ছিলেন। এমন স্থলে উমাপতির মাতা তাঁহার সোদর-প্রস্তাবিত সম্বন্ধে অসম্মতি দিবেন কেন? তিনি সানন্দে অনুমোদন করিয়াছিলেন। বিবাহ-সম্বন্ধে ভাবী পুত্রবধূর স্বভাব ও সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রধান কামনা। হরিহর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যে কন্যার সহিত উমাপতির বিবাহসম্বন্ধ হইতেছে, বিবাহ হইলে দেখিতে পাইবে, সেটি দেবী কি মানবী নির্ণয় করা কঠিন। পাত্রীর কিছু বয়স হইয়াছে, তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্টা ভিন্ন অসন্তুষ্টা হন নাই। কারণ, তাঁহার পুত্রের যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে তদনুরূপ পুত্রবধূ হওয়াই আবশ্যক। আর তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত। এ সময়ে উপযুক্ত পুত্রবধূ হইলে অনেকাংশে তিনি সংসারচিন্তা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিবেচনায় তিনি সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

বিবাহ স্থির হইয়া রহিল। কোন পক্ষেই কোন গোল থাকিল না। উমাপতি সকল কথা জানিতে পারিলেন। যে মুক্তকেশীকে তিনি আরাধ্য দেবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, যে মুক্তকেশীর মধুরতাপূর্ণ বাক্য-সুধা-পানার্থ তিনি পিপাসিত হইয়া আছেন, যে মুক্তকেশীর অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়পটে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে, যে মুক্তকেশীর গুণ-মন্ত্রে তিনি মুগ্ধ হইয়া আছেন, সেই মুক্তকেশী—সেই স্বল্প-লজ্জা, চারুহাসিনী, পবিত্রা মুক্তকেশী অনায়াসেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন, ইহা কি তাঁহার অতুল আনন্দের কারণ নহে? উমাপতির সুখের সীমা রহিল না। কবে সে শুভদিন সমাগত হইবে, যে দিন তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরী মুক্তাকে নির্ব্বিঘ্নে আপনার বলিয়া জীবন জুড়াইতে পারিবেন, উমাপতি সেই সর্ব্বসুখপ্রদ শুভদিন-সমাগমের নিমিত্ত জলদবিগলিত জলধারাকাঙ্ক্ষী সতৃষ্ণ চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভ্রান্ত লোকেরা চিন্তামাত্রকেই ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেটি নিতান্ত বুঝিবার ভুল। চিন্তা সে সময়ে সময়ে হিতকারিণী সখীর ন্যায় চিত্তবিনোদনের প্রধান সাধন হয়, এই সময় একবার উমাপতির হৃদয়স্থিত চিন্তা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে। উমাপতি নবদ্বীপে নবকুমারের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্যামাসুন্দরীকে সমস্ত কথা জানাইতে বলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

শত্রু-হস্তে

"——— Revenge is now the cud
That I do chew—I'll challenge him."
—Beaumont and Flether.

একদিন উমাপতি সন্ধ্যার অত্যল্পকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে ব্যস্ত হইয়া মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন আছে। সময়ে সময়ে চপলা বিদ্যুদ্দেবী পতির সহিত রঙ্গরস করিতে করিতে বিজলীর ছটা বাহির করিতেছেন। দারুণ অন্ধকারে সম্মুখের মনুষ্যও লক্ষ্য করা যাইতেছে না। পথে জন-প্রাণী নাই; যাহারা বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র ছিল, তাহারাও অকালে জলদোদয় লক্ষ্য করিয়া বাটী প্রত্যাগত হইয়াছে। একে দারুণ অন্ধকার, তাহাতে আবার নৈদাঘ ঝটিকা। কাহার সাধ্য পথে চলে? সময়ে সময়ে বিদ্যুতালোক না থাকিলে উমাপতি কোন ক্রমেই পন্থা-নির্ব্বাচনে সমর্থ হইতেন না। মেঘের গর্জ্জন এত ভয়ানক যে, প্রতি শব্দেই বোধ হইতেছে যেন এইবার শিরে অশনিসম্পাত হইল। ফলতঃ ভীষণতার যত কিছু সামগ্রী আছে, সকলই যেন সমবেত হইয়া এই সময়ে প্রকৃতিকে রণরঙ্গিণী-বেশে সাজাইয়াছে। প্রকৃতি বিদ্যুতালোকে হাসিতেছেন, কিন্তু সে হাসিতে ভয়াকুল জনগণের প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে।

যখন উমাপতি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া আসেন, তখনও মেঘের এমন অবস্থা হয় নাই। দেখিতে দেখিতে মেঘের এই ভয়ানক বেশ হইল। উমাপতি দৌড়িতেছেন; আর একটি পাক অতিক্রম করিতে পারিলেই তিনি গৃহে পৌঁছিতে পারেন। এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। বনের পরেই একটি প্রকাণ্ড আম্র-কানন। তাহার পরেই তাঁহার মাতুলের আবাস।

উমাপতি অতিশয় দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার গতিরোধ হইতে লাগিল। বিদ্যুৎ সাহায্যে এককালে অনেকখানি পথ দেখিয়া লইতেছেন ও আবার প্রাণপণে ছুটিতেছেন। এইটুকু পার হইতে পারিলে তিনি আশ্রয় পান ও নিশ্চিন্ত হন। এই সময় একটি ভয়ানক ঘটনা তাঁহার গতিরোধ করিল। তিনি আপন মনে দৌড়িতেছেন, এমন সময় সম্মুখ হইতে কে কহিল, "আর যাইতে হইবে না, দাঁড়াও!"

বক্তার স্বর অতি প্রচণ্ড ও কর্কশ। উমাপতি সহসা সে স্বর শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন;—কহিলেন, "কে তুমি?"

বক্তা পুনরপি পূর্ব্ববৎ ভীষণ স্বরে কহিল, "সে পরিচয় পরে হইবে, এক্ষণে কথা শুন।"

এই সময় একবার বিদ্যুৎ হইল উমাপতি দেখিলেন, অরণ্যমধ্যে যে দুরাচারের হস্ত হইতে তিনি মুক্তকেশীকে রক্ষা করেন এবং যাহাকে একবারে প্রাণে না মারিয়া একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখেন—এ সেই দুরাচার! উমাপতি চমকিলেন। তিনি দেখিলেন, হতভাগা একক নহে; তাহার সঙ্গে তাহারই ন্যায় আরও পাঁচ জন সহচর আছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার উপর পাষণ্ডের নিতান্ত ক্রোধ জন্মিয়াছিল, সুতরাং সে অধুনা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। এক্ষণে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। এই বিবেচনায় যেমন তিনি পলায়নে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, উমাপতি তাহাকে সবলে দূর করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই সকলে আসিয়া উমাপতিকে বেষ্টন করিল। তিনি আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে সময় পাইলেন না; দুরাচারেরা তাঁহার মুখ বন্ধ করিল। তিনি বন্দী হইলেন। উমাপতি নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা ঘটিল না। তাহারা তাঁহার হস্তপদাদি বদ্ধ করিল। উমাপতি সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন তাহারা তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করিল।

সংসারের এই গতি। এখানে কখন কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য পরম প্রীতিপদ ও সুন্দর দেখাইতেছে, পরক্ষণেই তাহা এমনই হইতে পারে যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণা জন্মে। মনুষ্য এখনই আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়া আশা-হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে উন্নতি-স্রোত বাহিয়া চলিতেছে, পরক্ষণেই হয় ত কোন অদৃশ্য বিপদাবর্ত্তে পতিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইতেছে। সংসারের কিছুই নিত্য নহে। কল্য প্রভাতে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ-কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল রহিয়াছেন, সহসা প্রত্যূষে উঠিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজ্য-বিনিময়ে তাঁহার নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ

বন-নির্ব্বাসন স্থির হইয়াছে। রাম রাজা না হইয়া বনবাসী হইলেন। পূর্ণগর্ভা জানকী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী হইয়া পরমানন্দে সময়পাত করিতেছেন, সহসা তাঁহার অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। রাম তাঁহাকে বনবাসে দিলেন। দিগন্ত-বিজয়ী ত্রিলোকত্রাস দশানন আপনাকে অমর জ্ঞান করত অপ্রতিহত প্রভাবে যথেচ্ছাচরণ করিতেছেন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সবংশে রামের হস্তে বিনষ্ট হইলেন। বাসববিজয়ী মেঘনাদ প্রাণোপমা পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে রামবিজয়ার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি জানিতেন, জগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সংস্কার বৃথা হইল। আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল না। বারণাবতস্থ অমোঘ কৌশলসম্পন্ন জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মহানন্দে মগ্ন। রাজ্যলাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগের এ সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। সেই পাণ্ডবদিগের হস্তেই তাঁহাদের জীবনলীলা শেষ হইল। এইরূপ অনিশ্চিত অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা সংসারে কখনই বিরল নহে। পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, তাহাতেও তদ্রূপ ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। লাহোরপতি অনঙ্গপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সাহায্য ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া গজনিপতি দেবদ্বেষী মামুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার জয় স্থির-নিশ্চিত হইল। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন না। জয়ের পরিবর্ত্তে অনঙ্গপাল পরাজিত হইলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত সমবেত করিয়া দৃশদ্বতী নদীর তীরে পটমণ্ডপ সংস্থাপন করত সগর্ব্বে বিপরীতপরিস্থিত শত্রু গোরপতি মহম্মদকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু এ গর্ব্বের পরিণাম কি হইল? গোরপতি জয়লাভ করিলেন; দিল্লীশ্বর পরাজিত হইলেন। যৎকালে দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিপক্ষ ইংরেজ-পক্ষনায়ক সুচতুর ক্লাইবের সহিত সমর-নায়ক মোহনলালের অসামান্য যুদ্ধচাতুর্য্য দর্শনে পট মণ্ডপ হইতে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং স্বীয় জয়ের সন্দেহ নাই দেখিয়া আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছিলেন না, তখন সহসা নীচাশয়, নিস্তেজ মিরজাফরের প্ররোচনায় সেনাপতিকে রণে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন; অমনই বিপক্ষেরা সবলে প্রত্যাবৃত্তগণকে আক্রমণ করিল। বঙ্গের সৌভাগ্য-সূর্য্য সেই দিনাবধি সম্পর্কশূন্য সুদূরস্থিত ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী ইংরেজজাতির আশ্রিত হইলেন। আর সিরাজউদ্দৌলা এত আশা-ভরসা করিয়াছিলেন, তাহা কি হইল? শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। ইতিহাসে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহার বিপদ্ হয় না। আমরা এ কথা স্বীকার করি না, সময়ে সময়ে এমনই দুর্জ্জ্ঞেয় পথ অবলম্বন করিয়া বিপদ্ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে যে, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা মনুষ্য-সাধ্যের অতীত।

পার্থিব পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে কি ব্যবস্থা আছে, তাহা কে জানে? তাহা জানিবার উপায় নাই এবং তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইবার পন্থা থাকিলে সংসারে ভয়ানক গোলযোগ হইত। সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া যাবতীয় সুব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিত্রালয়ে

"And yet a father! think, I am your child!
Turn not your eyes away—look on me kneeling;
Now curse me if you can, now spurn me off"
—Congreve (Mourning Bride)

পদ্মাবতী যখন শুনিলেন যে, সহসা নবকুমার ও শ্যামা বিপদাপন্ন হইয়া নবদ্বীপে গমন করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন; ভাবিয়া দেখিলেন যে, নবকুমারের অবর্ত্তমানে এক্ষণে সপ্তগ্রামে অবস্থান বৃথা। নবকুমারের পুনরায় সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমনমধ্যে তিনি আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। এ জন্য সপ্তগ্রামের ভবনে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

আমরা আমাদের পুস্তকের এ অংশে পদ্মাবতীকে তাঁহার যাবনিক নাম লুৎফ-উন্নিসা বলিয়াই ডাকিব, লুৎফ-উন্নিসা পুনরায় যবন-সংসর্গে চলিলেন তখনকার লুৎফ-উন্নিসা ও এখনকার পদ্মাবতী এতদুভয়ে প্রভেদ বিস্তর। লুৎফ-উন্নিসা যে সকল বিদ্যাপ্রভাবে এককালে ভুবনমোহন জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছেন, এক্ষণে সে সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় চপলতা নাই। সে সকল ঘৃণিত মনোবৃত্তিকে তিনি স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে এক্ষণে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মনের সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে নীতিজ্ঞানাভাবে তাঁহার হৃদয় প্রস্তরাপেক্ষাও নীরস ও শুষ্ক ছিল, এক্ষণে তাহা নীতি-সুধায় অভিষিক্ত হইয়াছে, যে সকল ঘৃণিত জঘন্য মনোবৃত্তি তাঁহাকে রমণীকুলের কলঙ্কস্বরূপ করিয়াছিল, সে সকলের পরিবর্ত্তে বিবিধ সদ্‌গুণ এক্ষণে তাঁহাকে পুজনীয়া দেবীস্বরূপা করিয়াছে। তিনি এত দিন অজ্ঞতা ও মোহের কারাগারে বন্দিনী ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান ও বিবেকের রাজ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা এত দিন ধর্ম্ম-বিগর্হিত সামান্য সুখে প্রমত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ধর্ম্ম-সম্মত পবিত্র সুখের আস্বাদন পাইয়াছেন। তিনি এত দিন আপনাতে আপনি মোহিত হইতেন, এক্ষণে আপনাকে আপনি বিজাতীয় ঘৃণা করেন। তিনি এত দিন সমগ্র ভারতবর্ষকে পদতলস্থ ও বাদশাহকে কিঙ্কর করিতে অভিলাষিণী ছিলেন, এক্ষণে দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরণাশ্রিত হইয়া পর্ণকুটীরে বাসার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সকল কারণে বলিতেছি, এখন আর সে লুৎফ-উন্নিসা নাই। তিনি পবিত্র সুখের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন এবং তাহা আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। নবকুমার তাঁহাকে পত্নীভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন, নবকুমার তাঁহার জন্য কাঁদিতেছেন, নবকুমার তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন। জগতে আর তাঁহার কি প্রার্থিত আছে? নবকুমারের বিশুদ্ধ প্রণয়মাত্র তাঁহার প্রার্থনা, তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং লুৎফ-উন্নিসার আশা সফল হইয়াছে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আর কিছু চাহেন না। তবে লুৎফ-উন্নিসা আবার আগ্রা যাইতেছেন কেন? আর তথায় তাঁহার কি আবশ্যক? ভোগ-সুখে তিনি তো জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তবে কেন? সংসারে স্নেহ-মমতা কে ত্যাগ করিতে পারে? যে তাহা পারে, তাহার অন্তঃকরণে কখনই প্রণয় জন্মিতে পারে না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় এক্ষণে প্রণয়-পরিপূর্ণ; সুতরাং তাঁহার হৃদয় স্নেহ, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিতে পূর্ণ। সেই কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাকে এক্ষণে আগ্রার দিকে আকর্ষণ করিল।

লুৎফ-উন্নিসা আগ্রা গমন করিয়া প্রথমে তাঁহার পিতৃভবনে গমন করিলেন। সে স্থানে পদার্পণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। লুৎফ-উন্নিসার যৎকালে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় তাঁহার চরিত্র নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠে। এই জন্য তাঁহার পিতা বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেন। লুৎফ-উন্নিসাও তখন তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই। অব্যাঘাতে ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইব ভাবিয়া তিনি তাহাতে

আনন্দিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন চিরদিন সমান থাকে না। মন্দ ভাল হইতে অথবা ভাল মন্দ হইতে অধিক সময় লাগে না। লুৎফ-উন্নিসা এখন মন্দ হইতে ভাল হইয়াছেন। পুনরায় পিতা-মাতার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কন্যা কখন কোথায় থাকেন, তিনি তাহার সন্ধান করিতেন। সম্প্রতি বৎসরেক লুৎফ-উন্নিসা কোথায় আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, তিনি এত দিন সপ্তগ্রামে ছিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, তথায় তাঁহার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল মহাশয় বসিয়া স্ত্রীর সহিত কি কথা কহিতেছেন। বহু দিনের পর প্রিয়তমা দুহিতাকে পুনর্দ্দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নেহ লুক্কায়িত হইবার সামগ্রী নহে। স্নেহভাজন যদি দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার উপর রাগ হয়, তাহার দোষ-সংশোধনের জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাই বলিয়াই অন্তর হইতে স্নেহ লোপ পায় না। চিরদিনের স্নেহ কি এক দিনে লোপ হয়? বিশেষতঃ অপত্য-স্নেহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। দোষী সন্তানকে জনক জননী বিবিধ শাস্তি দেন বটে, কিন্তু মনে মনে সততই তাহার কল্যাণ-কামনা করেন। এই স্নেহধর্ম্মে ঘোষাল ও তাঁহার স্ত্রী পরিত্যক্তা দুহিতাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু কন্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ভবিয়া সে আনন্দ বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন না। লুৎফ-উন্নিসাও তাঁহাদের অন্য কথা কহিতে না দিয়া একেবারে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পাদোপরি বদন রক্ষা করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতা চমৎকৃত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রায় আট নয় বৎসর পিত্রালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি একবারও পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ অথবা তাঁহাদের সহিত সম্মিলনকামনা করেন নাই, অদ্য এত দিনের পর সেই কন্যার এতাদৃশ ভাবান্তর কেন হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ঘোষাল হাত ধরিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা না উঠিয়া সেই অবস্থাতেই কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রামগোবিন্দ ঘোষাল জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?"

লুৎফ-উন্নিসা উঠিয়া বসিলেন এবং ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া, এই কালের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় অবিকল বিবরিত করিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। সেই লুৎফ-উন্নিসার যে এরূপ মতি হইয়াছে, ইহাতে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

ঘোষাল কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! এক্ষণে স্নানাহার কর। আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্য তুমি আমাকে যে পরিমাণে আনন্দিত করিলে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঈশ্বর তোমাকে চিরায়ুষ্মতী করুন।"

লুৎফ-উন্নিসা তাহার পর মাতার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রামগোবিন্দ কিয়ৎকাল পরে বাহিরে গমন করিলেন।

দুই দিবস পরে ঘোষাল স্বীয় স্ত্রী ও দুহিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পদ্মা! তোমার যে এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে এবং তোমাকে যে তোমার স্বামী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতুল আনন্দের বিষয়। নবকুমারের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। তোমার কখন সামান্য কষ্টভোগ করাও অভ্যাস নাই; তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইবে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "পিতা, জীবন অশেষ রাজভোগসম্ভোগে আতবাহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার অভাবে আর কোন ক্লেশ নাই। সেই সকল অজ্ঞানকৃত কার্য্য স্মরণে এক্ষণে দারুণ যন্ত্রণা পাই মাত্র। পাপের ভার সহ্য হয় না। এ জীবন তুষানলে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।"

কন্যার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া ঘোষাল সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন, "তবে এক্ষণে কি স্থির করিতেছ?

পদ্মা। স্বামি-পদসেবায় জীবন ত্যাগ করিব।

ঘোষাল। তুমি যবনী, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন কেন?

পদ্মা। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনার আশীর্ব্বাদে স্বামী অধুনা দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করি।

ঘোষাল। নবকুমার আবার বিবাহ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। সে স্ত্রী কোথায়?

পদ্মা। তিনি জলমগ্না হইয়াছেন।

ঘোষাল। ইচ্ছায়?

পদ্মা। না; দৈবাৎ।

ঘোষাল। নবকুমারের সংসারে আর কে আছেন?

পদ্মা। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার শাশুড়ীর পরলোক হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না বোধ হয়। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাতার মৃত্যুর পর কাশীবাসিনী হইয়াছেন; এক্ষণে আমার স্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী মাত্র সংসারে আছেন।

ঘোষাল চিন্তিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। পদ্মা তাঁহার একমাত্র সন্তান। পদ্মা ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া বিদায় চাহিতেছে, ইহা জানিয়া তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা। ভাল, আপাততঃ তো কিছুদিন আমার নিকট থাক, তার পর যে হয় বিবেচনা হইবে।"

এই বলিয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা ও তাঁহার জননী বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জগদালোকে

"জে নাম এ নুর এ জাহাঁ বাদশা বেগম জার,
বা'বা হুকুম জাহাঁগীর সাঃ ইয়াফৎ সাদ জওয়ারদ।"*

পরদিন প্রত্যূষে লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের সহিত সাক্ষাদভিপ্রায়ে বিনির্গত হইলেন। অদ্য তিনি আবার যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, কিন্তু বেশভূষা করিলেন না। যে উদ্দেশ্যে বেশ ভূষার প্রয়োজন, সে উদ্দেশ্য তাঁহার মন হইতে একবারে তিরোহিত হইয়াছে।

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিল না। বহুদিন পরে তাঁহাকে পুনরাগত দেখিয়া দৌবারিকাদি সভয়ে সেলাম করিতে করিতে পথ মুক্ত করিয়া দিল। তাহারা তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। যে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্বে সংসারজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন সকলে ভূষিতা থাকিতেন এবং যিনি অত্যুৎকৃষ্ট উজ্জ্বল মূল্যবান্ বস্ত্র সকল পরিধান করিতেন, তাঁহার শরীরে এক্ষণে ভূষণমাত্র নাই এবং তাঁহার পরিধেয় বসন সামান্যমাত্র। তাহাদের বিস্ময়ের আরও কারণ—পূর্ব্বে যে লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের সহিত সতত প্রীতি সহকারে বাক্যালাপ করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিতেন না, তিনি অধুনা ভৃত্যদিগের সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এবং তাহাদের প্রদত্ত সম্মানের প্রতিসম্মান করিতেছেন।

লুৎফ-উন্নিসা শুনিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানের সুবাদার সের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসা এক্ষণে নুরজাহান (জগজ্জ্যোতিঃ) নাম ধারণ করিয়া বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইয়াছেন।* এক্ষণে লুৎফ-উন্নিসা জানিতে পারিলেন যে, মেহের-উন্নিসা কেবল নুরজাহান ও প্রধানা মহিষী এই নামে সন্তুষ্টা হন নাই, তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কোন বাদশাহ-মহিষী সে সকলের অধিকারিণী হন নাই। তাঁহার প্রশংসায় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী ছিলেন। লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে শুনিলেন শুদ্ধ রূপে নয়, গুণেও নুরজাহান অদ্বিতীয়া হইয়াছেন। তাঁহার প্রযত্নে সম্রাট্‌প্রাসাদে বিবিধ সুচারু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত, এখন আর তাহা নাই; সকল কার্য্য পরিষ্কার। শুদ্ধ ভবনমধ্যে নুরজাহানের আধিপত্য ছিল, এমন নহে, প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠে তিনি বাস করিতেন, তথা হইতে মোগলাধিকারের শেষসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে তাঁহার অসীম ক্ষমতাশালী হস্ত প্রকাশ পাইতেছে। জাহাঙ্গীর নামে বাদশাহ

---

* হিজরী ১০৩৪ অব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞাক্রমে নুরজাহানের নাম-সংযুক্ত যে মুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহার উপরে উহা ক্ষোদিত ছিল। নুরজাহানের আধিপত্য কতদূর প্রবল ছিল, তাহা উহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে; বঙ্গভাষায় উহার অর্থ এইরূপ; "বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় বেগম নুরজাহানের নামসংযোগে মুদ্রার শতগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইল।"

* ভারতের ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-বিবরণ পাঠ করিলে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

মাত্র। রাজ্যশাসনভার একপ্রকার নূরজাহানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে বলিলেও হয়। এক্ষণে নূরজাহানের আজ্ঞা ও সম্মতি ব্যতীত কোন বিধি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে না। ফলতঃ তাঁহার ক্ষমতা অসীম সকলেই তাঁহার মহিমা স্বীকার করে ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে। লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসাকে বাল্যাবস্থা হইতে জানিতেন, তাঁহার ভূলোকদুর্ল্লভ রূপও তিনি দেখিয়াছিলেন। সে অসাধারণ রূপ যুবরাজ সেলিমের (অধুনা, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের) নয়নাকর্ষণ করিয়াছে, তাহাও তিনি জানিতেন। মেহের-উন্নিসা সর্ব্বথা বাদশাহ-পত্নী হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী, এ কথাও তিনি বুঝিতেন। এক্ষণে তাঁহার এবংবিধ অমানুষী গুণাদি শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে যেমন উচ্চ স্থানে সমাসীন করিবার উপযোগী রূপ দান করিয়াছেন, তেমনই গোপনে তাঁহার হৃদয়ও তদুপযোগী মহৎ গুণসমূহে সুসজ্জিত করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি নূরজাহানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এতদ্ভিন্ন লুৎফ-উন্নিসা আরও জ্ঞাত হইলেন যে, নূরজাহান স্বামীর উপর অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে জাহাঙ্গীর প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে কখনই শয্যা ত্যাগ করিতেন না, নূরজাহানের অসামান্য শাসনপ্রভাবে তিনি এক্ষণে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন। যে জাহাঙ্গীর দিবস-রজনী বিলাস লালসায় ও সুখ-ভোগে রত থাকিতেন, তিনি এক্ষণে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়মাত্র আমোদে অতিবাহিত করেন, অবশিষ্ট সময় তাঁহাকে রাজ্যচিন্তায় ব্যয় করিতে হয়। যে জাহাঙ্গীর দিবা-রাত্রি সুরা পান-পাত্র-সংলগ্ন-বদন থাকিলে সুখী থাকিতেন, পত্নীর প্রখর শাসনে তিনি একরূপে পানদোষ ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। লুৎফ-উন্নিসা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জাহাঙ্গীরের এই সমস্ত দোষ যে কস্মিনকালে, কাহারও ক্ষমতায় বা কোন উপায়ে অপনীত হইবে, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। যে রমণীর ক্ষমতায় সেই জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবংবিধ উন্নত হইয়াছে, সে রমণী মানবী আকারে দেবী।

এতদ্ব্যতীত নূরজাহান নিতান্ত প্রিয়বাদিনী; তাঁহার অত্যন্ত অমায়িক ভাব। উচ্চপদ-জনিত মনে মনে স্বভাবতঃ যে একটি দুর্দ্দমনীয় রিপুর আবির্ভাব হয়, নূরজাহান একেবারে সে দোষবর্জ্জিতা। সকলের সহিত তাঁহার সমান ভাব। সকলের সুখের প্রতি তিনি সমান দৃষ্টি দিয়া থাকেন। মোগল-সাম্রাজ্যে কেহ দীন, দরিদ্র, অসুখী বা মূর্খ থাকে, ইহা নূরজাহান ভালবাসেন না। তাঁহার এই সকল স্বর্গীয় গুণে প্রজাবর্গ সকলেই একমনে তাঁহার দীর্ঘ-জীবন ও কুশল কামনা করে এবং মুক্ত-কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে।

লুৎফ-উন্নিসা এই সকল শুনিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বিধাতা মেহের-উন্নিসাকে যে সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে তদুপযোগী পদ পাইয়াছেন। তাঁহার নূরজাহান নাম সার্থক হইয়াছে।

নিকটস্থ এক জন দাসী তাঁহাকে একে একে এই সমস্ত সংবাদ দিতেছিল। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এক্ষণে বাদশাহ কোথায়?"

দাসী উত্তরিল, "এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই। এখন সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সভা হয়। বাদশাহ এক্ষণে মসনদে।"

লুৎফ-উন্নিসা দেখিলেন, সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বাদশাহের দর্শনপ্রাপ্তি অসম্ভব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "নূরজাহান কোথায়?" দাসী অঙ্গুলিভঙ্গী সহকারে নূরজাহানের প্রাতর্গৃহ দেখাইয়া দিল।

লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দাসী দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে ভারতসম্রাজ্যাধীশ্বরী অদ্বিতীয় রূপযৌবন-গুণাদি-সম্পন্না নূরজাহান স্বয়ং আসিয়া বাল্যসহচরী লুৎফ-উন্নিসার হস্তধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিনীপার্শ্বে

"চন্দ্রেণ চারুচরিতেন বিকাশিতং সৎ,
সঙ্কোচিতং ভবতি কিং কুমুদন্তমোভিঃ॥"

—বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্।

লুৎফ-উন্নিসা উপবিষ্ট হইলে নূরজাহান উপবেশন করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা সময়ে বাদশাহের প্রধানা

মহিষী হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সেই স্থান এক্ষণে নূরজাহান অধিকার করিয়াছেন। এককালে লুৎফ-উন্নিসা এমন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতিমুখে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী রাখিবেন না। এককালে লুৎফ-উন্নিসা রাজ্যের গতি ফিরাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন—তিনি যুবরাজ সেলিমের পরিবর্ত্তে তদীয় রাজপুত-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান খসরুকে মোগল-সাম্রাজ্যসিংহাসনে সমাসীন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এককালে অপরাপর বেগমেরা ভাবিয়াছিলেন যে, হয় তো তাঁহাদিগকে লুৎফ-উন্নিসার অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। আর এক্ষণে? এক্ষণে লুৎফ-উন্নিসা সে সুখকে তৃণজ্ঞান করেন। আর সে সুখ একায়ত্ত করা দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শেও তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। স্বেচ্ছায় তিনি তাঁহার কল্পিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্থানে মেহের-উন্নিসাকে বসিতে দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা তিনি মনেই বিলীন করিয়াছেন। রাজকীয় কার্য্য হইতে তিনি আনন্দে অপসৃত হইয়াছেন।

অদ্য লুৎফ-উন্নিসা ও মেহের-উন্নিসা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। অনেক দিনের পর আবার অদ্য সাক্ষাৎ। এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী নূরজাহান হইয়াছেন। আর যাঁহার নিমিত্ত সকলে এই আসন স্থির করিয়াছিল, তিনি কি হইয়াছেন? তিনি সে সকল ত্যাগ করিয়া জীবনের অন্যবিধ গতি অন্বেষণ করিতেছেন।

লুৎফ-উন্নিসার বদনে আনন্দ দেখা যাইতেছে। সংসারের প্রকৃতি অনুসারে সকল ঘটনা দর্শন করিতে হইলে লুৎফ-উন্নিসার আনন্দ দেখিয়া বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা হইবে না। তাঁহার মনের আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি সকল এক্ষণে কোথায় লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিককাল অসৎপথে বিচরণ করায় সৎপ্রবৃত্তি সকল সমূলে নির্ম্মূল হওয়াই সম্ভব। তাঁহারও প্রায় তাহাই হইয়াছিল; কিন্তু সহসা জ্ঞান-বারি গণ্ডপ্রায় সৎপ্রবৃত্তিসমূহের মূল সিক্ত করায় তাহারা পুনরঙ্কুরিত হইয়াছে। ধাতুকে অগ্নিদগ্ধ করিলে তাহা গলিত হইয়া পড়ে, তাহার অসারও অকর্ম্মণ্য অংশ সমুদয় ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায় এবং মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় অংশ অবশিষ্ট থাকে। তদ্রূপ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দ্রবীভূত করিয়াছে এবং তাঁহার অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ করিয়া সাধু ও শ্রেয়োবৃত্তি সকলকে সমুত্তেজিত করিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি যদি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বাল্যসখী মেহের-উন্নিসা ভারতবর্ষের সিংহাসনাধিকারিণী হইয়াছেন, ইহা তিনি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু আর তাঁহার সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আর তাঁহার জাহাঙ্গীরের হৃদয় হরণ করিবার চেষ্টা নাই, আর তাঁহার উচ্চপদের প্রতি দৃষ্টি নাই। তাঁহার যাহা লক্ষ্য, যাহা চেষ্টা, যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা তিনি পাইয়াছেন। এখন তিনি মেহের-উন্নিসার অভ্যুদয়ে আনন্দিত হইয়াছেন। যে বিধাতার অনুগ্রহে এ সকল মোহজাল হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে সেই সর্ব্বনিয়ন্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। তিনি মেহের-উন্নিসাকে পূর্ব্বে অবিশুদ্ধভাবে দর্শন করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি পবিত্র। তাহাতে স্নেহ, মায়া, মঙ্গলেচ্ছা ব্যক্ত হইতেছে। তিনি মেহের-উন্নিসাকে প্রিয় ভগ্নী মনে করিতেছেন। মেহের-উন্নিসাকে তিনি তাঁহার সুখ ও উন্নতির কারণ বিবেচনা করিতেছেন। যদি মেহের-উন্নিসার রূপ-যৌবন যুবরাজের নয়ন-পথে পতিত না হইত এবং যদি তদ্দর্শনে যুবরাজ মেহের-উন্নিসার প্রতি আসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদানীন্তন আশার পথ সকল অতি সহজ হইত, সুতরাং তিনি ক্রমশঃ অধিকতর মোহে জড়ীভূত হইতেন ও কদাচ সে সকল প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার বিপরীত ঘটায় তাঁহার সম্রাট-অন্তঃপুররূপ সুখ-কারাগার পরিত্যাগ করা সহজ হইয়াছে। অতএব মেহের-উন্নিসা তাঁহার পরমোপকারিণী; লুৎফ-উন্নিসা ইহা বুঝিতেছেন। তিনি সে জন্য মেহের-উন্নিসার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ, লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আর কুটিলতার লেশমাত্র নাই। তাঁহার হৃদয় সরলতায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়াছে। লুৎফ-উন্নিসার আনন্দিতা হইবার আরও একটি কারণ আছে। তিনি নূরজাহানের অসামান্য গুণাদি শ্রবণে বিমোহিত হইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিতেছেন,

নূরজাহানের ন্যায় গুণবতী রমণী বাদশাহের প্রধানা বেগম হইবার উপযুক্ত পাত্রী। নূরজাহান ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় মণি-কাঞ্চনে সংযুক্ত হইয়াছে। লুৎফ-উন্নিসা ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসার পরিবর্ত্তে তিনি যদি ঐ স্থান লাভ করিতেন, তাহা হইলে কি ভাল হইত?—না। নূরজাহানের দ্বারা যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা তিনি কখন করিতে পারিতেন না; সুতরাং মেহের-উন্নিসা প্রধানা মহিষী হইয়া ভালই হইয়াছে।

নূরজাহান লুৎফ-উন্নিসার কায়িক, মানসিক এবং বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসিয়া সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসাও বালসহচরী মেহের-উন্নিসাকে কত কথা জিজ্ঞাসিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ এইরূপ নানাবিধ কথায় সুখলাভ করিতে লাগিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, বাদশাহ সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রিয়বয়স্যার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাদশাহ সহ সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্রাট্-সকাশে

"ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য,
বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্‌পদালী।"
—রঘুবংশম্।

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীর-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান সহকারে অভিবাদন করিলেন। বাদশাহ বহুদিন পরে লুৎফ-উন্নিসাকে পুনর্দ্দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং সানন্দে লুৎফ-উন্নিসার কুশল-সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তদুত্তরে লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "বাদশাহের অনুগ্রহে এক প্রকার সমস্ত মঙ্গল বটে। বাদশাহ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে হতভাগিনী পুনরায় বিবাহিতা হইয়াছে, সুতরাং সে কুলস্ত্রী।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কি রহস্য লুৎফ-উন্নিসা?"

লুৎ। রহস্য নহে; সত্য। লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে বাদশাহের সহিত রহস্যের উপযুক্তা নহে।

বাদ। সত্য? কাহার সহিত বিবাহ হইল?

লুৎ। নূতন বিবাহ নহে। যে বিবাহ পূর্ব্বে হইয়াছিল, হতভাগিনীর দোষে এতদিন তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে অনেক যত্নে সেই স্বামীই দাসীকে পুনরায় চরণে স্থান দিয়াছেন।

বাদশাহ প্রথমে হাঃ হাঃ, শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তবে লুৎফ-উন্নিসা, এত দিনের পর আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইবে?"

লুৎফ-উন্নিসা নীরব।

বাদ। তোমার স্বামীর আর পত্নী আছেন?

লুৎ। ছিলেন, মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বাদ। তোমার স্বামীর নাম কি?

লুৎ। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদ। সপ্তগ্রামে তাঁহার নিবাস না?

লুৎ। আজ্ঞা হাঁ।

বাদ। তোমার স্বামী দেখিতে কেমন?

লুৎ। স্বামী কুরূপই হউন, আর সুরূপই হউন, অধীনীর চক্ষে তিনি এখন অনুপম রূপলাবণ্য-সম্পন্ন পুরুষ-রত্ন।

বাদ। তোমার স্বামী ধনবান্?

লুৎ। জঁাহাপনা! আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ দরিদ্র জাতি। তিনি ধনবান্ নহেন, তাঁহার অতি সামান্য অন্নবস্ত্রে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী বিষয় আছে।

বাদ। লুৎফ-উন্নিসা। তবে এত দিনের পর কি একবারে আমাদের মায়া ত্যাগ করিলে?

লুৎফ-উন্নিসা দীর্ঘশ্বাস সহকারে কহিলেন, "বিস্মৃত হওয়া সাধ্যাতীত।"

বাদ। তবে কি লুৎফ-উন্নিসা? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত দিনের পরিচয়, এত দিনের প্রণয় সকলই তুমি ভুলিতেছ? সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতেছ?

লুৎ। জঁাহাপনা! দুঃখিত হইবেন না। এ প্রকার গমন যদি আমার অপরাধ হয়, আপনার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার সুখের পথে আমাকে যাইতে দেন।

বাদ। তা হইবে না লুৎফ-উন্নিসা। প্রাণ থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

লুৎফ-উন্নিসা সজল-নয়নে কহিলেন, "বাদশাহ! মনকে দৃঢ় করুন। আমাকে লুৎফ-উন্নিসা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। পূর্ব্বের কথা সমস্ত

বিস্মৃত হউন। মনে করুন, কোন পরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতেছেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন, পাপের জলন্ত পাবকে আমার হৃদয় অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বাদশাহের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমায় জীবন দেন। বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইয়া যদি পুনরায় পাপসাগরে পতিত হই, আপনার সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে নিস্তারের উপায় নাই। আপনার দুই কথায় আমি যাহা ছিলাম, তাহাই হইতে পারি। চিরকাল পাপে মগ্ন থাকায় পাপ আমার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে। আমি সহস্র উন্নত হইলেও কখন এরূপ উন্নত হইতে পারি নাই যে, সহজে এ সুখের লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইব। আপনি যদি আমাকে প্রলোভন দেখান, আমার কি সাধ্য আমি তাহা ছিন্ন করিতে পারি? অতএব জাঁহাপনা, আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুখ আপনার হস্তেই রহিয়াছে। আমাকে চিরকাল ভালবাসেন, তাহা আমি বেশ জানি। সেই ভালবাসার সাহসেই বলিতেছি, এক্ষণে বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করুন। চিরপরিচিতা আশ্রিতা অবলাকে রক্ষা করুন, তাহার সুখের পথে তাহাকে যাইতে দেন।"

বাদশাহ নীরব। এ কথায় তিনি কি উত্তর দিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বদনে কিঞ্চিৎ ক্লেশের চিহ্ন ব্যক্ত হইল। লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহকে নীরব দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, "জাঁহাপনা! দাসীর কথায় আপনি ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতেছি। আপনাকে ক্লেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনি ক্লেশের সামগ্রী নহেন। তবে লুৎফ-উন্নিসা এত কথা বলিতেছে কেন? সে বাদশাহের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে। এক বৎসর পূর্ব্বে হইতে সে বাদশাহের প্রেমভিক্ষা করিত, কিন্তু এক্ষণে সে বাদশাহের নিকট সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেছে যে, বাদশাহ যেন তাহার প্রতি পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বিদায় দেন।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! আমি সকল সহ্য করিতে পারি। আমি অতি কঠিন-প্রাণ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহা আমি অবশ্যই সহ্য করিব, কারণ, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অবনতি-মুখে পতিত হও নাই, তুমি ক্রমশঃ উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতেছ। কিন্তু তুমি যে আমাকে ত্যাগ করিয়া কষ্টভোগ করিবে, তাহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? লুৎফ-উন্নিসা! মনে করিয়া দেখ—অপূর্ব্ব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া তোমার নিদ্রা হয় নাই, তোমার পদতলে ধূলিরেণু স্পর্শ করিয়াছে—আমি স্বয়ং রুমাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহাও তোমার মনঃপূত হয় নাই; মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল বিভিন্ন দেশ হইতে তোমার নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে তুমি সন্তুষ্টা হও নাই; বিবিধ দেশ হইতে বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট আহার্য্য সমানীত হইয়াও তোমার রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারি নাই; নিদাঘে তুষারবৎ হিম-গৃহে অবস্থান করিয়াও তুমি শান্তি-লাভ করিতে পার নাই এবং দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ছিল, তুমি তাহাকেও উপযুক্ত নফর বিবেচনা কর নাই। লুৎফ-উন্নিসা! অধুনা তুমি কদন্ন সেবন, জঘন্য স্থানে বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিবে। সে সকল মনে করিতে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়; অন্যে যাহা হয় ভাবিতে পারে; কিন্তু আমি তো তোমার এ সকল কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে জাহাঙ্গীরের ইন্দীবর-নয়নে অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হইল। এক সময়ে তিনি লুৎফ-উন্নিসাকে প্রাণের ন্যায় ভালবাসিতেন। এককালে এমন সময় ছিল, যখন, তিনি লুৎফ-উন্নিসাকে এক তিল না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই লুৎফ-উন্নিসা কষ্ট ভোগ করিবে, এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধুনা কেন না ভেদ করিবে?

লুৎফ-উন্নিসা অনেকক্ষণ বাক্যহীনা পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে কহিলেন, "বাদশাহ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ অসীম। আপনি আমার জন্য কাতর হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, অধীনা যখন দিল্লীশ্বরের বেগম ছিল, তখন বিধাতা তাহার হৃদয়ানুযায়ী সুখের ইচ্ছা সকল সৃজন করিয়াছিলেন। এক্ষণে অধীনা দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নী, অবস্থানুযায়ী কায়িক ক্লেশ সহিতে এক্ষণে কুণ্ঠিতা নহে।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা! তুমি কি সেই তুমি? কাল তোমাকে প্রশংসনীয়-রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। যাবতীয় সৃষ্ট

জীবের মধ্যে রমণী যে সর্ব্বপ্রধান, লুৎফ-উন্নিসা, অদ্য তোমার কথা শুনিয়া তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি তোমাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি; তুমি রমণীকুলের কমলিনী। ইন্দ্রিয়-ভোগলালসার সহিত মনের লৌহ-চুম্বক সম্বন্ধ। এককালে তোমার মন তাহাতে এত বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, তোমার অদ্যকার কথা সকল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার ন্যায় নারীর এতাদৃশ মতপরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা কে সহসা বিশ্বাস করিতে পারে? গত কথা সকল মনে হইতেছে,—নারীজাতিসুলভ চাপল্য ও চাতুর্য্যে তোমার হৃদয় পূর্ণ ছিল, কিন্তু তোমার অদ্যকার পবিত্র সরলতায় আমি বিমোহিত হইতেছি। আমি তোমাকে স্বর্গীয় দেবী বিবেচনায় ভক্তি ও আরাধনা করিব। তোমাকে তোমার অবলম্বিত পথ হইতে অতঃপর নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছ, তাহা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলময়। আমি সন্তুষ্ট ও সরলচিত্তে বলিতেছি, পূর্ব্বকালীন যে সকল দুশ্চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মনে ব্যথা জন্মিতে পারে, তাহা তুমি ত্যাগ কর, আমিও ত্যাগ করিতেছি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার চিত্ত উত্তরোত্তর উন্নত করুন। তোমাকে এরূপে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট কষ্ট হইবে, তাহা আমি অকাতরে সহিব। তোমার অন্তরে যে বিমল সুখ জন্মিবে, তাহাতেই আনন্দিত থাকিব।"

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের কথা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "বাদশাহ! আপনি অদ্য আমাকে সুখের সাগরে ভাসাইলেন। জাঁহাপনা! অধীনা দুর্দ্দমনীয়া মনোবৃত্তিপ্রভাবে আপনার নিকট হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন হইতেছে। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় যে এ ঘটনায় কোনরূপ যাতনা পাইতেছে না, তাহা মনে করিবেন না। অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখের আশায় আমি এ যাতনা উপেক্ষা করিতেছি।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসা। এককালে আমি তাহাই থাকিতাম। তোমাকে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম, তোমার কিঙ্কর ছিলাম, সেই অবধি আমি তোমারই ছিলাম, এখনও তাহাই রহিলাম। লুৎফ-উন্নিসা! তুমি অদ্য হইতে আমার সহিত ভিন্ন সম্বন্ধে পরিগ্রহ করিতে চলিলে, তোমাকে তাহা হইতে নিরস্ত করা অন্যায় ও অসম্ভব। তোমার সুখের পথে ব্যাঘাত জন্মাইব না। তোমাকে অবশ্যই বিদায় দিতে হইবে, সে জন্য আমার চিত্তের অবশ্যই সন্তাপ জন্মিবে। হৃদয় এত পাষাণ নহে যে, চিরকালের নিমিত্ত তোমার সহিত সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় করিতে অশ্রুবারি ত্যাগ করিবে না। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। যত দিন জীবন থাকিবে, লুৎফ-উন্নিসা! তত দিন তাহার সহিত আমার মানসপটে তুমি চিত্রিত থাকিবে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাঁহাপনা! দাসী কি কখন আপনাকে ভুলিতে পারিবে? দাসী দীর্ঘ কাল আপনার প্রসাদ ভোগ করিয়াছে এবং আপনার নিকটে কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, বাদশাহ! অদ্য তাহার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করুন!"

বাদশাহ কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিব কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে? সে যাহা হউক, লুৎফ-উন্নিসা, সময়ে সময়ে তোমার সংবাদ পাইব কি?"

লুৎ। দাসী সর্ব্বদা জাঁহাপনাকে পত্র লিখিবে। জাঁহাপনা তাহাকে দাসী বিবেচনায় সংবাদ দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে সে বড় আনন্দিত হইবে।

বাদ। তাহা বলিবার আবশ্যক কি?

লুৎফ-উন্নিসা পুনরায় বিদায় চাহিয়া কহিলেন, "অনেক বেলা হইয়াছে, আপনার কষ্ট হইতেছে; দাসীকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদশাহ নীরব। লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় ছল্ ছল্ করিতেছে। লুৎফ-উন্নিসার কষ্ট বোধ হইল।

জাহাঙ্গীর কহিলেন, "লুৎফ উন্নিসা! তোমাকে কি বলিব? বাহ্যে তোমাকে না দেখিলেও অন্তরে তোমাকে সর্ব্বদা দেখিব। মন সর্ব্বদা তোমার সহিত থাকিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন; তোমার সহিত পূর্ব্বে অন্যবিধ পরিচয় ছিল, তাহা যেন কদাচ উভয়ের মনে না হয়। আমাকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবে। তোমার পরিচিত, হিতৈষী, উপকারক মিত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে চাহি না। আমি পূর্ব্বে তোমার যেরূপ সুখেচ্ছু মিত্র ছিলাম, এখনও তাহাই থাকিব। যদি কখনও তোমার কোন উপকার সাধিতে পারি, তাহা আমি সন্তুষ্টচিত্তে করিব। লুৎফ-উন্নিসা! অদ্য আমার জীবনের কি ভয়ানক দিন! অদ্য আমি তোমার প্রেমরূপ মহারত্নের স্বত্বশূন্য হইলাম। এখন আমার একটি সুখের সামগ্রী থাকিল;

তোমার হৃদয় হইতে যে এককালে তাড়িত হইব না, এই আশাই সেই সুখ। ভরসা করি, তুমি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবে না। বিপদে হউক, সম্পদে হউক, কখন জাহাঙ্গীরকে বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুখে রাখুন।"

লুৎফ-উন্নিসা দেখিলেন, বাদশাহের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। তিনি আর অপেক্ষা করা অবিধেয় বিবেচনা করিলেন। তিনি আরও অনুভব করিলেন, তাহার মনও হিল্লোলিত হইতেছে। তাহা একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিতেছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, আর না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। সমুদ্র-হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহা কূল স্পর্শ করিবেই করিবে। জগতের এই নিয়ম। চিরদিন সমান নয়। তবে আর কেন? স্বভাবের গতি কে রুদ্ধ করিবে?

লুৎফ-উন্নিসা জাহাঙ্গীরকে বিনয় ও সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! দাসী শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইল। বোধ করি, এই সাক্ষাৎই শেষ।"

লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহের উত্তর-প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জাহাঙ্গীর সে স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "শেষ সাক্ষাৎ!"

এই বলিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণবদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লেখ্য-লিখনে

"ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে। এ চিরবিচ্ছেদে
এই সে ঔষধমাত্র, কহিনু তোমারে।"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (বীরাঙ্গনা)।

সেই দিবস দিবা দ্বিপ্রহরকালে লুৎফ-উন্নিসা বিশ্রামার্থ পিতৃভবনে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন। সে অবস্থায় বিরক্তি জন্মিল, অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতেও সন্তোষ সমুৎপন্ন হইল না, একখানি পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তক পারসী ভাষায় লিখিত। পুস্তকের প্রথম পত্র উন্মোচন করিয়া একটু পাঠ করিলেন, ভাল লাগিল না। দ্বিতীয় পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। এইরূপে এখানে একটু সেখানে একটু পাঠ করিতে করিতে অবশেষে একটি কবিতা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা কবিতাটি আর একবার পাঠ করিলেন। পুনরায় পাঠ করিলেন। পরিশেষে পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় একটি অঙ্গুলি রক্ষা করত পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া হাতে রাখিলেন ও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। তিনি পুস্তকখানি যথায় ছিল, তথায় রাখিয়া আসিলেন এবং লেখনী, মসী ও কাগজ আনিয়া একখানি পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহাকে পত্র? বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে তিনি অনেকক্ষণ পত্র লিখিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইতে থাকিল এবং তাঁহার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তিনি অঞ্চল দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি লেখনী স্থগিত করিতে লাগিলেন। অনেক পরে পত্রিকা সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা মুড়িত করিলেন। আবার কি মনে হইল, তাহা খুলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই ;—

"জাঁহাপনা!

অধীনী শ্রীচরণ হইতে বিদায়-গ্রহণ সময়ে আপনার সম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করে নাই, তজ্জন্য সে এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

বাদশাহ! এক জনের হৃদয় অপরকে দেখাইবার কোন উপায় আছে কি? তাহা হইলে লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ের কিরূপ অবস্থা, সে দেখাইত। তাহা হইলে আপনি দেখিতেন, হতভাগিনীর অন্তরে কি দুর্বিষহ বিষম অগ্নি জ্বলিতেছে। মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাপীয়সী সকল যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবে বোধ হয় না। কিন্তু পাপ-প্রমত্তা লুৎফ-উন্নিসার মৃত্যু আছে কি? বোধ করি, বিধাতা পাপের সীমা দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে মৃত্যুকে আমি প্রিয় মিত্র জ্ঞান করিতেছি; মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাকে ভয় করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। জাঁহাপনা, এ পাপজীবন আর একটুকুও রাখিতে ইচ্ছা নাই,

যত শীঘ্র জগৎ হইতে লুৎফ-উন্নিসার নাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল।

পাপানলে লুৎফ-উন্নিসার জীবন হু-হু শব্দে জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসা জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিবার নিমিত্ত পাপ হইতে পাপান্তর আশ্রয় করিয়াছে। শীতলতা কোথায়? তাহাতে বহ্নি-হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ তেজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগিনী জীবনের সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছে;—গত কার্য্য সকল অসার, নীরস, বহ্নি-চর্ব্বিত মরুভূমির ন্যায় পশ্চাতে পতিত রহিয়াছে।

এক দিন—কেবলমাত্র এক দিন লুৎফ-উন্নিসা জীবনের মধ্যে যে পরিমাণ শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—আমূল সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছে, আর কোন দিনই তদ্রূপ হয় নাই। যে দিন মন্দভাগিনী স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া তাহা নয়নজলে সিক্ত করিয়াছিল, জাঁহাপনা! হতভাগিনীর জীবনের কেবল সেই দিনই সুখের দিন।

বাদশাহ! যত পারেন, আমাকে বিস্মৃত হউন। লুৎফ-উন্নিসার পাপ নাম হৃদয়ে স্থান দিবেন না। লুৎফ-উন্নিসা পাপীয়সী, দুশ্চরিত্রা, কুলটা—মোগলসিংহাসনসমাসীন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। লুৎফ-উন্নিসাকে জাঁহাপনা যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে কেবল ভবদীয় মহৎ মনের পরিচয়। দাসী শ্রীচরণে অনেক দোষে দোষী আছে। তাহার নামের সহিত সে সকল মানসপট হইতে অপনীত করুন। দাসীর সহিত কখন আলাপ ছিল, তাহা মনেও করিবেন না। লুৎফ-উন্নিসা নামে জগতে কেহ আছে, তাহা মনে করিবেন না, তাহার সুখ-দুঃখ-চিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন না।

আর কাহাকে মনে করিয়া নারীকুলালঙ্কার প্রিয়-ভগ্নী নূরজাহানকে অযত্ন করিবেন না। নূরজাহান রমণীমণি, বাদশাহের ন্যায় পুরুষের উপযুক্ত পত্নী। তাঁহার রূপের সীমা নাই। দাসী নূরজাহানের রীতিনীতি দেখিয়া বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। ভগ্নীকে একবার আমার নাম স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে আমার শেষ বিদায় প্রার্থনা করিবেন।

জাঁহাপনা! আমি এক্ষণে পতিপদোদ্দেশে চলিলাম। আর যে কখন এ দেশে আসিব, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং দাসীর সহিত আর দেখা হওয়া অসম্ভব। অন্তকার দর্শনই শেষ দর্শন মনে করিবেন।

অধিক কথা লিখিয়া বাদশাহের বহুমূল্য সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক।

আপনাকে সর্ব্বদা সংবাদাদি দিব বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, রমণী-হৃদয় দুর্দ্দমনীয়। বিশেষতঃ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও নীরস, শুষ্ক ও কঠিন। সেই নীরস হৃদয়ে অল্প পরিমাণে ধর্ম্মরস প্রবেশ করিয়াছে। কঠিন প্রাণ কিয়ৎপরিমাণে কোমল হইয়াছে। জাঁহাপনা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহাকে এই সময় অতিশয় সাবধান ও সতর্ক না রাখিলে তাহার আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে কতক্ষণ? এই সকল কারণেই জাঁহাপনা, অতঃপর দাসীর সংবাদ পাইবেন না, আর একবার আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিল। সে দর্শন কখন্ ঘটিবে? যখন লুৎফ-উন্নিসা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিবে, সেই সময় যদি একবার সে বাদশাহের দর্শন পায় তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সে আর কিছু চাহে না। তাহার বাদশাহচরণে ঐ একমাত্র ভিক্ষা থাকিল। লুৎফ-উন্নিসার জীবন দেহ ত্যাগ করিবার অনতিপূর্ব্বে বাদশাহচরণে সংবাদ আসিবে।

জাঁহাপনা! পুনরায় বলিতেছি, আমাকে ভুলুন। আমার সহিত পরিচয়, সম্বন্ধ এবং আমার নাম ইত্যাদি সমস্ত স্মৃতি ভূগর্ভে প্রোথিত করুন। এ পাপীয়সীর নাম কখন যেন আপনার মনে সমুদিত না হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা।

প্রিয়ভগ্নী নূরজাহানের সহবাসে, জাঁহাপনা, পরম সুখে অতুল সম্পদ ভোগ করিতে করিতে চিরজীবী হইয়া থাকুন, ইহাই দাসীর প্রার্থনা।"

লুৎফ-উন্নিসা পত্রিকা পাঠ করিয়া তাহা মণ্ডিত করিলেন। পরে তাহার উপর শিরোনাম লিখিয়া তাহা বাদশাহ বাহাদুরের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া গম্ভীরভাবে উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিজ্ঞান-দর্শনে

"জই অদহথে গদং ভবে তদা
সচ্চং সো অনীয়ং ভবে।"
—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল, লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই বিবেচনায় লুৎফ-উন্নিসা পিতা-মাতার নিকট সপ্তগ্রামগমনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা তাহাতে অমত করিলেন না।

প্রত্যুষে গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। বাহক যানাদি লোকজন প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

পরদিন লুৎফ-উন্নিসা পিতৃ-মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। বাহকেরা শিবিকা উঠাইল। লুৎফ-উন্নিসা আগ্রার মায়া ত্যাগ করিলেন। যে আগ্রায় তাঁহাকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চিনিত ও তাঁহার সহিত পরিচয় শ্লাঘার বিষয় মনে করিত, যে আগ্রায় তিনি যখন যাহাকে যাহা বলিতেন, সে তখনই তাহা আনন্দে সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইত, যে আগ্রাবাসী জনগণ তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তি শুভদিনের লক্ষণ মনে করিত এবং যে আগ্রার ওমরাহ যুবকগণ তাঁহার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গদৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া আছে, অদ্য লুৎফ-উন্নিসা প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই আগ্রা ত্যাগ করিলেন।

সময়! তুমি ধন্য। তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি নির্জীবকে সজীব করিতে পার এবং সজীবকে নির্জীব করিতে পার; তুমি কুসুমকে পাষাণ এবং পাষাণকে কুসুম করিতে পার; তুমি শুষ্ক তরুকে মুঞ্জরিত করিতে পার। তোমার মোহন মন্ত্র চমৎকার! তুমি যে মন্ত্রপ্রভাবে পাষাণী পদ্মাবতীকে মানবী করিয়াছ, সে মন্ত্র অদ্ভুত! তোমারই অসামান্য মন্ত্রবলে শুষ্ক পদ্মাবতী লতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কয়েক দিবস পরে, এক দিন মধ্যাহ্নসময়ে লুৎফ-উন্নিসা পাটনায় উপনীত হইলেন। তাঁহার পরিচারকেরা তথায় তাঁহার অবস্থানোপযোগী একটা কক্ষ স্থির করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিল।

লুৎফ-উন্নিসা নিয়মিত আহারাদির পর একাকিনী সেই কক্ষমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাসদাসী প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষে থাকিল। দাসীর সেবায় লুৎফ-উন্নিসা ত্বরায় নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ সহকারে একটি গোলমাল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন, এক জন লোক অপরকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধতস্বরে কহিতেছে, "তুই এ কোথায় পাইলি? এ মহামূল্য দ্রব্য; নিশ্চয়ই তুই কোথায় চুরি করিয়াছিস্।"

অপর কহিতেছে, "দোহাই ধর্ম্মের—আমি তোমার পায় হাত দিয়া দিব্য করিতেছি, চুরি করি নাই। যাঁহার দ্রব্য, তিনি ইহা আমাকে ভিক্ষা দিয়াছেন।"

ভর্ৎসনাকারী কহিতেছে, "এও কি কথা? এত বড় জিনিসটা তোকে অমনই ভিক্ষা দিল?"

ঘটনাটি জানিতে আমোদপ্রিয় লুৎফ-উন্নিসার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। যে দিকে গোল হইতেছিল, সেই দিকের গবাক্ষ মোচন করিয়া দেখিলেন, চটীরক্ষক হস্তে একটি অঙ্গুরীয় ধরিয়া সম্মুখস্থ এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করত পূর্ব্বোক্তরূপে বচসা করিতেছে; চতুর্দ্দিকে অনেক লোক সমবেত হইয়া তামাসা দেখিতেছে। বিষয়টা কি, জানিবার নিমিত্ত লুৎফ-উন্নিসা এক জন দাসীকে আহ্বান করিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অবিলম্বে চটীরক্ষক সম্ভাবিত চোরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

চটীরক্ষক উত্তর করিল, "এই ব্যক্তি এই অঙ্গুরীটি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে। কিন্তু এটি যেরূপ মহামূল্য দ্রব্য, তাহাতে সহজে ইহা সামান্য ব্যক্তির হস্তগত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বোধ করি, ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কথা আছে।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "অঙ্গুরীয় দেখি।"

চটীরক্ষক তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয় দিল। অঙ্গুরীয় দেখিয়া লুৎফ-উন্নিসা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন কালিমা-প্রাপ্ত হইল এবং হর্ষ বিলুপ্ত হইল। দারুণ পূর্ব্বস্মৃতি-চিহ্ন বদনে আবির্ভূত হইল। তিনি অঙ্গুরীয়-বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?"

সে ব্যক্তি কহিল, "বিবি! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—কাশীধামে থাকি; ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। এরূপ সামান্য দরিদ্রের হস্তে এমন মহামূল্য দ্রব্য অসম্ভব ঘটনা। ফলতঃ মা! আমি দরিদ্র বটি,

কিন্তু চোর নহি। এ অসামান্য দ্রব্যও আমার ভিক্ষায় পাওয়া।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমাকে ইহা কে ভিক্ষা দিল?"

ভিক্ষু কহিল, "কতিপয় মাস অতীত হইল, পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে একটি ধনবান্ ব্যক্তি সপরিবারে উক্ত তীর্থে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে সকলেই আমাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহাদের সহিত একটি অল্প-বয়স্কা সুন্দরী ছিলেন; আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি কহিলেন 'আমার কিছুই নাই—তোমাকে কি দিব?' তাঁহার রূপ-দর্শনে তাঁহার যে কিছুই নাই, এ কথা বিশ্বাস হইল না। এ জন্য সে কথা শুনিয়া আমি পুনরায় ভিক্ষা কামনা করিলাম। পরিশেষে তিনি একটু চিন্তিত হইয়া তাঁহার কেশরাশির মধ্য হইতে এই অঙ্গুরীয়টি বাহির করিয়া কহিলেন, আমার আর কিছুই নাই, এইটি আছে, তা ইহাতে আমার বিশেষ আবশ্যক নাই, ইহা তুমিই লও। তাঁহার সঙ্গীরা তখন একটু দূরে ছিল। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী আসিয়া দেখিলাম যে, ইহা অমূল্য সামগ্রী। মনে করিলাম যে, সাধ্যসত্ত্বে ইহা অপচয় করিব না; কন্যার বিবাহের সময় একটি তাহাকে দিব; কিন্তু আর চলে না; কাজেই ইহা বিক্রয় করিতে হইতেছে। কিন্তু দরিদ্রের কপাল কোথায় যাইবে? এখানে বিক্রয়ার্থ অঙ্গুরী প্রদর্শন করায় ইনি আমাকে চোর বলিয়া অনুমান করিলেন। এক্ষণে আপনাদের ধর্ম্মে যাহা সঙ্গত হয়, করুন।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি বলিতে পার সে যাত্রীদের নিবাস কোথায়?"

দরিদ্র কহিল, "আজ্ঞা না, আমি তাহা কিরূপে জানিব?"

বিবি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "যিনি তোমাকে এই অলঙ্কার দিয়াছেন, তাঁহার সহিত সঙ্গীদের কোন সম্পর্ক আছে কি না জান?"

"বিবি! আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব?"

লুৎ। আচ্ছা, তাহা না জান, তিনি দেখিতে কেমন, তাহা তো জ্ঞাত আছ?

ব্রাহ্মণ। তিনি দেখিতে পরমা সুন্দরী। তেমন রূপ আর দেখি নাই।

লুৎ। তাঁহার বয়স কত অনুমান করিতে পার?

ব্রাহ্মণ। অনুমান ২২।২৩ বৎসর হইবে।

লুৎফ-উন্নিসা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "কত মূল্য পাইলে তুমি অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ?"

ব্রাহ্মণ। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আপনি যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিবেন, তাহাই যথেষ্ট।

লুৎ। তোমাকে আমি আর একটি অঙ্গুরীয় দিতেছি, সেটি তুমি তোমার কন্যাকে দিও, তা ছাড়া তোমার সংসার-খরচের নিমিত্ত নগদ ২০০৲ টাকা আর এই অঙ্গুরীয় পাওয়ায় আমার যে উপকার হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত পুরস্কারস্বরূপ ৫০৲ টাকা দিতেছি। কেমন ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে?

দরিদ্র ব্রাহ্মণ করে স্বর্গ পাইল; সানন্দে কহিল, "যথেষ্ট! আমি স্বপ্নেও এত আশা করি নাই। আপনি স্বয়ং কমলা।"

অতঃপর লুৎফ-উন্নিসা ব্রাহ্মণকে উক্ত অর্থাদি দিয়া বিদায় করিলেন।

চটীরক্ষক তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সকলে প্রস্থান করিল। লুৎফ-উন্নিসা আবার একাকিনী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্দেহে

"If I should meet thee
After long years,
How shall I greet thee"
—Byron.

লুৎফ-উন্নিসার মনে হইল, সপ্তগ্রামের যে অংশে নিবিড় বন, তন্মধ্যে তিনি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে কহিয়াছিলেন, 'আমি তোমার সপত্নী। তোমাকে ধন দিতেছি রত্ন দিতেছি, দাসী দিতেছি, অট্টালিকা দিতেছি, তুমি পতি ত্যাগ কর। তাহা হইলে পতি আমার হইবেন।' সরলা বিকারশূন্যা সংসারবোধহীনা কপালকুণ্ডলা অনায়াসে কহিয়াছিলেন, 'তাহা হইলে তুমি সুখী হও? তাহাই হইবে। কল্য হইতে

তোমার সুখের পথে কণ্টক থাকিবে না।' লুৎফ-উন্নিসা যুবতী রমণীর বদন হইতে এরূপ কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এখন মনে হইয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইল! তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা মানবী আকারে দেবী, অদ্য ভাবিলেন, কপালকুণ্ডলা পাপীয়সী। লুৎফ-উন্নিসা সেই সময় কপালকুণ্ডলার সুবিধার্থ ও স্মরণার্থ একটি অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন। দেখিলেন, এ অঙ্গুরী সেই অঙ্গুরী।

সেই বিরলে বসিয়া অন্তকর্ম্মা লুৎফ-উন্নিসার মনে স্বতঃ কতকগুলি প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল। "এ ব্যক্তি অঙ্গুরীয় কোথায় পাইল? ইহা আমি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলাম। কপালকুণ্ডলা সেই রাত্রিতেই জলমগ্না হইয়াছেন। তবে এ অঙ্গুরী কেমন করিয়া পাইল? হয় তো কোন ধীবর ইহা জালে পাইয়া থাকিবে। দানকারিণী তাহার নিকট ক্রয় করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন, ইহা আমি বেশ জানি, আর এ কথা আমাকে কাপালিক বলিয়াছেন। তিনি কেন মিথ্যা বলিবেন? কপালকুণ্ডলা কি অন্য কোন অসম্ভাবিত উপায়ে জীবন লাভ করিয়াছেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিল, "দানকারিণী পরমা সুন্দরী, তাহার বয়স ২২।২৩ বৎসর।" এ সকল তো কপালকুণ্ডলাতেই সম্ভবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা নাই। তবে দানকারিণী কে? কোথায় যাইলে তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? সে প্রবাসী ধনী কে? তাঁহার কোথায় বা নিবাস? সে রমণী—সে রমণী কি পুনর্জ্জীবিতা কপালকুণ্ডলা?" অদ্য কপালকুণ্ডলার জীবন সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে একটি আশার অঙ্কুর জন্মিল।

এই ভাবিতে ভাবিতে লুৎফ-উন্নিসার আনন্দোদয় হইল। তিনি তাঁহার আশার সফলতা কামনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি কপালকুণ্ডলা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে সংসারে পরম সুখের উদয় হয়। তাঁহার এ ভাব হইল কেন? এক দিন তিনিই না কপালকুণ্ডলাকে বিদূরিত করিবার যত্ন করিয়াছেন? এখন তিনিই সেই কপালকুণ্ডলার জীবন কেন প্রার্থিতেছেন? ইহার কারণ লুৎফ-উন্নিসার স্বামিভক্তি—স্বামীর সুখকামনা।

বহুক্ষণ এক স্থানে বসিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে লুৎফ-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অঙ্গুরীয়টি সাবধানে রাখিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বামি-সঙ্গে

"ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে,
শুদ্ধে তু দর্পণতলে ভাবকাশাঃ।"
—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

পাঠক মহাশয়, বহুদিন নবকুমার ও শ্যামার সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অতএব তাঁহাদের সংবাদ লওয়া যাউক।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়; পশ্চিমাকাশের রাঙ্গা রঙ—যেন কে হিঙ্গুল ঢালিয়া দিয়াছে। যে দিকে যখন ক্ষমতাশালী লোক সহায় থাকেন, তখন সেই দিকই প্রবল, উজ্জ্বল ও সতেজ হয়। তাঁহার বিহনে বিমর্ষ, মলিন ও অপদস্থ হয়। মানব-সমাজের এই নিয়ম। প্রকৃতিও কি এই নিয়মের অনুসারিণী? পূর্ব্বকালে রাজাদের একাধিক রাজ্ঞী থাকিতেন। যে রাণী যখন রাজার সুনয়নে পড়িয়া "সুয়া" হইতেন, তখন তাঁহার সুখের সীমা থাকিত না। তিনি আনন্দে ভাসিতেন, আর যিনি বিষনয়নে পড়িয়া 'দুয়া' হইতেন, তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। সূর্য্যদেব প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিক্ সতীর সহিত অবস্থান

করেন, তখন তাঁহার শোভা দেখে কে? আর এখন তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত কৌতুক করিতেছেন,—ঐ দেখুন, সেই জন্য পূর্ব্বদিক্‌-সতী ক্রমেই মলিন হইতেছেন, তাঁহার মুখে কালিমা পড়িতেছে। আর সূর্য্যদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া যাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাঁহার হাসি ধরে না। তিনি আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

এইরূপ সময়ে নবদ্বীপস্থ একটি দ্বিতল গৃহের ছাদে একটি যুবক ও একটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-সুস্নিগ্ধ মন্দানিল ধীরে ধীরে আসিয়া যুবক-যুবতীর ললাট স্পর্শ করিতেছে, তাঁহাদের বস্ত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে ও যুবতীর অংসনিপতিত চিকুরদাম নাচাইতেছে।

যুবতীকে সকলে চিনিয়াছেন বোধ হয়। তিনি নবকুমারের ভগ্নী শ্যামাসুন্দরী। তাঁহার পার্শ্বস্থিত যুবক তাঁহার স্বামী মথুরানাথ।

শ্যামা বলিলেন, "এখন আর কোন অসুখ নাই তো?"

মথুরানাথ। আবার অসুখ। তুমি যদি না আসিতে, তাহা হইলে হয় তো আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইতাম না। তোমার ও সুন্দর মুখের শোভা দেখিলে আর কি রোগ থাকে?

শ্যা। থাকে না?

ম। না।

শ্যা। তবে তো আর ভাবনা নাই। এখন অবধি যত লোকের পীড়া হইবে, সকলকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিও। আমি তাহাদিগকে মুখ দেখাইব, আর তাহারা ভাল হইয়া যাইবে।

ম। সকলে দেখিলে হয় না। সে দেখার বিশেষ আছে।

শ্যা। কি বিশেষ?

ম। আমি তোমাকে যেরূপে দেখি, সেইরূপে দেখা চাই।

শ্যা। তুমি আমাকে যেরূপ দেখ, তাহা তো আমার অবিদিত নাই। তাহাতে যদি তোমার রোগ সারে, সকলের সারিবে।

ম। তবে আমি কি তোমাকে সাধারণের ন্যায় দেখি?

শ্যা। প্রায় তাই বই কি!

ম। না শ্যামা! এ কথাটি তুমি অন্যায় বলিতেছ। আমি এত দিন তোমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে সে কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু শ্যামা, তুমি কি জান না—আমি স্বেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার করি নাই? আমার প্রাণ অন্বেষণ করিয়া দেখ, শ্যামা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—আমি তোমাকে কেমন ভালবাসি।

শ্যা। আমি কি তোমার কথায় ভুলিব?

তোমাদের—কথা যেমন, কাজে তেমন নয় কখনই। তোমরা—মন ছলে গাছে তুলে কেড়ে নাও মই। তোমরা কথার গুণেই জগৎ জেত।

ম। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত শ্যামা! তাহা হইলে দেখাইতাম, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। আমি যখন তোমার কাছে থাকি, তখন তোমার থাকি, আর তোমার কাছে না থাকিলেও তোমারই থাকি। বলিলে বিশ্বাস কর না কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি তোমাকে চিরদিন প্রাণের সহিত সমান ভালবাসি।

এই কথায় শ্যামা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কতক্ষণ হাসিয়া মথুরানাথের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। তখনও হাসিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "তুমি রাগ করিবে, তাহা আমি জানিতাম। আর একটি কথায় তোমাকে কাঁদাইতে পারি। তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা কি আমি জানি না? তাহা বেশ জানি। এতদিন তোমার বিহনে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। সেই দুঃখেই এত কথা বলিলাম; কিন্তু আমার সে কষ্ট এখন দূর হইয়াছে। আর আমি তাহা মনে করিব না। কষ্ট না হইলে সুখ হয়? অত কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া এখন ত সুখ পাইতেছি। অতঃপরে বল, তুমি আমাকে আর ছাড়িয়া থাকিবে না, আর আমার সঙ্গে পূর্ব্বেকার মত প্রতারণা করিবে না? আমি আর সপ্তগ্রামে যাইব না।"

মথুরানাথ শ্যামাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, কতক্ষণ উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া রহিলেন, তাহা কেহই বুঝিলেন না। অনেকক্ষণ পরে মথুরানাথ কহিলেন, "শ্যামা! জগতে যাহার পত্নী তোমার মত, সেই সুখী। অবশিষ্টেরা নিতান্ত অসুখী।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করিতেছ। জগতে সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে ভালবাসে, সকলেই সুখী।"

য। তার জন্য নয়, প্রকৃতই তোমার ন্যায় নারী জগতে দুর্লভ। আমি আজ ইহা নূতন দেখিতেছি না। এত দিন আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় মনের কথা মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এত দিনে বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার সুখ অব্যাহত করিয়া দিলেন। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন আর এ সুখ ছাড়িব না। শ্যামা! আর তোমাকে চক্ষুর অগোচর করিব না।

শ্যামা মথুরানাথের হস্তধারণ করিলেন। মথুরানাথ শ্যামার ললাট চুম্বন করিলেন।

এই সময় বহির্ব্বাটীতে নবকুমার ও আর কয়েক-জন কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ও উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছেন, শুনিতে পাইয়া মথুরানাথ শ্যামাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্যামা অনেকক্ষণ ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া থাকিলেন। শ্যামার সুখ এক্ষণে সীমাতীত। তিনি প্রায় দেড়মাস কাল অতীত হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তখন মথুরানাথ মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা শ্যামার সুখের এক কারণ। যে স্বামীকে শ্যামা কদাচিৎ দেখিতে পাইতেন, সেই স্বামী এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহার নয়নে রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার সুখের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেম-পত্র

"Why did you falsely call me your Lavinia
And swear I was Horatio's better half
Since now you mourn unkindly by yourself?
And rob me of my partnership of sadness."
—N. Rowe.

নবকুমার ও শ্যামা প্রায় দেড় মাস অতীত হইল, নবদ্বীপ আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে মথুরানাথ নবকুমারের সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অথবা পদ্মাবতীর সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না। নবকুমারের মনের অবস্থাও তিনি সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে ভ্রমণের সময় অথবা যে সময়ে তাঁহারা দুই জন একত্রে থাকিতেন, সেই সময় ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতেন।

এই সময় একদিন নবকুমার পদ্মাবতীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। পদ্মাবতী আগ্রা হইতে সপ্তগ্রামে প্রত্যাগত হইয়া নবকুমারকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্রোন্মোচন করিয়া নবকুমার পাঠ করিলেন,—

"প্রাণেশ্বর!

বিধাতা আমাকে নিয়ত ক্লেশ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবেন স্থির করিয়াছেন। যে ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে আমি পরম সুখ লাভ করি, বিধাতা আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত তাঁহাকেও এমনি বিপদে নিক্ষেপ করেন যে, সহসা তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে। আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত বিধাতা তোমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। আমি পাষাণী, আমার হৃদয়ে অনেক সহে, এ সকলও সহিতেছে।

শুনিতেছি, শ্যামার স্বামী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। পাপীয়সীর প্রার্থনায় বিধাতা কর্ণপাত করেন না; তথাপি আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, তিনি নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করুন।

তুমি তোমার হৃদয়-সখাকে দিয়া আমার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলে যে, অতি শীঘ্র নবদ্বীপ হইতে ফিরিবে। নাথ! ইহারই নাম কি শীঘ্র? আমি দিন গণনা করিয়াছি এক মাস কুড়ি দিন হইল, তুমি নবদ্বীপ গিয়াছ। তোমার বিবেচনায় এই সময় অল্প হইলেও আমার বিবেচনায় ইহা নিতান্ত দীর্ঘ। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া, এইরূপে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলে? আমি কোন প্রকারেই তোমার প্রেমাস্পদ হইবার উপযুক্ত নহি, তাহা আমি বেশ জানি। তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহা তোমার উদার মনের পরিচয়। কিন্তু হৃদয়েশ! তাই বলিয়া কি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া আবার নরকে নিক্ষেপ করা উচিত? তুমি যদি আমাকে এমন করিয়া ত্যাগ করিবে, তবে তখন এককালে আমাকে আশাতীত সুখসাগরে ভাসাইলে কেন? আমি দুঃখিনী হতভাগিনী, পাপীয়সী—তোমার চরণ ধ্যান

করিতে করিতে জীবন কাটাইতাম। সে অবস্থায় তাহাতেই আমার সুখ হইত। কিন্তু প্রাণেশ্বর, তুমি এক্ষণে আমার সুখের ইচ্ছা বাড়াইয়া দিয়াছ; এখন তো আমার চিত্ত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। আমাকে সুখে ভাসাইয়া আবার দুঃখে ডুবাইলে আমি এক তিলও বাঁচিব না। মৃত্যু ভিন্ন এ অবস্থায় কদাচ শান্তি জন্মিবে না। তোমার প্রবৃত্তির উপর আমি জোর করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার যাহা সঙ্গত বিবেচিত হয়, তাহাই কর।

ঈশ্বর না করুন, যদি অন্য কিছু দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বল। পদ্মাবতী কি তোমার কেহ নহে? যাহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহার নিকট কিছু গোপন রাখিবার আবশ্যক নাই। তোমার বিপদ কি পদ্মাবতীর বিপদ নহে? তোমার ক্লেশ কি পদ্মাবতীর ক্লেশ নহে? তবে প্রিয়তম, আমার নিকট গোপন কেন? আমাকে তোমার ক্লেশের অংশিনী করিতেছ না কেন? আমি অবলা, তোমার বিপদে—তোমার ক্লেশের অংশ গ্রহণে সমর্থ হইব না বলিয়া কি আশঙ্কা করিতেছ? সেই আশঙ্কা নাই। আমি অনেক সহিয়াছি, অনেক সহিতে পারি।

যে দিন অভাগিনী পদ্মাবতী তোমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়াছিল এবং যে দিন তুমি তাহার আজীবনকৃত পাপসকল ক্ষমা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলে, দাসীর জীবনে সে দিনটিই দিন! সে দিন আর হইবে না! চিরাপরাধা পদ্মাবতী তাহার পর কি আবার তোমার চরণে অপরাধী হইয়াছে? যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি যে মনে তাহার সেই সকল ঘোর দুষ্কর্ম ক্ষমা করিয়াছ, সেই মনে তাহাও ক্ষমা কর।

আর তোমাকে কি বলিব? কি বলিলে তুমি দাসীর হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করিতে পারিবে? হৃদয়ের এ অবস্থা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে আর কিছু না বলিলেও তোমার অদর্শনে আমার হৃদয়ের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে।

এক্ষণে বল, তুমি আর কত দিন নবদ্বীপে থাকিবে? আমি যেরূপ শুনিয়াছি, ঈশ্বর করুন, তাহাই সত্য হউক। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তবে তথায় বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?

শ্যামাকে আমার কথা মনে করাইয়া দিবে। বিধাতা তাঁহাকে সুখে রাখুন।

তোমার বিহনে যদি অধীনীর মঙ্গল হওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহার মঙ্গল। তুমি সর্ব্বপ্রকারে বিপদশূন্য ও সুখী হও, ইহাই দাসীর একমাত্র প্রার্থনা।”

নবকুমার পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রের প্রত্যেক পঙক্তিতে যেন পদ্মাবতীর পবিত্র প্রণয় প্রতিভাত হইতেছে বোধ হইল। তিনি আবার পড়িলেন, পদ্মাবতীর সুখদুঃখ সম্বন্ধে কতক্ষণ বসিয়া কত চিন্তাই করিলেন; পরক্ষণে পদ্মাবতীর প্রণয়-লিপির প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাহাতে পদ্মাবতীর প্রত্যেক কথার তন্ন তন্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া দিলেন। পদ্মাবতীকে যে তিনি বিস্মৃত হন নাই, কখনও বিস্মৃত হইবেনও না, তাঁহার সুখের প্রতি তিনি যে বিশেষ অমনোযোগী এবং মথুরানাথের অনুরোধে, অনিচ্ছায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে, এ সকল কথাও লিখিয়া দিলেন।

নবকুমার এইরূপে পত্র সমাপ্ত করিয়া আবার ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। পদ্মাবতীর চিন্তা আবার তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। নবকুমারের মন এক্ষণে পদ্মাবতীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার কারণ কি? পদ্মাবতী তাঁহাকে ভালবাসেন, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিত লিপিও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করিতেছে। সেই প্রণয়ই নবকুমারের হৃদয়ে প্রণয়বর্দ্ধনের কারণ! প্রণয়ের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। তুমি এক জনকে ভালবাস, সে-ও তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার সহস্র দোষ থাকিলেও সে তাহা গ্রহণ করিবে না; সে তোমার পক্ষপাতী হইবে। তোমার তিলপ্রমাণ গুণকে সে তাল করিয়া তুলিবে। মনুষ্য প্রণয়াবতার। মনুষ্যের সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্যই প্রণয়, স্নেহ, লিপ্সা, লালসা, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সমভাবাপন্ন ধর্ম্মসকলে মাখা। সকল হৃদয়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রণয় আছে। একটু প্রণয় হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিলে তাহা অল্পে অল্পে বর্দ্ধিতাকার হইয়া উঠে। যেমন বনমধ্যে এক স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অরণ্যে ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড

উপস্থিত করে, মাধুর্য্যময় প্রভাত-সূর্য্যরশ্মি আকাশ-মণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়াই অনতিবিলম্বে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দিগ্বলয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিদ্রা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আগমন করত নয়ন নিমীলিত করিয়াই অচিরে দেহ, মন প্রভৃতির চৈতন্য হরণ করে, সেইরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে অল্পসময়ের মধ্যে মহান্ মহীরুহের আকার ধারণ করে। নবকুমারের হৃদয় পূর্ব্বেই পদ্মাবতীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, এক্ষণে সে ভালবাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা কিন্তু বিচিত্র নহে। প্রণয়ের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। এমন দেশ নাই, যথায় প্রণয়ের শাসন নাই; এমন হৃদয় নাই, যাহা প্রণয়ের আধিপত্য স্বীকার করে না। যদি তেমন হৃদয় থাকে, তবে সে হৃদয় নিতান্ত অসার। সে ব্যক্তি পুরীষ অপেক্ষাও অপদার্থ। নবকুমারের হৃদয় সেই মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ প্রণয়ে পূর্ণ। সেই পূর্ণ হৃদয়ে নবকুমার পদ্মাবতীকে ভালবাসিয়াছেন। সে ভালবাসা কেনই না বদ্ধমূল হইবে?

তবে কি নবকুমার এত দিনের পর কপাল-কুণ্ডলাকে ভুলিতে পারিয়াছেন? না, তিনি অদ্যাপি কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবনমধ্যে যে কখন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের কপাল-কুণ্ডলার প্রতি প্রণয় ও পদ্মাবতীর প্রতি প্রণয়—এ দুই প্রণয়ে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কপালকুণ্ডলার প্রণয় স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও শান্ত, যেন হীরক-নিঃসৃত মনোরম রশ্মি। পদ্মাবতীর প্রণয় উগ্র, সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত; যেন তেজঃপ্রতিফলিত দীপ্তিমান্ জ্যোতিঃ। উভয়ই আবশ্যক, কার্য্যকর এবং প্রিয়। কিন্তু অধুনা নবকুমারের হৃদয়ে পদ্মাবতীই প্রবল। কারণ, পদ্মাবতী উপস্থিত, কপালকুণ্ডলা অনুপস্থিত এবং আর যে কখন উপস্থিত হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় এক্ষণে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। তাহা কখন বিলীন হইবে না। প্রণয় বিলীন হইবার সামগ্রী নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অশুভ-সংবাদে

"শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যম্—"

—রামায়ণম্।

দিবসত্রয় পরে এক দিন নবকুমার ও মথুরানাথ উভয়ে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবকুমারের অনুসন্ধানে গ্রামান্তর হইতে একটি ব্রাহ্মণ আইসেন। ভৃত্য তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়াছে। তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় নবকুমার ও মথুরানাথ প্রত্যাগত হইলেন। ভৃত্য নবকুমারকে ব্রাহ্মণের আগমনবার্ত্তা জানাইল; নবকুমার সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তথায় প্রবেশ করিলেন; তথায় তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় শোকে আকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কাপালিকের নিকট হইতে পলাইয়া যাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি কপালকুণ্ডলাকে সম্প্রদান করিয়া নবকুমারকে অতুল সুখসাগরে ভাসাইয়াছিলেন,—নবকুমার দেখিলেন, অভ্যাগত পুরুষ হিজলীর ভবানীর সেই অধিকারী, নবকুমারের মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। যখন অধিকারী জিজ্ঞাসিবেন, "নবকুমার! কপালকুণ্ডলা কেমন আছে?" তখন তাঁহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব, এই ভাবিয়া নবকুমার ব্যথিত হইলেন।

নবকুমার আসিয়া অধিকারীর চরণে নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "নবকুমার! বিষণ্ণ কেন? সংবাদ মঙ্গল ত?"

এই কথায় নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিতধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অধিকারী তাঁহার এবংবিধ ভাবদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও ব্যাকুল হইলেন। নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "সমস্ত কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত অধিকারীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেরূপে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া অধিকারী অবিরল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বড় ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। কাপালিকের অসদভিপ্রায় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দেন। আপাততঃ দেখিতে গেলে জগতে অধিকারী ভিন্ন কপালকুণ্ডলার আর কেহই ছিল না। অধিকারীরও যতদূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহই নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যাবাৎসল্যে লালন-পালন করিতেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার অপত্যস্নেহ জন্মিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা জ্ঞানোদয়াবধি অধিকারী ভিন্ন অন্যকে জানিতেন না। অধিকারী পিতা, অধিকারী মাতা, অধিকারীই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিলেন। এরূপ প্রিয় ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের অপমৃত্যু হইয়াছে শুনিলে অপরের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে সন্দেহ কি? অধিকারীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ রোদন করিলেন। নবকুমার ও মথুরানাথ তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ দিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিলেন, "নবকুমার, কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট বড় মন্দ। ভবানী তাহাকে কখন সুখ দিলেন না। সে শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা; কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় নিবাস, বাছা তাহার কিছুই জানিল না। তোমার সহিত বিবাহ দিলাম। ভাবিলাম, এক দিন না এক দিন বাছা সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। অদৃষ্টে না থাকিলে কি হইবে বল? সকলই বিপরীত হইল।"

নবকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন, "নবকুমার! আর তাহা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি সচ্চরিত্র ও শান্ত ব্যক্তি। বিধাতা তোমাকে এত বেদনা দিতেছেন কেন? পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হওয়া তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

নবকুমার নির্ব্বাক্। অধিকারী কহিলেন, "আহা! তাহার যেমন রূপ, তেমনই গুণ। তাহাকে সহসা দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিত।"

নবকুমার কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা নাম তো পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার বৃত্তান্ত জগতে কেহই জানে না। কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নিজ-বৃত্তান্ত জানিতেন না। আপনি তাঁহার বিষয় জানেন কি?"

অধিকারী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ভবানী সকলই আমাকে জানাইয়াছেন। আমি সকলই জানি।"

নবকুমার কহিলেন, "সে সকল কথা জানিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে মন অত্যন্ত অস্থির হয়। অদ্য আর সে কথা আলোচনার আবশ্যক নাই। সময়ান্তরে আপনার নিকট সমস্ত শুনিব।"

সে রাত্রি অধিকারী তথায় অবস্থান করিলেন। প্রাতে উঠিয়া তিনি জন্মভূমি দেখিতে যাইবার নিমিত্ত বিদায় চাহিলেন। নবকুমার তাহাতে আপত্তি করিয়া কহিলেন, "যে দুদিন আপনি এখানে আছেন, সে দুদিন আমরা ভাল আছি। আপনি এক্ষণে গিয়া কি করিবেন, তথায় কেহ বা আছেন,—কাহাকে দেখিতেই বা যাইবেন? আর চার পাঁচ দিন পরে আমি সপ্তগ্রাম যাইব। আপনি সেই সময় বাটী যাইবেন। আমি মাসেক কাল পরে আবার এখানে আসিব। আপনিও অবশ্যই ইতিমধ্যে ফিরিতে পারিবেন। আবার এখানেই সাক্ষাৎ হইবে।"

অধিকারী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অস্তিমসময়ে

"———— ——— gone to pinto's reign,
There with sad ghosts to pine and shap-
owsdun."

—Thomson's Castle of Indolence.

বৈকালে নবকুমার, মথুরানাথ ও অধিকারী ভ্রমণে নির্গত হইলেন। নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে নিবিড় বন। তাঁহারা সেই দিকেই বেড়াইতে গেলেন। উভয় দিকে বন-মধ্য দিয়া গ্রামান্তর যাইবার নিমিত্ত এক পথ ছিল; তাঁহারা সেই পথ বাহিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সন্নিকটে একটি মনুষ্যের ধ্বনি এককালে তাঁহাদের তিন জনেরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন; ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে তাকাইলেন—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যন্ত্রণাধ্বনি আরও প্রবল হইল। তাহা সন্নিহিত বনমধ্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে

বোধ হইল। তাঁহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলেন। দুই পা অগ্রসর হইয়া বৃক্ষলতার মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি মনুষ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাঁহারা বৃক্ষলতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাহা দেখিলেন, তাহাতে অধিকারী ও নবকুমার ত্রস্ত হইলেন, ভয়ানক দৃশ্য! তাঁহারা দেখিলেন, সাগরতীরবাসী, কপালকুণ্ডলা-পালক, ভৈরবীসেবক, জটাজূটধারী, দুরন্ত কাপালিক মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইতেছে। তাহার চরম কাল উপস্থিত। প্রাণবায়ু অনতিবিলম্বে সে দেহরাজ্য ত্যাগ করিবে। এত কাল ভৈরবী আরাধনায় কি পুণ্য সঞ্চিত হইল, তাহা কাপালিক আর অল্প কাল পরেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নবকুমার ও অধিকারী ভাবিলেন, কাপালিক এখানে কেন আসিল, সহসা উহার মৃত্যুই বা কেন হয়, এ সকল কথা কখন মীমাংসিত হইবার নহে। তাঁহারা কাপালিকসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কাপালিকেরও দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল। নবকুমারের শরীরে রোমাঞ্চ হইল; রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইল, শিরা সকল কাঁপিতে লাগিল।

কাপালিকের মুখ প্রফুল্ল হইল। যন্ত্রণায় অধীর কাপালিক তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তিলাভ করিল, কাপালিক হস্ত দ্বারা তাঁহাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। তাঁহারা বসিলেন। কাপালিক মুখব্যাদান করিল। তাঁহারা বুঝিলেন, কাপালিক পানীয় চাহিতেছে, মথুরানাথ সত্বর জল আনিতে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে একটি মৃন্ময় পাত্রে করিয়া এক পাত্র জল আনিয়া অধিকারীর হস্তে দিলেন। অধিকারী কাপালিকের মুখে অল্প অল্প জল দিতে লাগিলেন। জল পান করিয়া কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা হইল, অতি অস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। কাপালিক নবকুমারের হস্তধারণ করিল এবং কহিল, "পাপ —ওঃ—ঘোর—নরক—জলন্ত। ভবানী—ক্ষমা— অসম্ভব। ওঃ—নব—ক্ষমা। কষ্ট—যাই—অনল— ত্রাণ। আ—র—না মা—সন্তান। ওঃ—ক্ষমা— তুমি—ক্ষমা। মরি—ই—ই—ই।"

এই বলিয়া কাপালিক নিস্তব্ধ হইল; পুনরায় মুখব্যাদান করিলে অধিকারী পানীয় দিলেন। কাপালিক আবার কহিল, "জীবন যায়। নরক। উপায়? ওঃ—মরি—যে। এবার না।"

কাপালিক নবকুমারের হস্ত হইতে হস্ত গ্রহণ করিল এবং দুই হস্ত একত্র করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করত কহিতে লাগিল, "মা!—ক্ষমা—কর—চরণ—দেও। মরি। নরকে—না। স—ন্তা—ন অবোধ আর— না। চ—র—ণ। পাপ—কখন—না—মা—আ— আঃ। ওঃ—যাই—যে! মাঃ—জানি—তাম—না। এই—বার—ক্ষমা, আর—না। ওঃ!"

কাপালিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। ছটফট করিতে লাগিল। তাহার গভীর চক্ষুমধ্যে অশ্রুজল আবির্ভূত হইল। কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল; কাপালিক আবার মুখব্যাদান করিল। অধিকারী পুনরায় জল দিলেন। জল পান করিয়া নবকুমারের হস্তধারণ করিয়া কহিল, "ভা—ই—নব। মরি—রাগ —না—ক্ষমা।" এই বলিয়া নীরব হইল। কাপালিক অত্যন্ত দুরন্ত, দুর্মতি ও সে নবকুমারের মর্মান্তিক ক্ষতি করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা ও নরকের বীভৎসমূর্ত্তি দর্শনে এবং তাহার অনুতাপ ও ক্লেশ দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি উচ্চস্বরে কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি, ভবানীও তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

নবকুমার উচ্চ করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া কাপালিক শুনিতে পাইল। সে আবার কহিল, "নব—ওঃ। কপাল—কু—ণ্ড—লা—ল—ক্ষ্মী—ই —ই—স—তী। ওঃ—মরি—যে। মা! আছে— যশি—পু—উ—উ। রা—ম। ওঃ—যা—ই—ত্রা —ণ। ধন—বা—ন। ভা—ল—আ—অ—আ। ভ—বা—নী—মা—আ—আ।"

নবকুমার ও অধিকারী উভয়েই এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন, "কপালকুণ্ডলার কথা কি বলিলেন?"

কাপালিক অতি কষ্টে আবার কহিল,—"আ— ছে—এ—এ। ও—ও—ওঃ। মাঃ—কপাঃ ল— লা——"

তাহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। কপালকুণ্ডলার অৰ্দ্ধোচ্চারিত নাম তাহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। অতি কষ্টে পাপী অনুতাপী নরক-ক্লেশভীত কাপালিক তনু ত্যাগ করিল। তাহার গতি কি হইবে, তাহা সে পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া গেল।

৭ ধরণীধামবিচরণশীল কোন মানব সশরীরে

কল্পিত সুখসন্তোষালয় স্বর্গে দেবগণমধ্যে নীত হইলে, ঐরাবতসমারূঢ় পারিজাত-প্রসূনশোভিত, শচী সহ শচীনাথকে অথবা অন্য কোন দ্যুলোকবাসী দেবাত্মাকে সহসা সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিলে, প্রাতঃসূর্য্য পশ্চিমগগনে সমুদিত হইলে অথবা নৈসর্গিক নিয়মের তদ্রূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যেরূপ বিস্ময়বিশিষ্ট হওয়া সম্ভব—কাপালিকের শ্রীমুখাৎ কপালকুণ্ডলাসম্বন্ধীয় কথাসকল শুনিয়া অধিকারী ও নবকুমারের তদ্রূপ বিস্ময় জন্মিল। কাপালিকের সমস্ত কথা নিতান্ত অস্পষ্ট ও জড়তাপূর্ণ হইলেও "কপালকুণ্ডলা আছে" ইহা সে পরিষ্কাররূপে বলিয়াছে। উভয়ে ইহা লইয়া কতই আন্দোলন করিলেন। এ কথায় বিশ্বাসস্থাপনে এবং ইহার কোন নিগূঢ়ার্থ-নির্ব্বাচনে অক্ষম হইয়া সদুত্তর প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলীর ন্যায় উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার কহিলেন, "নিতান্ত অসম্ভব কথা। কিরূপে উহা বিশ্বাস করি? আমার বোধ হয়, কাপালিক মৃত্যুসময়ে প্রলাপ বকিল।"

অধিকারী বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর অন্যরূপ বলিতে লাগিল। তাঁহাদের অন্তর ঐ কথাকে সত্য ও অভ্রান্ত ভাবিতে ইচ্ছা করিল। মুখে ও মনে ঐক্য হইল না।

অধিকারী কহিলেন, "কাপালিক মানবলীলা সংবরণ করিল। ও ব্যক্তির জীবন যত মন্দ হউক না কেন, আমি জানি, ও ব্রাহ্মণ; সুতরাং উহার যথাবিধি ও যথাসম্ভব সৎকারাদি করা কর্ত্তব্য।"

এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং অবিলম্বে কাপালিকের মৃতদেহ সুরধুনী-তীরে আনয়ন করিয়া চিতাসজ্জা করত দগ্ধ করিলেন। ঘোর তান্ত্রিক কাপালিকের দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে তাহার নাম ও চিহ্ন চিরদিনের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইল।

পরদিন নবকুমার সপ্তগ্রামে এবং অধিকারী পলাশী যাত্রা করিলেন। কাপালিকের অন্তিমকালের কথা কেহই বিস্মৃত হইলেন না। তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষরূপে অঙ্কিত থাকিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রেমিকা-পার্শ্বে

"Oh woman; lovely woman; nature made the
To temper man; we had been brutes without you;
Angels are painted fair, to look like you,
There's in you all that we believe of heaven's
Amazing brightness, purity and truth,
Eternal joy and everlasting love."
—Ottway.

পাঠক বহুদিন পরে আবার নবকুমারকে পদ্মাবতীর পার্শ্বে দর্শন করুন। অতঃপর পদ্মাবতীকে লুৎফউন্নিসা বলিবার আবশ্যক নাই। সে নামের সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে।

পদ্মাবতী আপন গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। বেলা দ্বিপ্রহর। গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। সুপ্রশস্ত গৃহ, এজন্য বড় অন্ধকার হয় নাই। পদ্মাবতী একখানি পালঙ্কোপরি উপধানাবলম্বনে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে পুস্তক, অপর হস্তে একখানি তালবৃন্ত। পদ্মাবতী একমনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া গ্রীষ্ম বিদূরিত করিতেছেন। নিকটে একটি আধারে কতকগুলি সজ্জিত তাম্বূল রহিয়াছে; পদ্মাবতী ইচ্ছানুসারে এক একটি চর্ব্বণ করিতেছেন।

এমন সময় গৃহের একটি দ্বার উন্মোচিত হইল মুক্ত দ্বার দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী সহসা তাঁহার আগমন দৃষ্টে পুলকিতা হইলেন এবং সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তৎসন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রেম-পবিত্র আলিঙ্গন করিলেন ও সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া কতক্ষণ পার্থিব সমস্ত পদার্থ বিস্মৃত হইয়া সেইরূপ আলিঙ্গনে বদ্ধা রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে নবকুমার পদ্মাবতীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পদ্মাবতী এক্ষণে নবকুমারের বক্ষাসন হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া নবকুমার-কৃত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। নবকুমার দেখিলেন, পদ্মাবতীর নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুনীরে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উভয়ে উভয়ের সমস্ত কথা জ্ঞাত হইলেন। পরে পদ্মাবতী কহিলেন, "শ্যামার সংবাদ কি ?"

নবকুমার কহিলেন, "আমি যতদূর দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হইল, শ্যামা আপন অবস্থায় আপনি সন্তুষ্টা আছে।"

পদ্মা। শ্যামা আর কতদিন নবদ্বীপে থাকিবেন ?

নব। আমি আর কিছু দিন থাকিলে শ্যামাকে একবারে সঙ্গে লইয়া আসিতাম ; কিন্তু তোমাকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল, এ জন্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। কিছু দিন পরে গিয়া শ্যামাকে আনিব।

পদ্মা। আবার কত দিন পরে যাইতে হইবে ? এবারে যখন যাইবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি তথায় গিয়া দেড় মাস, দুই মাস বিলম্ব করিবে, তাহা হইবে না।

নব। এবার আমার নবদ্বীপে অধিক বিলম্ব হইবে না। গমনমাত্র শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া আসিব।

পদ্মা একটু হাসিলেন। মনে এই কথার উত্তর দিবার জন্য যে ভাব উদিত হইল, তাহা না বলিয়া বলিলেন, "শ্যামা যদি সেখানে ভাল থাকেন, তবে এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আনিবার প্রয়োজন কি ?"

নব। শ্যামা যদিও এইক্ষণ ভাল আছে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেরূপ থাকা সম্ভাবিত নহে। সপত্নী-সহবাসে কত দিন সেরূপ থাকিবে ? আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্যামা বাটীতে না থাকিলে আমার কত ক্লেশেরই সম্ভাবনা।

নবকুমারের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী একটু অন্যমনস্কা হইলেন। তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন, "নবকুমার! দাসীর একটি কথা শুনিতে হইবে। দাসীর প্রতি তুমি আশাতিরিক্ত অনুগ্রহ করিয়াছ। নারীর আশার সীমা নাই—তোমার নিকট আবারও প্রার্থনা করিতেছি।"

নব। কি কথা, নিঃসঙ্কোচে বল।

পদ্মা। তোমাকে কিন্তু আমার কথা রাখিতে হইবে।

নব। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। বল।

পদ্মা। কথা এই—তোমায় একটি বিবাহ করিতে হইবে। আমার এই কথাটি তোমায় রাখিতেই হইবে। তুমি একটি বিবাহ করিলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না ; মনের সকল বসনা সফল হইয়াছে; এখন ঐটি সফল হইলেই আমি চরিতার্থ হইব। তুমি ইহা স্বীকার কর। ইহাতে অন্যমত করিলে আমি বড় ক্লেশ পাইব।

নবকুমার ইহার উত্তর কি দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না ; অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিলেন ; পরে সবিস্ময়ে কহিলেন, "পদ্মাবতি! তোমার মনে সহসা এ ভাব জন্মিল কেন।"

পদ্মা। এ ভাব সহসা জন্মে নাই ; আর ইহা অকারণও নহে। আমি তোমার চরণচ্ছায়ার ভিখারিণী ছিলাম—তোমার নিকট সে ভিক্ষা লাভ করিয়াছি। এ অদৃষ্টে এত হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোমার ক্লেশ-নিবারণ-চেষ্টাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমার ক্লেশ আমি কোন্ চক্ষে দেখিব ? তুমি একটি বিবাহ করিলে তোমার সাংসারিক সমস্ত ক্লেশ অপনোদিত হয়, তাহা আমি বুঝিতেছি। কোন্ প্রাণে তোমাকে সে জন্য অনুরোধ না করিব ?

নবকুমার পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যে পদ্মা কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামি-প্রেম একায়ত্ত করিবার নিমিত্ত কি না করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে অধুনা এ কথা শুনিয়া কাহার না বিস্ময় জন্মিবে ? নবকুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "পদ্মাবতি! আমি আর বিবাহ করিব না। আর কাজ কি ?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "নাথ! বিবাহ করিলে আমি অসুখী হইব বলিয়া তুমি কি আশঙ্কা করিতেছ ?—আমি তাহাতে অসুখী হইব না। বরং তাহাতে আমার সুখ বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। তুমি আমার চিন্তায় নিজ সুখে কণ্টক দিলে, আমার সুখ না হইয়া দুঃখই বাড়িবে। আমি কি দেখিতেছি না যে, নিঃসংসারী হওয়ায় তোমার কত অনিষ্ট ঘটিতেছে ? এমন স্থলে তাহাতে অন্য মত করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে আমি সুখী হইব অথচ তোমারও মঙ্গল হইবে, সে কার্য্যে আপত্তি কি ?"

নবকুমার বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ;—ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই পদ্মাবতী এইরূপ হইয়াছে! বিধাতা সকলই করিতে পারেন। সময়ে সবই হয়। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "পদ্মাবতি! তুমি নারীকুলের অলঙ্কার। তুমি আমার নিতান্ত

হিতৈষিণী। তোমার কথা সকল অমৃতরসে সিক্তিত; তোমার বাক্য-পীযূষ পানে আমার মন এতই অভিভূত হইয়া উঠে যে, অন্য কিছু জ্ঞান থাকে না। এক্ষণে বিবেচনা বা চিন্তার সময় নহে। তোমার ও কথা আমি পরে মীমাংসা করিব।"

পদ্মা। আচ্ছা, সে যাহা হউক, নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা—

'কপালকুণ্ডলা' এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র নবকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। পদ্মাবতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন, "নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে কোন কিছু শুনিতে পাও কি?"

নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কপালকুণ্ডলার কথা আর কেমন করিয়া শুনিব? তাহার অকালমৃত্যুর সহিত তাহার নামও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে আর কে কি বলিবে?"

পদ্মা। সে বিষয়ে কি তোমার মনে কখন কোন সন্দেহও হয় না?

নব। কি আশ্চর্য্য কথা! পদ্মাবতি! কেমন করিয়া সন্দেহ হইবে? আমার কথায় যদি তোমার অবিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, কপালকুণ্ডলা আমার সাক্ষাতে—আমার চক্ষের উপর আমার সহিত একত্রে নদীতীরস্থ এক খণ্ড মৃত্তিকার সহ অতল জলে নিপতিত হইয়াছে। আমি জলে ডুবিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অশেষ যত্ন করি; কিন্তু আমার চেষ্টা বিফল হইল। কপালকুণ্ডলা স্রোতোবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল, আমি তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমার সংজ্ঞাও তিরোহিত হইয়া গেল।

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। মনে শোক উপস্থিত হইল। তিনি অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিলেন, "কেন? পদ্মাবতি! অদ্য ও সকল কথা জিজ্ঞাসিতেছ কেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "এ সকল কথার আলোচনায় তোমার মনে যাতনা উপস্থিত হইবে, তাহা জানি, তথাপি না জিজ্ঞাসিলে নয়। আমি এ সকল কথা আজ কেন জিজ্ঞাসিতেছি শুন।"

এই বলিয়া পদ্মাবতী আমূল অঙ্গুরীয়বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট যথাযথ বলিলেন। সে সকল কথা শুনিতে শুনিতে নবকুমারের লোচনপ্রান্তে অশ্রু আবির্ভূত হইল। পদ্মাবতী সমস্ত কথা বলিয়া কহিলেন, "নাথ! ইহাতে তোমার কি বোধ হয়?"

নব। বোধ কি হইবে? ইহা আমার বুদ্ধির অতীত। কপালকুণ্ডলা নাই এবং থাকাও নিতান্ত অসম্ভব, ইহা আমি বেশ জানি। তবে আমার দুরদৃষ্টে ও সমস্ত ক্লেশের এখনও শেষ হয় নাই। এই জন্য সময়ে সময়ে কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছায়ার ন্যায় প্রমাণ সকল জুটিতেছে। ও সকল কিছুই না, কেবল সমধিক ব্যাকুলিত হইবার এবং ক্লেশ ও যাতনা পাইবার কারণ।

পদ্মা। কিন্তু তুমি যা-ই বল, আমার যেন বোধ হয়, কপালকুণ্ডলা আছেন। বোধ করি, কোন প্রকারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকিবেন।

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) পদ্মাবতি! ও সকল কষ্ট-কল্পনা কেন করিতেছ? আমি নিতান্ত হতভাগ্য। আমার কষ্টের সীমা নাই। অন্যের হইলে যাহা হয় হইত, আমার অদৃষ্টে কখনই তাহা ঘটিবে না। দুরাশায় আর কেন চিত্তকে বদ্ধ করিতেছ? স্বপ্নে সুখসম্ভোগ করিয়া কি হইবে?

পদ্মা। যাহা হউক, এ জন্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

নবকুমার শূন্যভাবে কহিলেন, "কোথায় অনুসন্ধান করিব?"

নবকুমার বলিলেন বটে, কোথায় অনুসন্ধান করিব, কিন্তু তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা এমনই ভয়ানক হইয়াছে যে, কপালকুণ্ডলার পুনর্দর্শন-প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দুরূহ কার্য্যসাধনে তিনি অকাতরে প্রস্তুত। তাঁহার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি সংসার কপালকুণ্ডলাময় দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য পার্থিব সমস্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়া গেল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিলেন। নবকুমার হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, তথায় একটি মূর্ত্তি—একটিমাত্র চারু রমণীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার। কপালকুণ্ডলা তো অনেক দিন পরলোকগতা হইয়াছেন, তবে তাঁহার মূর্ত্তি অদ্যাপি নবকুমারের হৃদয়ে সুচিত্রিত রহিয়াছে কেন? নবকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সংসার ভুলিবেন, আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইবেন, পার্থিব সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিবেন, তথাপি কপালকুণ্ডলাকে হৃদয় হইতে কখন অপনীত করিবেন না। নবকুমার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই—আর কখনও যে বিস্মৃত

হইবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে। যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সহচরগণের উপকারার্থ, নিঃস্বার্থ কাষ্ঠভার মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি যে প্রাণদায়িনী হিতৈষিণী সুন্দরীর মূর্ত্তি চিরদিনের নিমিত্ত সহর্ষচিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের কুটিল শাসনে মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা স্মৃতিরঙ্গসংযোগে বিকৃত অংশ সকল সংস্কৃত ও পুনশ্চ রঞ্জিত হইল। নবকুমারের হৃদয়ে মোহিনী কপালকুণ্ডলা শোভা বিকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কাপালিকের মরণকালীন কথাগুলি কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নবকুমারের হৃদয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে। অদ্য পদ্মাবতীর প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে সন্দেহ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইল। তিনি আশার প্রভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। যদি সর্ব্বস্ব দান করিলে কেহ তাঁহাকে বলিয়া দেয়, কপালকুণ্ডলা আছেন,—তিনি অমুক স্থানে আছেন, নবকুমার তদ্দণ্ডে তাঁহাকে তাহা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে সম্মত। যদি আত্মজীবন বদ্ধ রাখিলে একবারমাত্র কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাওয়া যায়, নবকুমার অবাধে তাহাতেই স্বীকৃত। যদি দক্ষিণ-হস্তের বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার সংবাদ পাওয়া যায়, নবকুমার হৃষ্টচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত।

মানুষে মানুষের হৃদয় দেখে। যে ব্যক্তি দেখিতে জানে, সেই দেখে, অন্যে দেখিতে পায় না। সকলেরই চক্ষু আছে। চক্ষু দর্শনযন্ত্র। সকলেই সকলের হৃদয় দেখিতে পায় না কেন? তাহার উত্তর—তাহাতে কৌশল চাই, তাহাতে অভিজ্ঞতা চাই। সে কৌশল উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাল ও স্বভাব যাহাকে তাহা শিখাইয়াছেন, তিনি শিখিয়াছেন। চক্ষুর ক্ষমতা স্বচ্ছ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু ভেদ করিতে পারে না। তবে মানুষে মানুষের হৃদয় দেখে কি প্রকারে? দর্পণে যেমন সম্মুখস্থ পদার্থের ছায়া পড়ে, তেমনই এক প্রকাশ্য স্থানে হৃদয়েরও ছায়া পড়ে। সে স্থান বদন। তোমার রাগ হউক, দ্বেষ হউক, আনন্দ হউক, মনস্তাপ হউক, যে দেখিতে জানে, সে তোমার বদন দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিবে। পদ্মাবতি! কি দেখিতেছ? তোমার হৃদয় কেহ দেখিতেছেন, তাহা তুমি বুঝিতেছ কি? নবকুমার কতক্ষণ একপ্রাণ-মনে পদ্মাবতীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। পদ্মাবতী যে সকল কথা বলিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরের কথা কি না, নবকুমার যেন তাহাই জানিবার নিমিত্ত পদ্মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; নবকুমারের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি দেখিলেন, পদ্মাবতীর দৃষ্টিতে পবিত্র সরলতা বিরাজ করিতেছে; যে কপটহৃদয়, তাহার সেরূপ দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। পদ্মা যখন যাহা বলেন, তাহা তাঁহার অন্তর হইতেই বলেন। তিনি ভাবিলেন, "পদ্মাবতী রমণীরত্ন। সহস্র ক্ষতি হয় হউক, তথাপি পদ্মাবতীর সুখসাধনে যাহা প্রয়োজন, তাহা করিব।" এই জন্যই বলিতেছি, "পদ্মাবতি! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে থাক, তোমার ভয় কি? তোমার সুখ নবকুমারের প্রধান লক্ষ্য।"

নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "প্রিয়ে! বহুদিন উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ নাই; একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার আসিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন।

পদ্মাবতী বলিলেন, "তোমার সহিত এখনও অনেক বিশেষ কথা আছে।"

নবকুমার বলিলেন, "যদি সময়ান্তরে বলিলে ক্ষতি না হয়, তবে পরে বলিও।

পদ্মাবতী বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

নবকুমার প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সম্ভাবেন্তা আপনেন্তুং মহুৎসবেন্তুং রুআবেন্তা।
হিঅচ্ছিয়া বিঅবিহবা বিরহে মিত্তানং তুম্মনা অন্তে।"

—মুদ্রারাক্ষস।

যে বিপদে নিষ্পেষিত হইয়া উমাপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, পাঠক মহাশয় তাহা জ্ঞাত আছেন। উমাপতির মাতুল প্রভৃতি কেন সহসা এরূপ হইল, জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না; কেহ কোন সংবাদও দিতে পারিল না। তখন হরিহর ভাবিলেন, নিশ্চয়ই উমাপতি সপ্তগ্রাম গিয়াছেন। এ জন্য পরদিন প্রত্যুষে স্বয়ং সপ্তগ্রাম আসিলেন। তথায় উমাপতি আসেন নাই।

উমাপতির মাতা সমস্ত শুনিলেন। হরিহর তথায় বিলম্ব না করিয়া উমাপতির সন্ধানে গমন করিলেন। পরদিন বৈকালে নবকুমার উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার শিরে যেন অশনি-সম্পাত হইল। তিনি কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিলেন। বৃদ্ধার রোদন দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সহিত উমাপতির অভিন্নভাব ছিল; সেই উমাপতির এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ্ শ্রবণে নবকুমার একান্ত ব্যথিত হইলেন; বিশেষতঃ উমাপতির স্থবিরা জননীর কাতরতা দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "মা! তুমি কাঁদিও না, ভয় কি? আমার বোধ হইতেছে যে, কোন দৈববিপাকে পড়িয়া উমাপতি বদ্ধ আছেন। তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, ইহা আমার বেশ মনে হইতেছে। যাহা হউক, আমি কল্য প্রত্যুষে নির্গত হইব। পৃথিবী অনুসন্ধান করিব, প্রাণ দিব, যেমন করিয়া পারি, উমাপতিকে আনিয়া তোমার হস্তে অর্পণ করিব। কোন চিন্তা করিও না। ভয় কি?"

বৃদ্ধা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "বাবা নবকুমার! তুমি চিরজীবী হও। দাদা অনুসন্ধানের ত্রুটি করিতেছেন না। আহা! তাঁহার বড় ভয়, বড় ভাবনা। একটি ছেলে না কি এমনই করিয়া নিরুদ্দেশ হইল, আর পাওয়া গেল না, সেই জন্য আরও ভাবনা। কপাল মন্দ। নবকুমার! তুমি আর কোথায় যাইবে? তোমাতে উমাপতিতে প্রভেদ নাই। তোমার বিপদেও তো আমার চিন্তা।"

নবকুমার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "মা! আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আমি কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমায় বাধা দিবেন না।"

এই বলিয়া নবকুমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করতঃ প্রস্থান করিলেন।

নবকুমার তথা হইতে একেবারে পদ্মাবতীর আলয়ে গমন করিলেন। পদ্মাবতী পুনরায় নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

নবকুমার কহিলেন, "পদ্মাবতি! উমাপতির সংবাদ শুনিয়াছ?"

পদ্মা। না, তাহা তো কিছু শুনি নাই।

নবকুমার তখন সমস্ত কথা পদ্মাবতীর গোচর করিয়া কহিলেন, "পদ্মাবতি! কল্য প্রত্যুষে আমি উমাপতির সন্ধানে যাত্রা করিব; কতদিনে ফিরিব, তাহার স্থিরতা নাই। তুমি যে সকল কথা বলিবে বলিয়াছিলে, তাহা যদি বিশেষ আবশ্যক হয়, তবে এই সময় বল।"

পদ্মাবতী দাঁড়াইয়া ছিলেন, সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শিরে যেন সহসা বজ্রাঘাত হইল! তিনি অদৃষ্টকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়া কহিলেন, "নবকুমার! আমি জানি, উমাপতি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁহার বিপদে তোমার বিপদ্। তাঁহার এ সংবাদে তোমার কখনও নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয় সত্য,—কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে? যদি স্থির-নিশ্চিত থাকিত যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে এবং তাঁহার বিপদ্ মোচন করিতে পারিবে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন সেরূপ কিছুই নিশ্চিত নাই, তখন তুমি কি করিবে? আমি তোমাকে তোমার এই কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতেছি না, কিন্তু তোমাকে ইহার পরিণাম বিবেচনা করিতে বলিতেছি।"

নবকুমার বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ; কিন্তু আমি কি বলিয়া স্থির থাকি? উমাপতির বৃদ্ধা জননীর কাতরতা যদি দেখিতে, তাহা হইলে আমার ন্যায় তুমিও সমস্ত ভবিষ্যৎজ্ঞান-শূন্য হইতে। কি করি, অন্য কোন উপায় নাই, কল্য প্রত্যুষে গোপালপুরে উমাপতির মাতুলের নিকট যাইব, তথায় যাইয়া কোন বিহিত বিধান করিতে পারি ভালই, নচেৎ অগত্যা আবার প্রত্যাগমন করিব। ইহা অপেক্ষা অন্য সদুপায় কিছু থাকে, বল।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; পরে কহিলেন, "তোমার উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। তুমি যাও, ঈশ্বর তোমার মানস সফল করুন। এরূপ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে মিত্রতার কার্য্য হয় না। সোদরাধিক প্রিয় মিত্রের নিমিত্ত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যাও—কিন্তু এক কথা, আমি সংবাদ পাই যেন।"

নবকুমার আবার ভাবিলেন, পদ্মাবতী রমণীরত্ন, আর একবার তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

তিনি অনেকক্ষণ পদ্মাবতীর বদন-পদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার দৃষ্টি পদ্মাবতীর অন্তরে প্রবেশ করিল। নবকুমার দেখিলেন, তথায় সরলতা ও পবিত্রতা ক্রীড়া করিতেছে। কে বলে পদ্মাবতী কলঙ্কিনী? নবকুমার তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত। নবকুমার পদ্মার হৃদয়ে কলঙ্ককণাও দর্শন করিলেন না। ইহা প্রণয়ের ধর্ম্ম—নূতন নহে।

গ্রীসীয়েরা প্রণয়-দেব কিউপিদ্‌কে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অপর সম্প্রদায়ী কেহ কেহ বলেন, প্রণয়দর্শন সলোমান অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ চসমাবিক্রেতাদিগের দর্শনযন্ত্র জাত দৃষ্টি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। এই দুই সর্ব্বথা বিভিন্ন মতই সত্য এবং প্রশংসনীয়। প্রণয় এক পক্ষে নিতান্ত অন্ধ, অপর পক্ষে তাহার দিব্য দর্শন। প্রণয়ী প্রণয়ীর পর্ব্বত-প্রমাণ দোষও সহজে লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তিলপ্রমাণ গুণকে তাল করিয়া দেখেন।

নবকুমার সোৎকণ্ঠায় কহিলেন, "পদ্মাবতি! আমাকে কি বলিবে বলিয়াছিলে—বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "বলিতেছি।"

এই বলিয়া নিকটস্থ পেটিকামধ্য হইতে একখানি অনুমোচিত লিপি বাহির করিলেন। লিপি নবকুমারের নামে শিরোনামাঙ্কিত। পদ্মাবতী লিপি নবকুমারের হস্তে দিয়া কহিলেন, "অল্পদিন হইল, বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই পত্র পাঠাইয়াছেন।" নবকুমার ব্যগ্রতা সহকারে লিপিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিশাবসানে

"রাজমার্গো হি শূন্যোঽয়ং রক্ষিণঃ সঞ্চরন্তি চ।
——————বহুদোষা হি শর্ব্বরী।"
—মৃচ্ছকটিকনাটকম্।

রাত্রি অনেক। দ্বিপ্রহরের ন্যূন নহে। গ্রাম প্রায় নিঃশব্দ। কেবল সময়ে সময়ে দুই একটা কুক্কুর শুষ্ক বৃক্ষপত্র অথবা অন্য কিছুর স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া ঘোর চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল বিদারিত করিতেছে, অথবা কদাচিৎ দুই একটি পক্ষী সহসা কুলায়ভ্রষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল স্বীয় রবে প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করিতে করিতে পুনরায় নীড়ান্বেষণ করিয়া লইতেছে; ক্ষণে ক্ষণে দুই একটা পেচকাদি নিশাচর পক্ষী স্ব স্ব বীভৎস রব বিস্তার করত মাতৃক্রোড়ে সুপ্ত বালক-বালিকার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্থানীয় শান্তিরক্ষক প্রহরী উচ্চরবে তাহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া গ্রামের সতর্কতা বিধান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ঝিল্লীগণের দিগন্তব্যাপী চীৎকার এবং রজনীসম্ভূত একটি অনিয়মবদ্ধ, যুগপৎ ভীতি ও প্রীতিজনক শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ লভিতেছে। রাত্রি চমচম করিতেছে। মানবগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এক্ষণে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখ-পূর্ণ স্বপ্নের মোহে অভিভূত হইতেছে। কোন অন্নবস্ত্র-বিহীন দরিদ্র হয় ত স্বপ্নদেবীর মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণিক রাজত্বসুখ-সম্ভোগ করিতেছে এবং হয় ত কোন কোন অতুল্য রত্নরাজি-পরিবেষ্টিত নরপতি ছিন্নকন্থাবিলম্বিত-স্কন্ধ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর-পোষণের ক্লেশানুভব করিতেছে। এইরূপে স্বপ্ন হয় ত কোন পাপী দুরাচারকে অননুভূতপূর্ব্ব সুখসংবেষ্টিত স্বর্গে তুলিতেছেন এবং বিশুদ্ধ পুণ্যাত্মাকে কুম্ভীপাক-নরকস্থ পূতি-পরিপূর্ণ হ্রদগর্ভে নিক্ষেপিতেছেন। স্বপ্ন! তোমার মহিমা অসীম! তুমি সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ, জ্ঞানীকে মূর্খ এবং মূর্খকে জ্ঞানী, ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে ধনী, যুবককে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধকে যুবক করিতেছ। তোমার ক্ষমতা জ্ঞানের অতীত। রজনি! তুমি তোমার চিরসহচরী নিদ্রা এবং তাঁহার কন্যা স্বপ্ন, তোমরা তিন জনে মিলিত হইয়া সংসারে কি রঙ্গই না দেখাইতেছ! রজনীর তমসাবরণে আবরিতকায় হইয়া কত কঠিনহৃদয় দস্যু নির্দ্দয়তা সহকারে অপরের জীবনসংহার ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে; কত দুরাচার উপযুক্ত সময় পাইয়া হীনপ্রাণা, সহায়হীনা, পতিব্রতা সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে; ভয়ানক ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ উদর-পূর্ত্তির নিমিত্ত এই সময়ে কত কত জীবের জীবন নাশ করিতেছে। রজনি! তোমার আগমনে অনেকে বিমল শান্তি লাভ করে বটে, কিন্তু অনেকের এতাদৃশ পাপপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় কেন?—সংসারে এত অনিষ্ট হয় কেন?

নবকুমার সুখময় শয়নে শায়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আইসে নাই। উমাপতির নিমিত্ত চিন্তা। কিরূপে কোথায় তাঁহার সন্ধান

পাওয়া যাইবে, সেই ভাবনায় তাঁহার মন অস্থির। সে অবস্থায় কি ঘুম আইসে? নবকুমার মানস-নেত্রে উমাপতিকে দেখিতে লাগিলেন, ভয়ানক বিপদ্ হইতে যেন তাঁহাকে মুক্ত করিতে লাগিলেন এবং পুনর্মিলনে যেন সানন্দে তাঁহার সহিত কত কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে উমাপতির সন্ধানে যাইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু নিদ্রা না আসায় শয্যা বিরক্তিকর হইয়া উঠিল; কি মনে হইল,—শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। দীপালোকসন্নিহিত হইয়া পদ্মাবতী-প্রদত্ত লিপি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইতেছি।

"মান্যবরেষু—

সসম্মান-নিবেদনম্—

বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের আদেশক্রমে আপনাকে লিখিত হইতেছে যে, যদিও কখন বাদশাহ বাহাদুরের সহিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ নাই, তথাপি তিনি অতঃপর আপনাকে এক জন প্রধান মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবেন। সে বিষয়ে যে কারণ আছে, তাহা মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিলে পরে জানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এই প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ বাদশাহ বাহাদুর মহাশয়কে একটি নিষ্কর জায়গীর প্রদানে অভিলাষ করেন। ঐ জায়গীর মহাশয়কে অন্ততঃ লক্ষ মুদ্রা আয় দিবে, আপনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে গ্রহণে স্বীকার করিলে তিনি আপ্যায়িত হইবেন।

জাঁহাপনা সর্ব্বদা মহাশয়ের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, এ জন্য মহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ বাহাদুরের সমস্ত মঙ্গল। তিনি অবিলম্বে মহাশয়কে স্বয়ং পত্র লিখিবেন। নিবেদন ইতি। তারিখ ২৭শে রমজান।

অনুগত
শ্রীগাহয়স উদ্দীন।"

নবকুমার যতবার এই লিপি পাঠ করিলেন, ততবার তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নবকুমার সামান্য ব্যক্তি—জাহাঙ্গীর ভারতসিংহাসন-সমারূঢ় বাদশাহ; উভয় পক্ষে এত প্রভেদ! এরূপ ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত, মানসম্ভ্রমগত, ক্ষমতাগত ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মিত্রতা! নবকুমারকে ধনী করিবার এবং তাঁহার সহিত মৈত্রী-সংস্থাপনের এত চেষ্টা কেন? নবকুমার বহুক্ষণ এই বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তিনি পদ্মাবতীর জীবন-বৃত্তান্ত অনেক জানিয়াছিলেন; বাদশাহের সহিত পদ্মাবতীর পূর্ব্বসম্বন্ধই ইহার কারণ বিবেচনা করিলেন। সে সিদ্ধান্তে তাঁহার চিত্তে সুখ উপজিল কি না, তাহা বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং পত্রখানি শয্যাতলে রাখিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

শয্যা যেন চিন্তার নিকেতন। যাঁহারা কখনও চিন্তার হস্তে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, রাক্ষসী চিন্তা, যে সময় নিদ্রা-প্রতীক্ষায় মানবগণ নিশীথে শয্যাশায়ী হয়, সেই সময়েই সমধিক দৌরাত্ম্য করে। এক্ষণে সমুচিত সময় উপস্থিত হওয়ায় নিশাচরী দুর্ভাবনা আসিয়া নবকুমারকে আক্রমণ করিল। তিনি নয়ন মুদিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবনা, ক্রোধ, হিংসা, শোক প্রভৃতির স্বভাব এই যে, যখন কোন এক কারণে ইহাদের একটি উদ্দীপ্ত হয়, তখন ক্রমে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য যত তাহার উত্তরসাধক কারণ এ কাল পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, সমস্তগুলি মনে উপস্থিত হয়। নবকুমারের পক্ষেও তাহাই হইল। দুর্ভাবনাজনক যত বিষয়—সবগুলি মনে হইতে লাগিল।

নবকুমার যখন এইরূপ চিন্তা-সাগরে মগ্ন আছেন, তখন কে যেন তাঁহাকে বাহির হইতে ডাকিল। স্বর নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পুলকিত হইলেন; ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া বসিলেন। পুনরায় সেই স্বরে আবার তাঁহার নাম উচ্চারিত হইল। স্বর নবকুমারের পরিচিত। আহ্বানকারী কে, তাহা তিনি বুঝিলেন। লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পরিচিত ব্যক্তির উদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

ভারতেতিহাস-পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, গাহয়স জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রধান উজীর ছিলেন। এই ব্যক্তি খ্যাতনাম্নী নুরজাহানের পিতা।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারাগারে

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ,
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥"

—মহানাটকম্।

পাঠক। উমাপতি কোথায়? তাঁহার অদৃষ্টে কি হইল?—এ সকল কথা জানিবার জন্য কি আপনার অণুমাত্রও ইচ্ছা জন্মে নাই? যদি জন্মিয়া থাকে, অগ্রসর হউন।

দুরাচারেরা উমাপতিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ তাহারা তাঁহাকে এইরূপে লইয়া চলিল, অথবা তাহারা তাঁহাকে লইয়া কোথায় চলিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত। পরিত্রাণের আশা দুরাশা, সুতরাং তিনি চেষ্টাশূন্য। মন নিতান্ত অস্থির; বিবিধ চিন্তায় হৃদয় আচ্ছন্ন।

সময়ে সময়ে উমাপতির গাত্রে বৃক্ষলতাদি স্পৃষ্ট হইতে লাগিল; তজ্জন্য তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহাকে কোন বনমধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি উমাপতিকে বহন করিয়া দুরাত্মারা নিশাবশেষে একটি স্থানে উপনীত হইল এবং তথায় তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইল। এই সময়ে সেই কর্কশভাষী পূর্ব্বপরিচিত বক্তা কহিল, "শুন, আজ একে সেই ঘরে রাখ। সকালে এর যা হয় করা যাবে। এখন রাত্রি নাই, তোমরা সকলে ঘুমাও। আর দেখ, এখন ওর মুখ বাঁধিয়া রাখার দরকার নাই। যদি চেঁচাইয়া গোল করে, তবে তখনই কাটিয়া ফেলিলেই চুকিয়া যাইবে।"

কথা-বার্ত্তা শ্রবণে উমাপতি অনুমান করিলেন, সেই ব্যক্তি দলপতি। তাহারা আবার উমাপতিকে আকর্ষণ করিল এবং সন্নিহিত একটি ঘরের চাবি খুলিয়া উমাপতিকে তথায় লইয়া গেল। এক্ষণে তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। অতি কষ্টে উমাপতির নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল, তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তিনি সে ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে বাহকেরা তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। উমাপতি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই স্থানের নাম কি?"

দুরাত্মাদের এক জন কঠিন-স্বরে কহিল, "তাহাতে তোমার দরকার কি?"

উমাপতি পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে এরূপে বন্ধন করার কারণ কি?"

উত্তর—যাঁর হুকুমে হইয়াছে, তাঁর কাছে জানিও।

উমা। তিনি কে?

উত্তর—আমাদের রাজা।

উমা। তাঁহার নাম কি?

উত্তর—কেন, তাঁকে তুমি জান না? তাঁর নাম কে না জানে? তোমার বাড়ী কোথায়?

উমা। সপ্তগ্রাম।

"সপ্তগ্রামে আমাদের প্রভুর নাম না জানে, এমন লোক আছে?"

উমা। তাঁহার নাম কি, বলিলে জানি কি না, বুঝিতে পারিব।

"বুঝিতে পার বা না পার, তুমি যখন জান না, তখন তোমায় বলায় দোষ কি?"

অপরাপর সকলে কহিল, "তা দোষ কি?"

পূর্ব্ববক্তা তখন সমুৎসাহে কহিল, "তাঁহার নাম রহিম। এ নাম যে জানে না, সে এখনও মায়ের পেটে আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র উমাপতি মাথায় হাত দিলেন। জীবনের আশা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। তিনি মনে করিলেন, "আর নিস্তার নাই। দুরাত্মা রহিম! ওঃ! কি ভয়ানক! আমি তাহার নিকট বন্দী হইয়াছি?"

এইকালে দেশ-মধ্যে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। দস্যুগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে এই রহিমের দল বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ। রহিমের

নাম জানিত না, এমন লোকও ছিল না। মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশু হইতে পলিতকেশ স্থবির পর্য্যন্ত সকলেই রহিমের নাম-শ্রবণে কম্পিত ও শঙ্কিত হইত। তখন এমন স্থান ছিল না, যথায় রহিম দৌরাত্ম্য করে নাই। মানবজীবন নাশ, লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম রহিম-সম্প্রদায়ের লোকেরা সতত অকাতরে করিত। তাহাদের উপদ্রবশান্তির নিমিত্ত রাজশাসন কম ছিল না। শাসনকর্ত্তার এমন আজ্ঞা ছিল—যে ব্যক্তি রহিমের মস্তক দেখাইতে পারিবে, সে তদ্দণ্ডে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। এই অর্থলোভে বিস্তর লোক রহিমকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহার কারণ, রহিম-সম্প্রদায় অধিক কাল এক স্থানে থাকিত না; সুতরাং কেহই তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিত না।

উমাপতি দুরাত্মা রহিমের নাম শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি সেই প্রসিদ্ধ দুরাত্মা রহিমের করকবলিত হইয়াছেন, সুতরাং রক্ষা কোথায়? উমাপতি দস্যুদিগকে আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়া মস্তকোত্তোলন করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন, তাহারা ইত্যবসরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কারাগারের অবস্থা দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। কিন্তু দারুণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন, তথায় বায়ু-গমনের একটি ভিন্ন অপর পথ নাই। সে পথও দস্যুরা সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। ঘর্ম্মে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ থাকার ক্লেশ, অপিচ বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবজনিত যাতনায় তিনি জীবন্মৃত হইয়া উঠিলেন। বিধাতার নাম স্মরণ করিতে করিতে উমাপতি ভূতলশায়ী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দস্যু-সমক্ষে

"He is the rock'—the oak, not to be Windshaken."

—Shakespeare (Coriolanus,)

অরণ্যস্থল উষাসমাগমে কি মনোহর শোভা ধারণ করিল। বহুশ্রমকাতর কলাধর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া বিশ্রাম লভিতে চলিলেন। পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে সমুজ্জ্বল-সহস্রকরধারী কমলিনী হৃদয়েশ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়া সমাগত হইলেন। নিশার শিশিরসিক্ত পত্রপুঞ্জে সেই আভা প্রদীপ্ত হইয়া গভীর জলধিতলস্থ শুক্তি-হৃদয়সম্ভূত উজ্জ্বল মুক্তাস্তরের শোভাকে লজ্জা দিতে লাগিল। সরসী-শোভিনী সরোজিনী স্মিতবিকসিতাননে প্রাণেশ্বর প্রভাকরকে দেখিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সুস্নিগ্ধানিলহিল্লোলে বৃক্ষপ্রশাখা, বনবিভূষিণী লতিকা, বৃন্তসহ কমলিনী সকলেই বিকম্পিতা হইতে লাগিল। বিহগেরা কুলায়াশ্রয় ত্যাগ করিয়া সপ্তস্বরনিনাদী কূজন করিতে করিতে ব্যোমপথে উড্ডীন হইল। সর্ব্বত্রই তেজ, উৎসাহ, রমণীয়তা বিরাজমান। উষাসময়ের স্বভাব শোভা যে দর্শন করে নাই, তাহার চক্ষু বৃথা, তাহার জন্ম বৃথা। প্রকৃতির প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই পরম রমণীয়তায় পূর্ণ। বিশেষতঃ তাহার এই পরিচ্ছেদ অতীব আশ্চর্য্য।

ক্রমে বনভূমি প্রদীপ্ত হইল। দস্যুরা একে একে সুপ্তোত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। রহিম একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া অনুচরগণকে ডাকিল; তাহারা সকলে আসিয়া রহিমকে বেষ্টন করিল। তাহাদের সংখ্যা বিংশতির ন্যূন নহে। রহিম তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই সব, এখানে আর দেরী করিলে আমাদের বিপদ্ হইতে পারে। আমি বলি, আজিই আড্ডা উঠান যাক্। তোমরা কি বল?"

সকলে একবাক্যে কহিল, "সেই ভাল, আজই।"

তখন রহিম আবার কহিল, "একটা কাজ আছে। কালি রাত্রে যাকে ধ'রে আনা হয়েছে, তোমাদের সকলকে বলেছি, সে আমার কত অপমান করেছে। তাকে কাট্‌তে হবে। সে কাজ এখনই শেষ করা যাউক। তাকে নিয়ে এস।"

সকলেই ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তিন ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে উমাপতিকে আনিতে চলিল। কেবল এক জন এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইল না। সে ব্যক্তি নির্ব্বাক্ রহিল। রহিম তাহা লক্ষ্য করিল—তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, "দেলবর! তুমি কি বল? তোমার যেন আলাহিদা মত বোঝা যাচ্ছে।"

দেলবর কহিল, "সে কি কথা? আপনার মতের উপর কি আমার মত?"

রহিম কহিল, "কেন দেলবর, আজ এ কথা কেন? তুমি দলে এসে অবধি চিরকাল তোমার কথা এক দিকে, আর সকলের কথা এক দিকে।"

দেলবর সবিনয়ে কহিল, "আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম।"

রহিম। তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যেন তুমি আর কি ঠাহরিয়াছ; তা কি বল?

দস্যু-সম্প্রদায়-মধ্যে দেলবর বিশেষ বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত; সুতরাং রহিম সকল সময়েই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। এই জন্যই অদ্য দেলবরের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিল।

অনতিবিলম্বে দস্যুরা উমাপতিকে তথায় উপস্থিত করিল। উমাপতির মূর্ত্তি গম্ভীর, শান্ত, অকাতর, মনোযোগশূন্য। তাঁহার বিপদের পরিমাণ বিবেচনায় তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি যেন এ সকল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না, কিছুতেই যেন তাঁহার লক্ষ্য নাই, তাঁহার বদনে যেন বিরক্তি ব্যক্ত হইতেছে। এরূপ বিপদে কাতর না হইয়া তিনি বিরক্ত হইতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য। সাহস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু তিনি যে কি ভরসায় সাহসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

অবরুদ্ধ উমাপতি আসিবামাত্র সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার কমনীয় নির্ভীক কান্তি দর্শনে দস্যুগণ চমৎকৃত হইল। উমাপতির ভয়হীন দৃষ্টি একে একে সকল দস্যুর উপর নিপতিত হইল। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি দেলবরের প্রতি নিপতিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ পরিচিতের ন্যায় তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেলবর তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, এ জন্য উমাপতির প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া একটি বৃক্ষপত্র ছিন্ন করিতে লাগিল।

এই সময় রহিম তীব্রস্বরে কহিল, "কাফের! কি ভাবিতেছ, দুর্গানাম জপ করিয়া লও। আর দেরী নাই।"

নির্ভীক উমাপতি অবিকৃতভাবে উত্তর দিলেন, "দেরী নাই, তাহা আমি জানি; তা বলিয়া কি করিব? তোমাদের নিকট আমি দয়া প্রার্থনা করিতেছি না। তোমাদের দয়ায় যাহার জীবন, তাহার জীবনে ধিক্।"

রহিম কুপিত-স্বরে কহিল, "তুমি ত দয়া প্রার্থনা কর না, কিন্তু তোমাকে দয়া করে কে?"

উমা। তোমরা আমাকে মারিবে, তাহা আমি জানি। আমি নিঃসহায় দুর্ব্বল, সুতরাং পরিত্রাণের আশা নাই; কিন্তু তোমারও পরিত্রাণ নাই। রহিম, তুমি আমাকে মারিয়া জগতে পার পাইবে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে এ অপরাধ ঢাকা থাকিবে না; তখন রক্ষা থাকিবে না।

এ কথায় রহিম 'হা-হা' শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "হিঁদুর আবার ঈশ্বর কি? তোমরা পাথর কাটিয়া পূজা কর, আমরা তাহার মাথায় দাঁড়াইয়া পা ধুই।"

উমাপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "তুমি মূর্খ; তোমার সহিত এ বিষয়ে তর্ক করা বৃথা। আমাদের ধর্ম্মই যদি মিথ্যা হয়, তোমাদেরও তো ধর্ম্ম আছে; তাহাতেও তো পাপ-পুণ্যের বিচার আছে।"

রহিম আবার হাসিয়া কহিল, "কাফের! তোমাকে মারায় আমাদের পাপ নাই। আমাদের ধর্ম্ম বলে, বিধর্ম্মী যত মারা যায়, তত পুণ্য হয়—ততই স্বর্গে সুখ বাড়ে।"

উমাপতি কহিলেন, "তবে যে কার্য্যে সুখ ও স্বর্গ দুই লাভ হইবে, তাহাতে দেরী কেন?"

রহিম অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দেখ, কোন কারণে আজ তোমার প্রাণ থাকিল। কালি নিশ্চয় তোমার জীবন ফুরাইবে। তোমার অদৃষ্টে আর একদিন পৃথিবীতে বাস আছে এই সময় তুমি ইষ্টমন্ত্র জপ কর।"

এই বলিয়া রহিম চরদিগকে পুনরায় উমাপতিকে সেই গৃহে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল এবং এবার সাবধানতা সহকারে তাঁহার হস্ত-পদ বাঁধিতে বলিয়া দিল। চরেরা উমাপতিকে লইয়া গেল। রহিম ও দেলবর অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া ফুস্ ফুস্ শব্দে অনেক কথা কহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভগ্ন-গৃহে

"He is truly valiant that can wisely suffer
The worst that man can breathe."
—(Shakespeare Tiomon—of Athens.)

দস্যুরা উমাপতিকে পুনরায় গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিল। তাঁহার হস্তপদ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিল

এবং অতিশয় সতর্কতা সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিল। উমাপতি এক্ষণে দেখিলেন যে, তাঁহার কারাগার একটি জীর্ণ দেবমন্দির। মন্দিরমধ্যে একটি অনুন্নত লিঙ্গমূর্ত্তি শিব সংস্থাপিত। একটি দ্বার ভিন্ন তথায় আলোক অথবা অন্য কিছু যাইবার পথ নাই; সে দ্বারটিও দস্যুরা অতি সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। মন্দির দারুণ অন্ধকার, নিতান্ত জীর্ণ এবং তথায় সর্ব্বদা জল উঠিতেছে বলিলেই হয়। উমাপতি দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিভাবে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার অদৃষ্টে এত কষ্ট! দিনান্তে একটি বিল্বদলও আপনার পূজার্থ প্রদত্ত হয় না,—ভোগাদি ত দূরের কথা। দুরন্ত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী যবনেরা সর্ব্বদা আপনার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতা ধ্বংস করিতেছে; দেব! আপনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতেছেন! এ সকল কালমাহাত্ম্য, আপনার দোষ নহে। ঘোর কলির শাসনে দেবদেবী অবনী ত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে বিশ্রাম করিতেছেন। এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তরখণ্ডের সহিত আপনার আর অণুমাত্রও সম্পর্ক নাই। আপনি অনেক কাল ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু দেবাদিদেব! আপনিও সামান্য শঙ্কায় শঙ্কিত, ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। বসুন্ধরা পাপমগ্না এবং পুণ্যভূমি যবনাকীর্ণা হইলেন দেখিয়া আপনারা সংসারের রক্ষণাবেক্ষণে ক্ষান্ত হইলেন। তবে প্রভো, আমাদের উপায় কি হইবে? আপনারা আমাদের ত্যাগ করিলে আমরা কাহার আশ্রয় লইব? ভগবন্! আমাদের তো নিস্তার নাই।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনার উদ্দেশ্যে এ সকল বাক্যবর্ষণ করায় ইষ্টসম্ভাবনা অতি বিরল। অদৃষ্টে যাহা হইবে, তাহা তো পূর্ব্ব হইতে স্থিরনিশ্চিত রহিয়াছে;—এক্ষণে সহস্র রোদনেও আপনারা তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন না।

'বিধাতৃ-বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।'

তবে আর কেন? অনর্থক দিবারাত্র রোদনেও পরিণাম পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকালে মনুষ্যের মুক্তির নিমিত্ত যে উপায় বিহিত হইয়াছে, তাহাই হইবে; তদধিক কোন ক্রমেই ঘটিবে না; সুতরাং স্থির থাকাই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত। প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে বাহিরে যে কি কাণ্ড হইতেছে, উমাপতি তাহা জানিতে পারিতেছেন না। সময়ে সময়ে কোন দস্যুর কণ্ঠস্বর অথবা হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। সহকার-শাখামধ্যস্থ ছায়াসেবনকারী দাঁড়কাক সময়ে সময়ে গম্ভীর ও অনুচ্চস্বরে এক একবার ডাকিতেছে; সে স্বরও উমাপতির কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে দুইটি টিকটিকি পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সহসা একটি অপরের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ে ছুটিতে লাগিল। উভয়ে নিকটবর্ত্তী হইলে আক্রমণকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া পুচ্ছ বক্র করত একবার টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উমাপতির শ্রবণে প্রবেশ করিল, কিন্তু এ সকল কিছুই হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। কেন? উমাপতি এত অন্যমনস্ক কেন? ইহার একই উত্তর—নিদারুণ চিন্তা। মৃত্যুর ভীষণ ব্যাদিত বদন মস্তকোপরি সন্দর্শন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব এবং স্বদেশবর্জ্জিত হইয়া এই দুরন্ত পাপচারী দস্যুগণের হস্তে অজ্ঞাত অরণ্যে মৃত্যু হইবে, তাহাতে নিস্তারাশা দুরাশা, ইহা মনে হইলে কাহার হৃদয় না শুষ্ক হয়? কে চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে পারে?

উমাপতি সেই নির্জ্জন কারাবাসে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। কল্য প্রত্যূষে তাঁহার মৃত্যু অব্যর্থ, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সে সময়ের কত বিলম্ব, তজ্জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন। উন্মনা হইয়া সেই সময়-সমাগমের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "আর কেন? মৃত্যুর কঠিন আক্রমণ হইতে যখন কোনক্রমেই নিস্তার নাই, তখন আর বিলম্বে কাজ কি? যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। এ অবস্থা নিতান্ত ক্লেশকর ইহা অপেক্ষা মৃত্যু অবশ্য শ্রেয়ঃ।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। স্থবিরা, স্নেহময়ী, রোরুদ্যমানা জননীর মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপটে সমাগত হইল। তাঁহার হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইল। তিনি নিতান্ত অস্থির হইলেন। উমাপতি স্বীয় জীবনের নিমিত্ত তাদৃশ কুণ্ঠিত নহেন; তাহা হইলে যৎকালে দুরাত্মা রহিম মৃত্যু আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে, সেই সময় হইতে অচেতন থাকিতেন। তিনি এতক্ষণ অপ্রতিবিধেয় মৃত্যুর নিমিত্ত কাতর হন নাই। যাহা হইবেই হইবে, কিছুতেই যাহার পরিবর্ত্তন হইবে না, তজ্জন্য অনর্থক কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। অধুনা জননীর কথা মনে

হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কাতর হইলেন। তাঁহার জননীর তিনি ভিন্ন আর সন্তানাদি নাই, আবার তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থা। এরূপ সময়ে সেই একমাত্র তনয়চ্যুত হইলে তাঁহার যে ভয়ানক ক্লেশ জন্মিবে, উমাপতি তাই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে জননীর কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিবে, উমাপতি কল্পনাচক্ষে তাহা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে উমাপতি "বিধাতঃ! সকলই তোমার ইচ্ছা" বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভাবনার প্রকৃতি এই যে, তাহার বিরাম থাকে না। একটি গুরুতর ভাবনার কারণ হইলে সেই সঙ্গে তেমনই আর একশতটি আসিয়া জুটে। অলক্ষ্যভাবে উমাপতির হৃদয়কন্দরে মুক্তকেশীর মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। এই মূর্ত্তি স্মৃতিরাজ্যে সমুদিত হইবামাত্র উমাপতি বিকলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রণয়রত্ন অমূল্য, যাঁহারা প্রণয়ী, তাঁহারা জানেন—প্রণয় পার্থিব পদার্থ নহে, ইহা স্বর্গীয় সামগ্রী। এ রত্নের কত মূল্য, তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। উমাপতির মস্তকোপরি উর্দ্ধতন্তুতে তীক্ষ্ণধার তরবারি ঝুলিতেছে, অন্ধকার নিশাবসানে তাঁহার শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিবে;—তথাপি এ অবস্থায় মুক্তকেশীর চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। মুক্তকেশী-সম্বন্ধীয় কত চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে মুক্তার মুখকমল তাঁহাকে আনন্দরসে ভাসাইত, অদ্য সেই মুক্তার মুখ মনে পড়িয়া তাঁহাকে যাতনা দিতে লাগিল। উমাপতি মুক্তার প্রেমের পরিমাণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাহা অসীম। যে মুক্তার প্রণয় এত অধিক, চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত বিরহ হইলে সেই মুক্তার কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি আরও ব্যাকুল হইলেন। কল্য স্বীয় জীবিত দেহ মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি যে পরিমাণ কাতর হইয়াছিলেন,—তাঁহার বিরহে মুক্তার কষ্ট হইবে, এ চিন্তায় তদপেক্ষা বিস্তর ক্লিষ্ট হইলেন। এই সময় ভাবনাপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া প্রিয়-বয়স্য নবকুমার উমাপতির চিত্ত-সাগরে প্রবেশ করিলেন। যদি যথাসর্ব্বস্ব দিলে একবার,—জন্মের শোধ একবার নবকুমারের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকে, উমাপতি তাহাতেও প্রস্তুত। তিনি তাঁহার মাতা বা মুক্তকেশী কাহারও সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক নহেন। কারণ, তাঁহারা অবলা। তাঁহাদের হৃদয় সহস্র সমুন্নত হইলেও তাহা কখনই তাঁহার অথবা নবকুমারের হৃদয়ের সমান নহে। বিপৎসমাগমসম্ভাবনায় যে সকল রমণী শোকবিহ্বলা হয়, এতাদৃশ দুরপনেয় বিপদ্ সমুপস্থিত দর্শনে তাহাদের অন্তঃকরণে কি তীব্র যাতনাই জন্মিতে পারে।

ক্রমে রজনী বিশ্বসংসারকে আবরণ করিল। উমাপতি তাহা জানিতে পারিলেন না; তাঁহার সে সকল দিকে লক্ষ্য নাই; লক্ষ্য থাকিলেও তিনি যে গৃহে বদ্ধ আছেন, তথায় দিবা-রাত্রি সমান। বিশেষতঃ তিনি চিন্তায় মগ্ন। দেখিতে-দেখিতে রাত্রি ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল। উমাপতি চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এ আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই; অতএব যতক্ষণ জীবিত থাকা যাইবে, ততক্ষণ অবিশ্রান্ত চিন্তানল হৃদয়কে দহন করিবে। তাহা অসহ্য; সুতরাং যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, তাহাই মঙ্গল। এই বিবেচনায় উমাপতি মৃত্যুকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। বাতুল! মৃত্যু কি তোমার আজ্ঞাধীন? তুমি যখন তাহাকে আহ্বান করিবে, তখন তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে না এবং যখন তাহাকে নিষেধ করিবে, তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। উমাপতি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। মৃত্যু আসিল না দেখিয়া হতাশ্বাস হইলেন; অনন্যোপায় হইয়া অবিরত উষা-সমাগম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্য সকলই তাঁহার বিপক্ষ। দুঃখের দিন স্বভাবতঃ কিছু বড় বোধ হয়। উমাপতি উষার নিমিত্ত এত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তথাপি উষা আসিল না। তাঁহার পক্ষে সে রাত্রি যেন অনন্ত বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ রাত্রি অদ্যও যাহা, কল্যও তাহা;—উমাপতিকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত সে রাত্রি কখনই সংবর্দ্ধিতা হয় নাই। তাঁহার হৃদয় দুঃখ-দণ্ডে মথিত হইতেছে, এই জন্য যেন সে রাত্রির শেষ নাই বোধ হইতেছে। আবার এক জন সুখসাগর-সন্তরণকারীর নিকট সেই রাত্রিই হয় তো ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সংসারের এই গতি। যখন যে যে অবস্থায় থাকে, সমস্ত পার্থিব পদার্থ—কি ভৌতিক, কি মানুষী, সকলেই একবাক্য হইয়া

তাহার সেই অবস্থার প্রতিপোষণ করে। উমাপতির পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে।

এই সময় ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হইল। উমাপতি ব্যস্ত হইয়া সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ;—দেখিলেন, মুক্তপথ দিয়া একটি মনুষ্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি তাহাকে সোৎসুকে কহিলেন, "কি, ভোর হইয়াছে? আঃ! আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছ? ধরিতে হইবে না। চল, আপনিই যাইতেছি।"

প্রবেশকারী উমাপতির সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "চুপ কর। ভয় নাই, আমি তোমাকে ধরিতে আসি নাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

উমাপতি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "কোথায় যাইব?"

আগন্তুক কহিল, "যেখানে আমি বলি, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে না।"

উমা। আমার যে অনিষ্ট হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট অসম্ভব। আমি সে শঙ্কায় শঙ্কিত নহি।

আগ। ভাল। আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

উমাপতি বিস্মিত হইলেন ;—ভাবিলেন, ইহা চাতুরী। আবার ভাবিলেন, আমি উহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন, আমার সহিত চাতুরীর প্রয়োজন? তবে এ ব্যক্তির সহিত যাওয়ায় হানি কি? আর কিছু হউক না হউক আপাততঃ এই বায়ুবিহীন মন্দির হইতে তো বাহির হইব। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "চল।"

প্রবেশকারী অগ্রসর হইল। উমাপতি তাহার অনুসরণ করিলেন। এ ব্যক্তি দেলবর। সে উমাপতির জীবনরক্ষা করিবে সঙ্কল্প করিয়াছিল, এ জন্যই রহিমের কানে কানে যাহাতে বন্দীর কল্য মৃত্যু হয়, তদ্বিষয়ক মন্ত্রণা দিয়াছিল। বন্দীকে মুক্ত করায় তাহার কি ইষ্ট, তাহা আমরা এক্ষণে বলিতে পারি না।

উমাপতি ও দেলবর অবিশ্রান্তভাবে বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চলিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্রামলাভের নিমিত্ত এক স্থানে উপবেশন করিলেন। এই সময় প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে দর্শন দিলেন। দেলবর কহিল,—"চল, তোমাকে বনের পথ ছাড়াইয়া দিয়া আসি।"

উভয়ে আবার চলিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তাঁহারা বন অতিক্রম করিয়া একটি প্রান্তরে পতিত হইলেন। প্রান্তরের অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হইল। উমাপতি আহ্লাদে কহিলেন, "সম্মুখের ঐ গ্রাম গোপালপুর। ঐ স্থানে আমার মাতুলালয়। আঃ!"

দেলবর নিশ্চিন্তভাবে কহিল, "হাঁ, ঐ গ্রাম গোপালপুর বটে। এক্ষণে তুমি যাইতে পারিবে। আমি বিদায় হই।"

উমাপতি সকৃতজ্ঞস্বরে কহিলেন, "তুমি—আঁ্যা, আপনি কোথায় যাইবেন?"

দেল। আমি পুনরায় দলে যাইব।

উমা। আপনার ন্যায় সৎমনুষ্য দস্যুদলে না থাকিলেই ভাল হয়।

দেলবর ঈষৎ হাসির সহিত কহিল, "তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

উমা। অতিশয় সন্তুষ্ট হই।

দেল। আচ্ছা, তাহাই হইবে, আমি আর দস্যুদলে যাইব না।

উমা। তবে এখন কোথায় যাইবেন?

দেল। অন্য স্থানে—প্রয়োজন আছে।

উমা। দুই দিন পরে গেলে হয় না?

দেল। কেন?

উমা। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রাণরক্ষককে সকলের নিকট দেখাইতাম।

দেল। সে আশা পূর্ণ হইবে।

উমা। কিরূপে?

দেল। আবার দেখা হইবে।

উমা। কোথায়?

দেল। তোমার বাড়ীতে।

উমা। আমার বাটী আপনি জানেন?

দেল। জানি।

উমা। কবে দেখা হইবে?

দেল। অতি শীঘ্র।

উমাপতির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "আপাততঃ আমার জীবনরক্ষকের নামটিও কি শুনিতে বঞ্চিত থাকিব?

"আমার নাম? আমার নাম শুনিবে? অবশ্য তাহা শুনিতে পাইবে। কেন পাইবে না? আমার নাম দেলবর।"

এই বলিয়া দেলবর, আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কহিলেন, "তুমি নির্ভয়ে যাও। ঈশ্বর

তোমার মঙ্গল করুন। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে দেবদ্বয় অরণ্যাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইলেন। উমাপতি কতক্ষণ সে দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা দ্রুতপদে গোপালপুরের উদ্দেশে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রণয়িনী-সমক্ষে

"অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী?
আর কি পাব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
পতিহারা রতি কি লো পাবে রতিপতি?"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ব্রজাঙ্গনা-কাব্য।)

হরিহর পুনরায় উমাপতিকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। উমাপতি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া উমাপতিকে বাটী যাইতে আজ্ঞা দিলেন; যাইবার সময় একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে বলিলেন। মাতুল-ভাগিনেয় একত্র বসিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর উমাপতি মাতুলচরণে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন।

পাঠক! উমাপতি যাইবার পূর্ব্বে, চলুন আমরা একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অবস্থা দেখিয়া আসি। বেলা পড়িয়াছে, গৃহিণী অন্য-মনস্কভাবে বসিয়া আছেন। উমাপতি সেই দিন প্রাতে আসিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণ-গোচর হয় নাই। বড় চিন্তিত। উমাপতির নিরুদ্দেশ তাঁহার চিন্তার কারণ।

মুক্তকেশী কোথায়? ঐ প্রকোষ্ঠে মলিনা, শুষ্ক-মুখী, বিষণ্ণা মুক্তকেশী বসিয়া কি ভাবিতেছেন? যৌবনোন্মুখী বালিকা-হৃদয়সম্ভূত প্রণয় কি আশ্চর্য্য সামগ্রী! যে দিন, যে দণ্ডে বালিকা প্রণয়কে হৃদয়ে স্থান দান করেন, সেই দণ্ড হইতেই সংসার তাঁহার চক্ষে নূতনরূপে চিত্রিত হয়। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভাসে। সমস্ত পদার্থেই তিনি নূতন নূতন আমোদ লক্ষ্য করিতে থাকেন। বালিকার চক্ষে সেই দিন হইতে সংসার অবিশ্রান্ত আমোদের স্থল বলিয়া বোধ হয়। মুক্তকেশী সেই প্রণয়-সাগরে পড়িয়াছেন। তিনি মনে মনে উমাপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। লজ্জাবতী বালিকা মনের এই দুর্দ্দমনীয় ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভাবিতেন, হয় তো আশা ফলবতী হইবে না। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। উমাপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে স্থির হইল। মুক্তার সুখের সীমা রহিল না। তাঁহার দেহের লাবণ্য আরও বর্দ্ধিত হইল। সুখ-সৌধের যতদূর উপরে উঠা যায়, তিনি ততদূর উপরে উঠিলেন। কিন্তু বিধাতা আবার তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাঁহার হৃদয় যখন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া রহিয়াছে, তখন সহসা উমাপতির নিরুদ্দেশ-সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, সুখ-সৌধ ভঙ্গ হইয়া গেল। সুখ-সমুদ্রে বিহারিণী বালিকা সহসা বিষাদ-সাগরে নিপতিত হইলেন। আশা-ভরসা সকলই শিথিল-মূল হইল। আবার শুনিলেন যে, উমাপতি সপ্ত-গ্রামেও যান নাই, তখন তিনিও পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মনোবেগ যতদূর পারেন গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, লোকে তাঁহার তদ্বিধ ভাব দেখিলে কি মনে করিবেন, এই আশঙ্কায় মুক্তকেশী মনের ক্লেশ যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিতেন; লোকের সমক্ষে তাঁহার হৃদয়ে যেন কোন চিন্তাই নাই, এইরূপ ভাণ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি একাকী উপবিষ্ট রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সমুচিত সময় পাইয়া চিন্তা তাঁহাকে অব্যাঘাতে গ্রাস করিয়াছে, সেই জন্য এক্ষণে মুক্তকেশী এত বিমর্ষ। ভাবনায় যেন তাঁহার মুখখানি ছোট দেখাইতেছে।

এইরূপ সময়ে উমাপতি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অবনত-মুখে মুক্তকেশী চিন্তায় মগ্ন—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! উমাপতি! তুমি কোথায়? তুমি যেখানে থাক, নিরাপদে থাক। দাসীর অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছে, তাহা হইবে।"—এই বলিয়া মুক্তকেশী বদনোত্তোলন করিলেন। যেমন বদনোত্তোলন করিলেন, অমনি তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তথায় আহ্লাদের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার হৃদয়েশ উমাপতি দণ্ডায়মান। তৃষিত চাতকিনী বারিধারা পাইল! মুক্তকেশীর নির্জ্জীব দেহে জীবনের সঞ্চার হইল। উমাপতি বলিলেন, "মুক্তকেশী! তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। আমি এতদিন অন্ধকারে

ছিলাম, ভাবিতাম, হয় তো তুমি আমাকে ভালবাস না, অদ্য সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। মুক্তকেশী! আমি সুখী! তুমি যাহার সুখদুঃখের নিমিত্ত চিন্তিত, তাহারই সার্থক জন্ম। তুমি আর চিন্তা করিও না। আমি তোমারই।"

স্মিতবিকসিতাননা মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?"

উমাপতি সংক্ষেপে উত্তর জ্ঞাপন করিলেন।

মুক্ত। মা'র সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?

উমা। হইয়াছে।

মুক্ত। তিনি আমাদের উভয়কে একস্থানে জানিয়া কি মনে করিতেছেন?

উমা। প্রিয়ে! দুই দিন পরে যাহার সহিত কথা না কহিলে লোকে দুষিবে, দুই দিন পূর্ব্বে তাহার সহিত বাক্যালাপে দোষ কি? সে যাহা হউক, আমি অদ্য বাটী যাইতেছি; তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আবার শীঘ্র আসিব।

এই বলিয়া উমাপতি বাহিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

"দৈব যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।"
—কাশীরাম দাস (মহাভারত।)

পরদিন বৈকালে নবকুমার ও উমাপতি বাটীর মধ্যে বসিয়া উমাপতির মাতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্ব খণ্ডের উপসংহারকালে নবকুমারকে কে আহ্বান করিয়াছিল। সে আহ্বানকারী উমাপতি। উমাপতি রাত্রে বাটী আসিয়া মাতার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন যে, অদ্য নিশাবসানে নবকুমার তাঁহার সন্ধানে যাইবেন; এজন্য উমাপতি তৎক্ষণাৎ নবকুমারকে সংবাদ দিতে গমন করেন। অধুনা তাঁহারা একত্রে বসিয়া কত কথা কহিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সাক্ষাতের নিমিত্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়ে বাহিরে আসিলেন। উমাপতি দেখিলেন, সম্মুখে দেলবর। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে প্রকৃত্যনুসারে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "নবকুমার! ইনিই আমার প্রাণরক্ষক; ইঁহার নাম দেলবর।"

নবকুমার দেলবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয় যে আমাদের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আপনার নাম চিরদিন ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় ধ্যান করিব।"

দেলবর কহিল, "সে কথা বলিবেন না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা উপকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রক্তমাংসের শরীর ধরিয়া কে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে?"

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া দেলবরকে কহিলেন, "মহাশয়! ইঁহাকে জানেন না। ইনি আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু; ইঁহার নাম নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দেলবর অনেকক্ষণ চিন্তিতের ন্যায় থাকিয়া কহিলেন, "মহাশয় কখন মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন কি?"

নব। অনেক দিন হইল, হিজলী হইতে বাটী আসিবার পথে এক রাত্রি মেদিনীপুর চটীতে ছিলাম। কেন বলুন দেখি?

দেল। তখন আপনার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন? বোধ হয়, তিনি আপনার স্ত্রী হইবেন।

নব। হাঁ, সে সব আপনি জানিলেন কিরূপে?

দেল। সে অনেক কথা; বলিতেছি, শুনুন। মহাশয় অতি ভদ্র ব্যক্তি। আপনার স্ত্রীর চরিত্র আরও প্রশংসনীয়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় একখানি পাল্কী যায়; তাহাতে আপনার স্ত্রী ছিলেন, কেমন? আমরা সদলে সেইখানে ছিলাম। দস্যুরা সদলে সেই পাল্কী মারিবার উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, "তোমরা কেন এ পাল্কী মারিবে? দেখিতে পাইতেছ না, উহার সঙ্গে কিছুই নাই। বিনালাভে মারিয়া কি হইবে?" দস্যুরা আমার উপর রাগ করিল। তাহারা কহিল, "তুমি পেগম্বর, তাই উহার নিকট কিছু নাই জানিতে পারিলে!" এই বলিয়া সকলে পাল্কী মারিতে উঠিবে, এমন সময়ে আর একখানি বেশ জাঁকজমকের পাল্কী আসিল। এ পাল্কীতেও একটি স্ত্রীলোক কবাট মুক্ত করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদাদি দেখিয়া দস্যুরা স্থির থাকিতে পারিল না; কাহারই বা সাধ্য তখন নিষেধ করে? তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সে পাল্কী আক্রমণ করিল এবং

পাল্কীতে যাহা কিছু ছিল, তাহা গ্রহণ করিল। রমণীকে মারিল না; কিন্তু দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

নব। (আশ্চর্য্যভাবে) ঠিক কথা। তাহারই ক্ষণপরে আমি তথায় উপস্থিত হই।

দেল। আজ্ঞা হাঁ। আমি আপনার কণ্ঠস্বরে অন্ত চিনিতেছি। আপনার স্ত্রীর নাম বুঝি কপালকুণ্ডলা?

নব। হাঁ।

উমা। সে কি রহিমের দল?

দেল। রহিমের দল নয় তো কি? রহিমের দল সর্ব্বব্যাপী। আজকাল তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ কঠিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, তখন এত ছিল না। যাহা হউক, আরও শুনুন। তার পরদিন প্রাতে পথে আবার কপালকুণ্ডলার পাল্কী দেখা গেল। তখন আপনারা বাটী আসিতেছিলেন। রহিম হুকুম দিল, 'পাল্কী মার।' তখন আপনার স্ত্রীর হাতে দুই একখানি অলঙ্কার ছিল। আমি বলিলাম, "যাহা কিছু আছে, তাহা যদি আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে মারিবার প্রয়োজন কি?' তাহারা বলিল, 'তাহা যদি পার, তবে আর মারিব না।' এই কথা শুনিয়া আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক সাজিলাম এবং পাল্কীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি কহিলেন, 'আমার তো কিছুই নাই।' আমি তাঁহার হাতের গহনা দেখাইলাম। উমাপতি, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, একটি হাতীর দাঁতের বাক্সে বহুমূল্য নানাবিধ জড়াও গহনা ছিল; সেগুলি সমস্ত এবং হাতের বালা দুগাছি পর্য্যন্ত খুলিয়া সানন্দে আমাকে দান করিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। পরে এক দৌড়ে পলাইয়া আসিলাম। দস্যুরা আমার উপর বড় খুসী হইল। রহিম কহিল, 'এ সকল অলঙ্কার দেলবর পাইবে।' কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না। সেই দিন হইতে দলে আমার বড় মান বাড়িল। রহিম আমাকে বরাবর ভালবাসিত—সেই দিন হইতে আমার মন্ত্রণা না লইয়া কোন কাজ করিত না। দস্যুরা বলিত, 'দেলবর কি জানে।' সে যাহা হউক, মহাশয়ের স্ত্রী এখন এ সব কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি ভাল আছেন ত?

নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাঁহার পরলোক হইয়াছে।"

দেলবর মনস্তাপব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "তাঁহার পরলোক হইয়াছে? যদি কখন পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, তবে সে গহনাগুলি প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া আমি সযত্নে রাখিয়াছিলাম।"

উমাপতি অনেকক্ষণ অবধি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দেলবরের মুখের প্রতি তাকাইয়াছিলেন। দেলবর তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কি দেখিতেছ?"

উমা। আমার বোধ হইতেছে যেন, ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের সহিত পরিচয় ছিল। দাড়ী প্রভৃতিতে আপনি বেশান্তর করিয়াছেন, তথাপি যেন বোধ হইতেছে, আপনাকে জানি।

দেলবর একটু হাস্য করিলেন। নবকুমার কহিলেন, "মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক ঋণে বদ্ধ। যাহা হউক, আপনি এরূপ উদার ও সাধু প্রকৃতির মনুষ্য হইয়া কিরূপে দস্যুদলে মিলিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া উঠা ভার।"

উমা। আমার বোধ হয়, উনি কখন দস্যু নহেন।

দেল। (হাসিয়া) তবে কি?

উমা। আপনি ভদ্র ব্যক্তি; কি উদ্দেশ্যে দস্যুদলে আছেন, তাহা বলিতে পারি না।

নব। মহাশয় জাতিতে কি মুসলমান? আপনার কথার প্রণালীতে ত বোধ হয় না।

দেল। আজ্ঞা, আমি মুসলমান নহি। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ।

নব। ব্রাহ্মণ! মুসলমান দস্যুসঙ্গে অবস্থান?

উমা। মহাশয়, তবে আপনার নাম দেলবর নহে, আপনার প্রকৃত নাম কি বলিতে হইবে। আমি আপনাকে চিনিয়াছি বোধ হইতেছে। কণ্ঠস্বর আমার বেশ পরিচিত। নাম না বলিলেও আমি—

দেলবর সাশ্রুনয়নে উমাপতির কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "উমাপতি, যদি বুঝিয়া থাক, তবে আর গোপন করিবার চেষ্টা করিব না। কিন্তু সাবধান! যেন কদাপি এ কথা প্রকাশ না হয়। মহাশয়! আমার নাম গোপালকৃষ্ণ রায়। আমি উমাপতির ভ্রাতা। এ কথা এত শীঘ্র প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু যখন উমাপতির মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান না করিলে বিশেষ বিপদ্ সম্ভাবিত।"

উমাপতির চক্ষু দিয়া দরদরিত-ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। গোপাল তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিলেন এবং পরক্ষণেই হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,

"ভাই আর কখন যে এমন দিন হইবে, তাহা ভাবি নাই। কিন্তু ভাই, এখন স্থির হও। আমি এখন নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি নাই। চক্ষুর জল মুছ। কেহ কিছু বুঝিতে বা জানিতে না পারে। তাহা হইলে আমাকে আর পাইবে না।"

উমাপতি তাড়াতাড়ি চক্ষু পরিষ্কার করিলেন। তখন গোপাল আবার কহিলেন, "শুন, আমি আমূল সমস্ত বিবরণ বলিতেছি। শুনিলে জানিবে, কেন এত সাবধান হইতে বলিতেছি। দেখ, কেহ কোন দিকে নাই তো? মহাশয়, শুনুন। আমি যে সময়ে নিরুদ্দেশ হই, তাহা জানেন; কিন্তু কিরূপে হই, তাহা জানেন না। আমি সেই স্থান হইতে বলিতেছি। আমি বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তর যাইতেছিলাম। নৌকার পথ। একটি গ্রামের নিকট রাত্রে নৌকা ছিল; আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ তীরে উঠিলাম। তীরে বড় বন। বন এত গায় গায় যে, তাহার অভ্যন্তরে কি আছে, জানিবার উপায় নাই। আমি যখন বনের পার্শ্বে, তখন বনের মধ্য হইতে মানুষের অস্ফুটধ্বনি আমার কর্ণে আসিল। এই নিবিড়বনে এ সময়ে কে কেমন করিয়া আসিল এবং কি কথা কহিতেছে, জানিতে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান-চৈতন্য লোপ হইল। সে অনেক কথা; তাহার মর্ম্ম এই যে, কল্য রজনীতে দস্যুরা নিকটস্থ কোন ধনীর সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে ও তাঁহার অপোগণ্ড সন্তানকে ভূমিতে আঘাত করিয়া হত করিয়াছে। এই সম্বন্ধে স্ব স্ব বীরত্ব ও পৌরুষের কথা ব্যক্ত করিয়া আহ্লাদ-আমোদ করিতেছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; বুঝিলাম, ইহারা দুরন্ত দস্যুসম্প্রদায়। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় বসিয়া ভাবিতেছি ও অবশিষ্ট কথা শুনিতেছি, এমন সময় এক জন ভীমাকৃতি দস্যু আসিয়া আমাকে সহসা আক্রমণ করিল এবং কহিল, "তুমি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছ? সত্য বল।" আমি বলিলাম, 'হাঁ।' দ্বিতীয় কথা না কহিয়া সে ব্যক্তি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত চলিলাম বুঝিলাম, তাহার হস্তস্থিত ছোরার আঘাত দেওয়া অতি সহজ। দলের মধ্যে আমাকে লইয়া আসিল। একজন জিজ্ঞাসিল, 'এ কে?' সেই ব্যক্তি রহিম। যে আমাকে আনিয়াছিল, সে সমস্ত বলিল। রহিম বলিল 'উহাকে বধ কর।' এককালে দুই তিন জনের তরবারি আমার মস্তকোপরি উঠিল। আমি সেই সময়ে কাঁদিয়া বলিলাম, 'আমার একটি কথা শুন, তার পর যা হয় কর।' রহিম বলিল, 'বল্।' তখন আমি বলিলাম, 'আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি সত্য; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা কখন প্রকাশ করিব না।' রহিম বলিল, 'তাহাতে বিশ্বাস করি না।' আমি বলিলাম, 'আমি আর কখন লোকালয়ে যাইব না। তোমরা যা বলিবে, তাই করিব, তোমাদের হইয়া থাকিব।' রহিম অনেকক্ষণ পরে কহিল, 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আমাদের তল্পী তাগাদা বহিতে হইবে, আমরা যখন যেখানে যাইব, সেখানে যাইতে হইবে, আর আমাদের মত বেশ ভূষা করিতে হইবে, ইহাতে যদি স্বীকার কর, তবে তোমার জীবন থাকে।' আমি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। সেই অবধি আমি দস্যু হইলাম। মনে একটি আশা থাকিল যে, শীঘ্র কোন উপায়ে ইহাদের প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলেই আমি নিষ্কৃতি পাইব। প্রথম প্রথম তাহারা আমাকে বড় কষ্ট দিত। সমস্ত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইত, তাহাদের ভাত খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত এবং সকলেই আমাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু কিছু দিন পরে, বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার জিনিস যে দিন আমি সহজে আনিলাম, সে দিন হইতে আমার যাতনা অনেক কমিয়া গেল। তাহাদের কাহারও বুদ্ধি প্রখর ছিল না। আমার পরামর্শে তাহারা সহজে অনেক কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিত, এজন্য কালে দস্যুদলে আমার বেশ প্রভুত্ব হইল। আমি এই সময়মধ্যে অনায়াসে পলাইয়া বাটী আসিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কারণ, দস্যুরা জোর করিয়া আমার পরিচয় লইয়াছিল। আমি পলাইয়া আসিলে আমার নিস্তার নাই, পরন্তু আমাদের সম্বন্ধীয় কেহই বাঁচিত না। সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করি নাই। ক্রমে দস্যুদের রীতি-নীতি সমস্ত বেশ জানিতে পারিলাম। তাহাদের ভাবগতিক সব বুঝিতে পারিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এই সময় পলাইয়া গিয়া একেবারে বিচারালয়ে সংবাদ দিব; তাহাতেও যদি দুই এক দিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলে বিপদ সম্ভাবনা;

এ জন্য তাহাও করিতে পারিলাম না। এই সময়ে মুক্তির নিমিত্ত আর এক উপায় অবলম্বন করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে দস্যুদের বুঝাইলাম যে, আমার নিবাস সপ্তগ্রাম-সন্নিহিত গোপালপুর নহে, বীরভূমে এক গোপালপুর আছে, সেই গোপালপুর আমার নিবাস। ক্রমে এই কথাতেই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমাকে সকলেই মান্য করিতে লাগিল। এমন সময় উমাপতিকে লইয়া এই গোল। আমি তোমাকে বেশ চিনিলাম। পাছে তুমি আমাকে চিনিতে পার বলিয়া বড় ভয় হইল। তুমি আমাকে পারিলে না। ভাবিলাম, পলাইবার এই ঠিক সময়। তোমাকে মুক্ত করিয়া পলাইলাম বটে, কিন্তু যত দিন তাহাদের ধরাইয়া দিতে না পারি, তত দিন আমরা নিরাপদ্ নহি। সাবধান, কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে। দুই এক দিনের মধ্যেই প্রকাশ করিতে পারিব, এমন সাহস আছে। যে কয়দিন প্রকাশ না হয়; সে কয়দিন আমরা নিশ্চিন্ত নহি।"

নবকুমার সবিস্ময়ে কহিলেন, "প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে কেন?"

গোপা। আমরা পলাইয়া আসার পরদিনই তাহারা কোথায় সরিয়াছে, ঠিক নাই। আমি খোঁজ করিয়াছি, তাহারা তথায় নাই। যেখানে থাকুক, আমি শীঘ্র তাহা জানিতে পারিব। আমি এখন এত কথা বলিতাম না, কিন্তু আপনারা যখন আমাকে চিনিতে পারিলেন, তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান করিয়া না দেওয়ায় মন্দ হইবে বলিয়া এত বলিলাম। যাহা বলিলাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার পর যদি বিধাতা দিন দেন, তবে এক এক দিনের কথা বলিব, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। উমাপতি! আমি আপাততঃ বিদায় হই। মনে কিছুই চিন্তা করিও না। ভয় কি ভাই! শীঘ্র আবার আসিতেছি। কাহাকে কিছু বলিও না। মহাশয়! আমি নমস্কার করি। এক্ষণে আমি চলিলাম। উমাপতি! বাটীর সব মঙ্গল?

উমাপতি বলিলেন, "প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল বটে, কিন্তু আপনার অদর্শনে সকলেই মৃতপ্রায়।"

গোপা। দৈব কাহার আয়ত্ত ভাই? বিধাতা দুঃখ দিলে কে খণ্ডিতে পারে? আর না। আমি চলিলাম। পরে সমস্ত কথা বলিব। চিন্তা নাই। অনেক দেরী হইয়াছে। এই বলিয়া গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। উমাপতি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তাঁহারা উভয়ে চিত্রার্পিত-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কন্যা-সমীপে

"Cause latest notisima." *

—Ovid.

নবকুমার, উমাপতি, পদ্মাবতী প্রভৃতি সকলেই সুখে সময়পাত করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা গেল, বর্ষার পর শরৎ ও গেল, শরতের পর হেমন্তও যায়, তাঁহারা সকলেই আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন। যদি সংসারে সুখ থাকে, তবে তাঁহারা সুখেই কাটাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বমধ্যে যাহা সুখ বলিয়া পরিচিত, সে সুখ কতক্ষণ স্থায়ী? কে বলিতে পারেন যে, তিনি চির-সুখী? যিনি বলিতে পারেন, আমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে, জানি না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি কখনও সুখের মুখও দেখেন নাই। সুখ কাহাকে বলে, তাহাও তিনি জানেন না। সুখে তাঁহার সুখ নাই, তিনি দারুণ অসুখী। যে ব্যক্তি জীবন-মধ্যে পলান্ন অথবা তদ্বৎ কোন উপাদেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য

* The cause is secret, but the effect is known.

কিছু আহার করেন নাই, তাঁহার রসনা সে আহারে অতঃপর তৃপ্ত হয় না; তিনি আর তাহার উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারেন না। শাকান্নভোজী ব্যক্তি কখন এক দিন যদি তাহা আহার করিতে পারেন, তবে তিনি তাহার উপাদেয়ত্ব অনুমানে সমর্থ। জগতে সকল কার্য্যেই সুখ আছে, সকল কার্য্যেই সুখ নাই। অত্ত যে কার্য্য পরম সুখময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, উপর্য্যুপরি দশ দিন সেই কার্য্য করিতে হইলে তাহা বিরক্তিজনক ও অসুখের কারণ মনে হয়। সুখের লক্ষণ স্থির করা অথবা কিসে সুখ হয়, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। জগতে সুখ আছে কি না, তাহাও আমরা বলিতে অক্ষম। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, যাহাকে লোকে সুখ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা এই আছে, এই নাই। মনুষ্য আশা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সুখের চেষ্টায় ছুটিতেছে, কিন্তু তাহা হস্তগত হয় হয় হয়—হইতেছে না। মায়াময় মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় সুখ দেখা দেয়, কিন্তু কাছে আইসে না। সুখের এই প্রকৃতি। এই নিদারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ সংসারে মনুষ্য সময়ে সময়ে অন্যান্য সমস্ত ক্লেশকর বিষয় বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকেন। যদি কিছু সুখ থাকে, তবে আমরা বলি,—সেই আনন্দই সুখ; কিন্তু সেই সুখই বা কতক্ষণ স্থায়ী? জগতে কে সদানন্দ, কাহার হৃদয় জগতে এক দিনও দুঃখদণ্ডে মথিত হয় নাই? সংসার-বিরাগী, পুণ্যাশ্রমী যতি-তপস্বীরাও সংসারে যন্ত্রণা পাইয়াছেন! মাতৃগর্ভচ্যুত হইয়াই কেহ কখন সন্ন্যাসী হয় না। সাংসারিক বিবিধ অসহনীয় ক্লেশদর্শনে তাঁহারা সুখাশায় সংসার ত্যাগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব সংসারে কেহ চিরানন্দ নহেন। রোগ, শোক, অভাব, মান, যশ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মনুষ্য সততই নিরানন্দ। এই সকলের মধ্যে যদি কোনরূপে কখন আনন্দ জন্মে, তাহা ক্ষণিকমাত্র। নবকুমার প্রভৃতি সকলে সেই ক্ষণিক আনন্দে আনন্দিত ছিলেন; কিন্তু আনন্দ চিরস্থায়ী হইবার নহে। তাঁহাদের আনন্দে বিঘ্ন জন্মিল; পদ্মাবতী পীড়িতা হইলেন। চলুন পাঠক, আমরা পদ্মাবতীর কি হইয়াছে, দেখিয়া আসি।

পদ্মাবতী পীড়িতা। চারি দিন অতীত হইল, পদ্মাবতী পীড়াক্রান্তা হইয়াছেন। পীড়া সহজ নহে। জ্বর—কিন্তু শক্ত জ্বর। কি কারণে পদ্মাবতীর সহসা এরূপ কঠিন জ্বর উপস্থিত হইল, তাহা অন্যে জানে না; কোন্ সময়ে কি কারণে পীড়া হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অবশ্যই কোন শারীরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়া থাকিবে, নচেৎ এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? নবকুমার পদ্মাবতীকে জ্বরের কারণ জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। চিকিৎসক আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় নবকুমারকে কানে কানে বলিয়া গিয়াছেন, "রোগের গতিক ভাল নহে।" নবকুমার সেই অবধি অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত ও শুষ্ক হইয়াছেন।

বেলা সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর, পদ্মাবতীর জ্বরত্যাগ হইতেছে। পদ্মাবতী ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছেন। চারি জন পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। রৌদ্রের তেজ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। সহসা একটি দ্বার উন্মোচিত হইল। তন্মধ্য দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন; সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হইল। পদ্মাবতীও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন। নবকুমারের চক্ষুর সহিত পদ্মার চক্ষু সম্মিলিত হইল, অমনই তাঁহার ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি আসিল। তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল। এত যে যন্ত্রণা, এত যে ক্লেশ, তাহা যেন তৎক্ষণাৎ লয় পাইল। নবকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পদ্মাবতী এই চারি দিনেই ভয়ানক কৃশা হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দীবর নয়ন দুটি ডব ডব করিয়া মুখের উপর ভাসিতেছে। পদ্মাবতী নবকুমারের গাত্রে একখানি হস্ত প্রক্ষেপ করিলেন। নবকুমার এক হস্ত দ্বারা পদ্মার প্রক্ষিপ্ত হস্ত ধারণ করিলেন, অপর হস্ত পদ্মার ললাটে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"পদ্মা তুমি ঘামিতেছ, এক্ষণে তোমার জ্বর ত্যাগ হইতেছে বোধ হয়।"

পদ্মা বলিলেন, "হইবে, কিন্তু কষ্ট হইতেছে।"

নবকুমার বলিলেন, "আর দুই এক দিনমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কি করিবে বল? তৎপরেই আরোগ্য লাভ করিবে।"

পদ্মা আবার নবকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন;—কহিলেন, "আরোগ্য লাভ করিব, তোমায় কে বলিল?"

নবকুমার কহিলেন, "কেন পদ্মা, এ ত সামান্য পীড়া, ইহাতে ভয় কি?

পদ্মা কহিলেন, "ভয় নাই নবকুমার! ভয় কিসের? মৃত্যুকে ভয়? তাহা আমার নাই। তবে নিজের শরীরের অবস্থা যত বুঝিতে পারা যায়, পরে সহস্র বিজ্ঞ হইলেও তত পারে না। নবকুমার, আমার পীড়া কঠিন নহে এবং আমি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিব, এমন আশাকে যদি হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা ত্যাগ কর।"

নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, "তুমি দুঃখিত হইতেছ? তাহা তো আমি জানি না। আমি ভাবিলাম, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমাদের সহিষ্ণুতা-গুণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই সাহসেই আমি এমন কথা বলিয়াছি। তুমি দুঃখিত হইবে জানিলে কখন বলিতাম না। যাহা হইবার তাহা হইবে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হও কেন?" পদ্মাবতী নবকুমারের মনের ভাব বুঝিলেন এবং এই মুহূর্ত্ত হইতে অতঃপর রোগযাতনা যথাসাধ্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী নবকুমারের বদনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন;—দেখিলেন, তাহা বিশুষ্ক ও বিমর্ষ। বাক্যের স্রোত পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "স্বামিন্! আমার একটি প্রার্থনা আছে।" নবকুমার সোৎসুকে কহিলেন, "কি বল, নিঃসঙ্কোচে বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "আমি জ্ঞানহীনা, জানি না, আমি যাহা বলিব, তাহা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার বিবেচনা-সাপেক্ষ। যদি তাহা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা কর, নচেৎ প্রয়োজন নাই।"

নবকুমার কহিলেন, "ভাল, তাহাই হইবে। কথাটা কি?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, জীবনমধ্যে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অধুনা সেই ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। যদি তাহাতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বাদশাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ কর।" নবকুমার কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। যুগপৎ অনেকগুলি চিন্তা-তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়-জলধিকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি ভাবিলেন, পদ্মাবতীর এ ইচ্ছা অসঙ্গত নহে। যাহাকে একদিন পদ্মা মন দিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে একদিনেই বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। পদ্মাবতীর চিত্ত তো আমি জানি। তাহা যদিও দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল, তথাপি পূর্ব্বস্মৃতি কোথায় যাইবে? স্মৃতিপ্রাবল্যে পদ্মার এ ইচ্ছা অন্যায় নহে। আর এ দর্শনে ক্ষতিই বা কি? পদ্মার চিত্তে মালিন্য জন্মান অসম্ভব। তবে কেন তাহার বাসনায় ব্যাঘাত দিব? এই ভাবিয়া কহিলেন, "পদ্মা! এই কথা! এ তো উত্তম কথা! অবশ্যই সংবাদ লইয়া লোক যাইবে। কিন্তু তিনি আসিবেন কি না সন্দেহ।"

পদ্মা। আসিবেন। যাহাতে আসিবেন, আমি তাহা বলিতেছি। তুমি যদি পত্র লেখ তবে তাহাতে লিখিয়া দিও, পদ্মাবতী পীড়িতা হইয়াছে। রুগ্নশয্যায় নিপতিত হইয়া তাহার একবার বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের বাসনা জন্মিয়াছে। কিন্তু সে গমনাগমনে অশক্ত। সুতরাং বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিন্ন তাহার বাসনা চরিতার্থ হইবার অন্য উপায় নাই।

নবকুমার বলিলেন, "তাহাই হইবে। ঐ সকল কথাই লিখিব।"

পদ্মা। নাথ! কার্য্যমাত্রই যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল। আমি বলি, যদি এ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত হইল, তবে আর বিলম্ব না করাই ভাল।

নবকুমার কহিলেন, "আমি পত্র লিখিতে চলিলাম। এখনই ইহা শেষ করিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার পদ্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাকুলিতান্তরে

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং,
বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্,
যদি জন্তুর্নন্থ লাভবানসৌ॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতসঃ,
প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে,
কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥"

কয়েক দিন অতীত হইল, পদ্মাবতী রুগ্নশয্যায় পতিতা আছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃ

মন্দ লক্ষিত হইতেছে। অদ্য সায়ংকালে পূর্ব্বোল্লিখিত চিকিৎসক পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে নবকুমার রুগ্নার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রকোষ্ঠ পদ্মাবতীর সুস্থ এবং সবল অবস্থায় আনন্দের রশ্মিতে সমুজ্জ্বলিত ছিল, যে প্রকোষ্ঠ পদ্মার অধ্যয়ন, রচনা, চিত্র-কার্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রিয়তম স্থান ছিল, যথায় পদ্মা স্বীয় প্রকৃতি-পরিচয়-জ্ঞানহীন স্বামীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ বিনয়-বাক্যে তোষামোদ করিয়া অবশেষে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সগর্ব্বে বিস্ফারিত-নেত্রে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যে স্থানে বহুকচ্ছে, পদ্মা স্বামীর প্রেমহীন, বিশুষ্ক হৃদয়কে প্রেমময় ও সরস করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়াছিলেন, যে প্রকোষ্ঠে পদ্মা আরাধ্য নবকুমারের সঙ্গ-সুখে কত দিন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিয়াছেন, অদ্য সেই প্রকোষ্ঠে—সেই আমোদময় প্রকোষ্ঠে নবকুমার বিষণ্ণ-বদনে প্রবেশ করিলেন। সে প্রকোষ্ঠের আর সে জ্যোতিঃ নাই। একের হীনতেজে সকলেই যেন তেজোহীন হইয়াছে। রুগ্না পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে কাষ্ঠ-চৌপায়ায় একটি সামাদান জ্বলিতেছে; কিন্তু সকলই যেন অন্ধকার। নবকুমার যাইয়া আলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পদশব্দ রুগ্নার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সংমিলিত হইল।

পদ্মাবতীর বদনে একটু হাসি দেখা দিল; সে হাসি তাহার স্বাভাবিক হাসি নয়। পদ্মাবতী নব-কুমারের তৃপ্তিসাধনের জন্য এ অবস্থাতেও জোর করিয়া হাসিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "পদ্মাবতি! এখন কেমন আছ?" অতি ক্ষীণস্বরে পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, "ভাল আছি।"

এ স্থলেও পদ্মাবতী প্রকৃত কথা গোপন করিলেন। পাছে নবকুমারের হৃদয়ে ব্যথা জন্মে, এ জন্য রোগ তাঁহার শরীরকে কিরূপ চর্ব্বিত করিতেছে, তাহা পদ্মা ব্যক্ত করিলেন না। নবকুমার সকলই বুঝিলেন, চিকিৎসক যখন পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গমন করেন, তখন নব-কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি নবকুমারকে বলিয়াছেন, "রুগ্নার অবস্থা বড়ই মন্দ। কল্য সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভয়ের দিন গিয়াছে। কিন্তু এই সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ করিতে না পারিলে পুনরায় বিপদ্ সম্ভাবিত। শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু কিছুই ভাল বুঝিতেছি না।"

নবকুমার পদ্মার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পদ্মা যেন কোন অস্বাভাবিক শক্তিবলে উঠিয়া বসিলেন। নবকুমার তাঁহাকে ধরিলেন। পদ্মা হেলিয়া নবকুমারের বক্ষে মস্তক রক্ষা করিলেন। তাঁহার এক চক্ষু আবরণে পড়িল, অপর চক্ষু দিয়া তিনি নবকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে নীরব; উভয়ের হৃদয়েই দারুণ শোকের ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। কি কথা কহিবেন? মনে কি তখন কথার স্থির আছে। নবকুমার শোকবিকলিত-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, এই সম্মোহিনী মূর্ত্তি যাহা আমার হৃদয় মনকে প্রেম-রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইবে। তিনি আরও দেখিলেন, পদ্মার সুগোল নবনীতবিনিন্দিত কোমল গণ্ডদ্বয়ের সে শোভা অপগত হইয়াছে। তাহাতে গায় গায় অনেক দাগ পড়িয়াছে এবং তাহা গভীর হইয়াছে। তাঁহার চক্ষুতলে কালিমা পড়িয়াছে। অধরোষ্ঠ গোলাপী বর্ণের বিপর্য্যয়ে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নারীচরিত্রসুলভ গর্ব্বপূর্ণ সমুজ্জ্বল দেহ-শোভা—যাহাতে তাঁহার আত্মার অমানুষী বুদ্ধির জ্যোতিঃ দীপ্যমান ছিল, এক্ষণে আর তাহা সেরূপ নাই।

নবকুমারের দেহে সমধিক বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যগ্রতাসহকারে তিনি পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া তাঁহার বদনে ভূয়োভূয়ঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্লেশ-সংরক্ষিত মনোবেগ শিথিল হইল, সুতরাং নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

পদ্মাবতী নবকুমারের ব্যগ্রতা দর্শনে কিছু ব্যাকুলিত স্বরে কহিলেন, "কাঁদিও না। শঙ্কিত হইতেছ কেন? পরিণামে কি হইবে, তাহার স্থির কি? তোমার সংস্পর্শে আমার সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইয়াছে, আমি পবিত্র সুখভোগ করিতেছি। তুমি এক্ষণে শোক ত্যাগ কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মার নয়ননির্গত কয়েক বিন্দু অশ্রু নবকুমারের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় পদ্মার মুখের প্রতি চাহিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, পদ্মা

এখনও হাসিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পদ্মা নবকুমারের হৃদয় হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া একটি তাকিয়ায় সংস্থাপিত করিলেন। নবকুমার প্রচণ্ড শোকাগ্নিকে নিবাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহা কি সহজ? সময়ে সময়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবং অঙ্গ-কম্পন হৃদয়ের প্রচণ্ড শোক-প্রবাহের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর নবকুমার কহিলেন, "পদ্মা, মনুষ্যের এই গতি! অদৃষ্টের এই শেষ! এই ঘটনা সাধারণ, সর্ব্বব্যাপী এবং অপ্রতিবিধেয়! যাহা হইবেই হইবে, কাহার সাধ্য তাহার রোধ করে? তোমার পীড়া এখনও কঠিন হয় নাই। মনের ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় আমি যেরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছি, এখনও তাহার অণুমাত্র চিহ্নও প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বর করুন, আর পীড়া না বাড়ে। তাহা হইলে তুমি অবশ্য মুক্তিলাভ করিবে। তোমার এ সহজ পীড়া, ভয় কি?"

নবকুমার মনের কথা বলিলেন না। মনে যাহা বুঝিয়াছিলেন, পদ্মাকে সাহস দিবার জন্য তাহা গোপন করিলেন।

পদ্মা কহিলেন, "ভয় কি? কিছুই না। পীড়া সহজ হউক বা কঠিন হউক, তাহাতে ভয় করিলে চলিবে কেন? মৃত্যুকে ভয় করিলেই কি মনুষ্য তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? কখনই না। তবে কেন?"

পদ্মাবতীর মুখে এরূপ সাহসের কথা শুনিয়া নবকুমারের এতাদৃশ চঞ্চল হৃদয়ও একটু সাহসী হইল। প্রিয়জনের ক্লেশ দেখিলে অন্তরে দারুণ বেদনা জন্মে, কিন্তু যদি সে প্রিয়জন কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে পড়িয়া স্বয়ং কাতর না হয় এবং ধৈর্য্য সহকারে স্থির থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য চিন্তা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন হয় সন্দেহ কি? বিশেষতঃ বিধাতৃবিহিত একটি সুন্দর নিয়ম সতত সংসারে বিরাজ করিতেছে;—মনুষ্য যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, ততই যেমন মৃত্যুর ক্রমনিম্ন পথ আরও পরিষ্কার ও মসৃণ হইয়া তাহার গতির সুবিধা করিয়া দেয় এবং প্রত্যহ দেহ নশ্বর বলিয়া যতই প্রতীতি জন্মে, ততই যেন কৃতান্তের করাল ভীষণ মূর্ত্তি কমনীয়তা ধারণ করে; অবশেষে যেরূপ শ্রান্ত শিশু জননীর অঙ্কে নিদ্রা যায়, তদ্রূপ মানব অকাতরে শমনসদনে শরণ গ্রহণ করে। এই চির প্রতিষ্ঠিত নিয়মপ্রভাবে পদ্মাবতীর মুখ হইতে তাদৃশ সাহস-সূচক কথা বিনির্গত হইয়াছে। নবকুমার পদ্মাবতীর সকল কথা স্থির মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "অনেক লোকজন সমভিব্যাহারে বাদশাহ আসিয়াছেন।" নবকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আসিয়াছেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন, "তুমি যাও।"

নবকুমার ব্যস্ততা সহকারে পদ্মার প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্দীপ্ত-প্রণয়-পাবকে

"I loved, I love you,
for this love have lost,
State' station, heaven mankind's
my own esteem,
And yet cannot regret what it
hath, cust,
So dear is still the memory
of that dream,"
—Byron.

বাদশাহ জাহাঙ্গীর পত্রপাঠমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, পদ্মাবতীর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন, অন্তিম সময়ে তিনি পুনরায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্তিম-সময় উপস্থিত না হইলে সে কথা তাঁহার মনে পড়িবে কেন? এ জন্য বাদশাহ আসিবার সময় অধীনস্থ কয়েক জন প্রসিদ্ধ হাকিম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই নবকুমার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের নিকট রোগের সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া একমতে পদ্মার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রোগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অন্ত দশ দিন অতীত হইল। এ দশ দিনে পীড়া অণুমাত্রও উপশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। চিকিৎসকেরা পদ্মার জীবনে প্রায় হতাশ হইয়াছেন। এই নিদারুণ কথা প্রিয়জনবর্গের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই ম্রিয়মাণ, শঙ্কিত ও বিশুষ্ক। নবকুমার, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা রোগিণীর অবস্থা

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ নিরাশ হইতেছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাদশাহ বাহাদুর রুগ্নার পালঙ্ক-সন্নিহিত একখানি চৌপায়ায় উপবেশন করিলেন। পদ্মা নিতান্ত দুর্ব্বল ও কৃশ। সম্প্রতি চারি দিন হইতে যে জ্বর আসিয়াছে, তাহা কমিতেছে না, বাড়িতেছে না, সমভাবেই রহিয়াছে। চিকিৎসকেরা সন্দেহ করিতেছেন, সেই জ্বর যখন বিরাম হইবে, তখনই পদ্মার মৃত্যু হইবে। বাদশাহ ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা বাদশাহের মুখের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। বাদশাহ ব্যথিত হইলেন। এক সময়ে যাঁহার দৃষ্টিতে বাদশাহের হৃদয় নৃত্য করিত, অদ্য তাঁহার দৃষ্টি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হইল। শোকে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি মনের ভাব গোপন করিলেন। উভয়েই নিস্তব্ধ—নীরব—চিত্রার্পিত পুত্তলীপ্রায়। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "বাদশাহ! আমি চলিলাম,—এ জীবনের মত চলিলাম। পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপজীবন নিশ্চয়ই অচিরে অন্ধকারে ডুবিবে। তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা বৃথা। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি; জীবনে আমার কোন প্রয়োজনও নাই। সুতরাং আমি আগতপ্রায় মৃত্যুর-নিমিত্ত শঙ্কিত নহি। আমার আর ক্ষোভ নাই। মনুষ্য-জীবনে যে সকল বাহ্য সুখ-সৌভাগ্য ঈপ্সিত, বাদশাহের অনুকম্পায় আমি সে সকল যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে যত দিন নবানুরাগ থাকে, তত দিন সুখবোধ হয়; তত দিন সে সকল আমোদের সামগ্রী থাকে। অনুরাগ কয় দিন থাকে? অনুরাগও কমে, সুখও যায়। আপনাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—সে সকলে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই; তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না। যাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, হতভাগিনী তাহা সে সময় জানিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ও তাহা হস্তগত হইল, তখন গত কার্য্য সকলের নিমিত্ত নিদারুণ অনুতাপে তাহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। সুতরাং জগতে অভাগিনী সুখের মুখ দেখিতে পাইল না। সুখের নিমিত্ত আমি কি না করিয়াছি? কোন্ পাপ আমি বাকী রাখিয়াছি? যাহা করিয়াছি, তাহা সকলই সুখের চেষ্টায়, অসীম ভোগতৃষা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টায়। কিন্তু বাদশাহ, আপনাকে বলিতে কি, পাপে পাপে আমার দেহ, মন, প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছে মাত্র, সুখী কখনই হই নাই। এখনই কি আমি সুখী? না বাদশাহ, আমার বড় যাতনা! কেন পূর্ব্ব হইতেই এই পথে থাকি নাই, এই অনুশোচনায় আমার হৃদয় এখন সতত জ্বলিতে থাকে। সে জ্বালা নিবারিত হইবার নহে, তাহা হইলে নিবারিত হইত। তাহাতেই বলিতেছি, অভাগিনীর জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। সেই মঙ্গল নিকটবর্ত্তী, তাহার জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না, ইহাই সৌভাগ্য। আর পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপ প্রাণ পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিবে না।"

এই পর্য্যন্ত কথা যদিও পদ্মাবতী অতিশয় ধীরে ধীরে ও অতিশয় অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিলেন, তথাপি ইহাতেই তাঁহার অত্যন্ত শ্রম হইল। তিনি নিস্তব্ধ হইলেন এবং সজোরে শ্বাসাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ বাহাদুর সমস্ত কথা শুনিলেন, —তাঁহার সাবধানতা বিফল হইল। চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; বিকৃতস্বরে কহিলেন, "পদ্মাবতি! তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ যে এত ভয়ানক হইবে, তাহা মনেও স্থান দিতে সাহস করি নাই। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঘটুক বা নাই ঘটুক, মনে স্থান দিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরে। আমার দেহ, মন, প্রাণ যে এক সময়ে কেবল মাত্র তোমারই ছিল, তাহা তুমি জান না কি? অতি ক্লেশে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তোমাকে তোমার সুখের পথে বিচরণ করিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু বল দেখি পদ্মাবতি! তুমি সহস্র যোজন অন্তরে থাকিলেও আমার অন্তরেই আছ। আমি তোমারই। তোমার চিত্তের অন্য ভাব হইলেও আমি তোমাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারি নাই।"

মনস্তাপে পূর্ব্বস্মৃতিতে বাদশাহের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অতি ব্যস্তে বাদশাহ পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার নয়নজলে পদ্মার ক্ষীণ হস্ত সিক্ত হইতে লাগিল। পদ্মা ব্যাধি-বিকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "বাদশাহ! আপনার কথায় পূর্ব্বকালের সমস্ত কথা মনে পড়িল। যেন সে সকল প্রত্যক্ষ বোধ

হইতেছে। বাদশাহ! আমার হৃদয় নিতান্ত-পাষাণ—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। অন্তিম সময়ে আমি আপনাকে মনের কথা বলি, শুনুন। এ সময়ে আর আমার ভয় কি? যে সংসার অচিরে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর কাহার ভয় করিব? আপনি শুনিয়া কি ভাবিবেন, বলিতে পারি না। যাহা ভাবুন, এই অন্তিমকালে, মৃত্যুশয্যায় আমি আজি মুক্তকণ্ঠে আমার পাপ স্বীকার করিব। বাদশাহ! আপনি আমাকে যত দূর প্রেম করিতেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। কিন্তু বাদশাহ মিথ্যা মনে করিবেন না, আমি পাষাণী, তখন আপনার সেই অতুল্য প্রেমের কণিকাও প্রতিদান করিতাম না। আপনি বিস্মিত হইতেছেন? জগতে আমার ন্যায় অসতী, কুলটা, গণিকা, স্বৈরিণীদের এই নিয়ম,—তাহাদের এই কার্য্য, এই ব্যবহার। প্রতারণা তাহাদের ব্যবসায়। আপনি আমার সন্তোষার্থে কি না করিয়াছেন? কিন্তু আমি পাপীয়সী, আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি? আমি স্বয়ং অসীম পাপ করিয়াছি, আবার তাহার সহিত প্রতারণা মিশ্রিত করিয়াছি এবং আপনাকে আরও কত জনকে নিয়ত প্রতারণা-জালে বদ্ধ করিয়া পাপে ডুবাইয়াছি। বাদশাহ! ভাবিয়া দেখুন দেখি, আমার পাপের কি পরিমাণ আছে? আমার অদৃষ্টের গতি কি হইবে, তাহা বুঝিতেছেন?”

এই বলিয়া পদ্মা আবার নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পদ্মা বাদশাহের মুখের প্রতি চাহিলেন। পদ্মার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পদ্মা কহিলেন, “বাদশাহ! আপনাকে যাহা বলিব, তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না; আমার কথায় কেন বিশ্বাস করিবেন? বিশ্বাস না করিলেও আমি তাহা বলিব। কারণ, আপনার বিশ্বাসাবিশ্বাসে আমার কোন ইষ্টানিষ্টের আশঙ্কা নাই। যে শীঘ্র চিরকালের নিমিত্ত মনুষ্য-রাজ্য ত্যাগ করিবে, মনুষ্যের সন্তোষ ও বিশ্বাসে তাহার প্রয়োজন কি? বাদশাহ শুনুন! সদিচ্ছারূপ অনলস্পর্শে পাষাণহৃদয় গলে। দাসীর অন্তরে অনেক দিন সদিচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে। পাষাণীর হৃদয় সেই সময় হইতে একটু গলিয়া মানবীর ন্যায় হইয়াছে। আমি তখন বুঝিয়াছি—আপনার সহিত পূর্ব্বে কত অসদ্ব্যবহার করিয়াছি; তখন বুঝিয়াছি—আমি পাপীর পাপী, আমার তখনকার হৃদয়ের অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব এবং আরও নানা কারণে হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। এত শীঘ্র মৃত্যু আমাকে নিস্তার করিতে না আসিলে এ কথা কখন ব্যক্ত করিতাম না। যাহা হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়েই লয় পাইত। অদ্য একথা প্রকাশ করায় আর ক্ষতি নাই বলিয়াই করিলাম। যে দিন হইতে হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে মানবীর ন্যায় হইল, সেই দিন হইতেই তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কার্য্য হইয়া উঠিল। স্বামী আমার আরাধ্য দেবতা, তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিব, ইহাই আমার প্রার্থনা। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সেই শুভদিনাবধি আমি স্বামীর চরণ অন্তরের সহিত ধ্যান করিয়াছি, তাঁহাকে পুণ্যের সোপান মনে করিয়াছি এবং পাপীয়সী পদ্মাবতীর হৃদয়ে যতদূর প্রণয় উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব, ততদুর প্রণয় করিয়াছি; কিন্তু বাদশাহ! তোমাকেও তো ভুলিতে পারি নাই। ইহাতে যদি আমার অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কি করিব, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি। সুখের বিষয় যে, পাষাণীর মৃত্যুসময়ে এ কথা প্রকাশ হইল। আরও সুখের বিষয় এই যে, একদিনও তোমার সহিত অবস্থান করিতে অথবা তোমার নিকটস্থ হইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। জানিতাম, তাহাতে যন্ত্রণা ভিন্ন সুখ নাই। অদ্য সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম; অদ্য তুমি সম্মুখে উপস্থিত; অদ্য চিত্ত বড় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অদ্য ভাবিতেছি, তোমাকে ছাড়িলাম কিরূপে?”

পদ্মাবতী বিশ্রামার্থে নিস্তব্ধ হইলেন। তিনি সাধ্যাতীত উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এ জন্য বিশেষ শ্রমবোধ হইল। অনেকক্ষণ বাদশাহের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে থাকিয়া আবার কহিলেন, “বাদশাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ পাপীয়সী তোমার নিকট বিস্তর দোষে দোষী। সে সকল দোষ সংখ্যাতীত! তাহার কোন্‌টি বলিব? আর কি-ই বা বলিব। পাপে হৃদয় লৌহবৎ কঠিন হইয়াছে বলিয়াই তোমার সহিত কথা কহিতে আমার লজ্জা জন্মিতেছে না। হৃদয় কথায় পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আর কিছু বলিব না; আর বলিতেও পারিতেছি না। এক কথা, বাদশাহ। দাসীর অপরাধ সকল ক্ষমা কর।”

এই বলিয়া পদ্মাবতী জাহাঙ্গীরের হস্ত ধারণ

করিলেন ; জাহাঙ্গীর বাক্যহীন পুত্তলীপ্রায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। পদ্মাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। উভয়েই বাহ্যজ্ঞান রহিত —সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহাদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সেই প্রকোষ্ঠে নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী অথবা জাহাঙ্গীর তাহা জানিতে পারিলেন না। নবকুমার তাঁহাদের ভাব লক্ষ্য করিলেন। তিনি রুগ্নার প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৌহৃদ্য-সংস্থাপনে

"I may be your friend, and that perhaps when you last expect it,"

—Vicar of Wakefield.

যে আসন্ন বিপদ্ বদন ব্যাদন করিয়া নবকুমারকে বিভীষিকা দেখাইতেছে, তাহা অতি ভয়ানক, সন্দেহ কি ? নবকুমার যে শঙ্কায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। পদ্মাবতীর জীবনের কোন ভরসা নাই, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, সুতরাং এই আগতপ্রায় অশুভ ঘটনার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। পদ্মার সহবাসে নবকুমার আপাততঃ শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি সকল বিপদ্ ও সকল ক্লেশকে দলিত করিয়া এই সুখে উন্মত্ত ছিলেন ; পদ্মার অপরাধাদির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই পদ্মা, তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া, তাঁহাকে মোহিত করিয়া, বিরক্তির কারণ হইতে আনন্দের মূলরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এত অল্পদিনের মধ্যে অবনীধাম হইতে একেবারে প্রস্থান করিবেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

নবকুমার পদ্মাবতী ও বাদশাহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং নিতান্ত উদাসচিত্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। তথাপি নবকুমার বাতায়ন-সন্নিহিত হইয়া ব্যস্ততা সহকারে তাহার দ্বার মোচন করিলেন। শীত-রজনী-স্বভাবসম্ভূত তিমিরাচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখীন হইল। তদুত্তরে কয়েকখানি ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধকারমধ্যে স্তূপ স্তূপ দেখাইতে লাগিল। তৎপরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। তন্মধ্যস্থ বৃক্ষসকল ও পথপার্শ্বস্থ গৃহসকল শীতনিশান্ধকার হেতু একবিধ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাতায়নের অতি নিকটে একখানি পালঙ্ক ছিল। নবকুমার বাতায়নের প্রতি মুখ করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। গাত্রে যে সমস্ত বস্ত্র ছিল, একে একে সে সমস্ত উন্মোচন করিলেন। তাহাতেও দেহ শীতল হইল না। এ জন্য বাতায়নদ্বারে বক্ষ রক্ষা করিলেন। বাতায়নদ্বার দিয়া শীতল বায়ু ঝির্ ঝির্ করিয়া তাঁহার বক্ষে লাগিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই শীতলতা পাইলেন না। ভ্রান্ত ! কি করিতেছ ? এ কি সহজে শীতল হইবে ? এ যে উত্তাপ, তাহাতে জল দেও, তুষার দেও অথবা জগতে যাহা কিছু শীতল আছে, সে সমস্ত দেও, তথাপি একটু কমিবে না। নবকুমারের সেই সময়ের চিত্তের অবস্থা ভয়ানক। তিনি অনিত্য জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিতেছেন। বাতায়নমধ্য দিয়া এই ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর যেন রোগ, শোক, মরণ ইত্যাদি নানাবিধ আকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেখিতে পাইতেছেন। যখন নবকুমার এইরূপে স্বীয় চিত্তের উপর প্রভুত্ব হারাইয়াছেন, তখন সেই প্রকোষ্ঠে অপর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন ; নবকুমার তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক ধীরে ধীরে নবকুমারের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। নবকুমার চমকিলেন। তিনি ব্যগ্রতা সহকারে আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং দেখিলেন—উমাপতি। আগন্তুক উমাপতি কহিলেন, "ভ্রাতঃ! কি ভাবিতেছ ? অপ্রতিবিধেয় ভাবী ঘটনার নিমিত্ত চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য।"

নব। না ভাই, আমি তাদৃশ মূঢ় নহি। আমি আর এক চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলাম ! এই সংসার অনিত্য। এখানে কে চিরকাল থাকিবে ? আশ্চর্য্য এই, মানুষ এমনই মায়ায় আচ্ছন্ন যে, প্রত্যহ শরীরের নশ্বরতা এবং জগতের অনিশ্চিততা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ দেখিতেছে, তথাপি তাহাদের হৃদ্বোধ জন্মে না। এই আমি—আমার মনে কতবার ঘটনাক্রমে এই কথা উদিত হইয়াছে, কিন্তু কখনই দুই দিবসের অধিক মনে থাকে নাই।

উমা। ঈশ্বরের ইহা একটি কৌশল ; মানবগণ এরূপ মায়ায় আচ্ছন্ন না হইলে জগতের কি ভয়ানক

অবস্থা ঘটিত, তাহা স্থির করা যায় না। সে যাহা হউক, পদ্মাবতী এক্ষণে কেমন আছেন?

নবকুমার বিষণ্ণস্বরে কহিলেন, "আমি এক্ষণে তাঁহাকে দেখি নাই। আর কি বা দেখিব ভাই? পদ্মাবতীর জীবনাশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল এবং উভয়েই দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুককে অতীব সম্মান সহকারে অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর নিকটস্থ হইয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং নবকুমার ও উমাপতিকে সেই আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা অগত্যা সঙ্কুচিতভাবে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জাহাঙ্গীর নবকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার সহিত অল্প কয়েকটি কথা কহিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি, আপনি আমার কথায় কোন দোষ লইবেন না। লুৎফ—পদ্মাবতীর এক্ষণে যে অবস্থা, তাহা মহাশয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই আগতপ্রায় ঘটনায় আপনার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু মনে করিবেন না যে, এ ঘটনায় আমি কোন ক্লেশ পাইব না। আপনি বিজ্ঞ এবং বিবেচক। সরলভাবে আমার কথা শুনিবেন। লুৎফ-উন্নিসা,—আধুনিক পদ্মাবতীর সহিত পূর্ব্বে আমার কিরূপ পরিচয় ছিল, তাহা মহাশয় অবশ্যই কিছু না কিছু জানিয়া থাকিবেন। এরূপ অবস্থায় সে সকল মনে হইলে মহাশয়ের মনে পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা জন্মিতে পারে। আপনি উন্নতচিত্ত বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিতে সাহস—"

এই সময়ে নবকুমার বাদশাহের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনি অলীক আশঙ্কা করিতেছেন। পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা যাহা হইবার, তাহা এক সময়ে হইয়া গিয়াছে। এখন আর কিছুতেই পদ্মাবতীর সম্বন্ধে আমার মনোমালিন্য জন্মিবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। পদ্মাবতীর সহিত আপনার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা আমি জানি। তাহার পরে পদ্মাবতীর সহিত আমার মিলন হয়। সে সকল জানিয়াও যখন আমি পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা ত্যাগ করিয়াছি, তখন আবার সেই কথায় নূতন করিয়া অসন্তোষ জন্মিবে কেন?"

বাদশাহ সন্তোষ সহকারে কহিলেন, "উত্তম, আপনার এরূপ সংস্কারে আমি আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে বলিতে বাধা নাই,—এককালে এ হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পদ্মাবতীর অধীনে ছিল। কিন্তু কালে সবই হয়। পদ্মার পাপ-কলুষিত মনেও কালে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রবেশ করিল। পদ্মা তখন স্বামী-সঙ্গরূপ পবিত্র সুখের অভিলাষিণী হইল। আমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু নানা কারণে আমি তাহার অভিলাষে ব্যাঘাত জন্মাই না। পদ্মা যে দিন আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন কি ভয়ানক! তাহার কথা এক্ষণে কি বলিব? যাহা হউক, অতি কষ্টে পদ্মাকে বিদায় দিলাম বটে, কিন্তু মনকে তো বিদায় দিতে পারিলাম না! যাহার সহিত কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বে আমার এতাদৃশ সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিয়োগে যে আমি নিতান্ত কাতর হইব, তাহা বলা বাহুল্য।"

নব। তাহা বলার অপেক্ষা কি? তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতেছি।

বাদ। যাহা হইবে, তাহা এক্ষণে কাহার সাধ্য নিবারণ করে? মন যতই কেন ধীর ও সহিষ্ণু হউক না, এরূপ অবস্থায় কাতর হইবেই হইবে। এই দারুণ বিপদ্ ও শোকের মধ্যে এক লাভ এই যে, মহাশয়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল। মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ থাকে, এটি আমার সমুচ্চ ইচ্ছা। ভাবিয়া দেখুন, এ ইচ্ছা অকারণ নয়। আমরা উভয়েই এক পদ্মাবতীর প্রণয়লতিকায় সংবদ্ধ। আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ সবিশেষ নৈকট্য থাকা প্রার্থনীয় ও সুখের নয় কি? আরও দেখুন, পদ্মাবতী সংসার হইতে যায়। তাহার ইতিহাস আমাদের দুই জনের যত মনে থাকিবে, এত আর কাহারও থাকিবে না। আমরা দুই জন আত্মীয়ভাবে থাকিলে অনেক শান্তি জন্মিবে। আমি মহাশয়কে এক পত্র লিখি; বোধ করি, আপনি তাহা পাইয়া থাকিবেন।

নবকুমার বিনীতভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। নানাবিধ কারণে, বিশেষতঃ কি বলিয়া তাহার উত্তর দিব, এই ভাবিয়া এ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই; সে জন্য আমি অপরাধী আছি।"

বাদ। পত্রের কার্য্য এক্ষণে মুখেই চলিবে। পত্রে মহাশয়কে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গীর দিবার কথা ছিল। মহাশয় তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি না,

তাহা না জানিয়া এ প্রস্তাব করা অন্যায় ; কিন্তু ইহাতে স্বীকৃত হইলে আমি পরম সুখী হই।

নবকুমার নিতান্ত সঙ্কুচিত-স্বরে কহিলেন, "আমি এ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি। ইহাতে অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। এ অধীন এরূপ সম্মান পাইবার উপযুক্ত নয়। আপনার অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে। যাহা হউক, সম্রাট্‌-দত্ত উপহার অস্বীকার করিতে আমার কি সাধ্য ?"

বাদ। বড় সুখী হইলাম। ভরসা করি, আমাদের আত্মীয়তা উত্তরোত্তর বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে। চলুন, এক্ষণে মনের স্থিরতা নাই, শরীরও ক্লান্ত আছে—বিশ্রাম আবশ্যক।

এই বলিয়া বাদশাহ গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার ও উমাপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্তিমিত-প্রদীপে

"পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া,
করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং,
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥"

—রঘুবংশম্।

কৃতান্ত ক্রমশঃ পদ্মার জীবন-বিনাশার্থ যে সকল উপায়াবলম্বন করিতেছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণন নিতান্ত ক্লেশকর। আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। এমন দিন নাই, যে দিন নবকুমার দিনমানের অধিকাংশ রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে অতিবাহিত না করিয়াছেন ; কিন্তু কোন দিন অধিকতর নিরাশা ভিন্ন আশার অঙ্কুরও হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ দিন অতীত হইল। পদ্মার অদ্যকার অবস্থা বড় ভয়ানক। চিকিৎসকেরা অদ্যই পদ্মার জীবনের শেষ দিন স্থির করিয়াছেন। বৈকালে যখন নবকুমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তখন পদ্মা নিদ্রিতা। নবকুমার ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় একজন হাকিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার তাঁহাকে কহিলেন, "রোগিণী নিদ্রিতা। এই সময় একবার দেখিয়া আসিলে হয় না ?"

হাকিম আজ্ঞা-পালনে গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "কি দেখিলেন ?"

হাকিম। যেরূপ নাড়ীর গতি, তাহাতে বোধ হয়, রাত্রি এক প্রহর ছয় দণ্ডের মধ্যে বিবির জীবলীলা ফুরাইবে।

নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তৎসহ তাঁহার লোচন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিস্রুত হইল। হাকিম চলিয়া গেলেন। নবকুমার একান্তে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট আলোচনা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর ও স্বীয় অদৃষ্টের আলোচনা করিতে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; তথাপি তাহা হইতে চিত্তকে বিরত করা অসাধ্য। অনেকক্ষণ পরে এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "পদ্মাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গ সহকারে তাঁহার পীড়াও বাড়িয়াছে।"

নবকুমার তাহাকে বলিলেন, "তুমি হাকিমের নিকট সংবাদ দেও। আমি চলিলাম।"

নবকুমার সত্বর রুগ্নার গৃহে গমন করিলেন। গমনসময়ে তাঁহার পদ কম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষোবেপন দ্রুত হইল। দারুণ ভীতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

পদ্মা প্রণয় ও স্নেহপরিপূরিত হাস্যে নবকুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। নবকুমার নিকটস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। পদ্মা ক্ষণপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর"—এই বলিয়া নবকুমারের হস্ত ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমাকে কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তো কিছুই মনে পড়িতেছে না। তুমি আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। আমি ততদূর অনুগ্রহের পাত্রী নহি। তথাপি তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্ভব, তাহার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে অনুগ্রহ না করিলে কে করিবে ? তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি করিয়াছ। কিন্তু আমি অভাগী, জীবনে তোমার সন্তোষজনক কি কার্য্য করিয়াছি ? আমি কবে তোমার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি ? তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ ; আমার জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। তোমার গুণের সীমা নাই। কিন্তু আমি তো চলিলাম। তোমার অনুগ্রহের কিঞ্চিৎমাত্র প্রতিদান করাও আমার

সাধ্যাতীত। এ পাপীয়সীর তুমি যে কিছু হিত করিয়াছ, তাহা প্রতিদান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কর নাই—আমার তাহা সাধ্যও নহে; কিন্তু আমি পারি বা নাই পারি, ভগবান্ অবশ্যই তোমার গুণের প্রতিদান করিবেন, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।"

বলিতে বলিতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পদ্মার নয়ন হইতে নিপতিত হইল। নবকুমার দারুণ মানসিক যাতনা-প্রভাবে অবনত মস্তকে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ মস্তকোত্তোলন করিলেন; উভয়ের চক্ষু সংযত হইল। নবকুমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় নয়নোপরি পদ্মাবতীর হস্ত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় চারি জন হাকিম তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রুগ্নার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল সকলে পরামর্শ করিয়া এক জন পার্শ্ব হইতে একটি বাটি লইয়া তাহাতে একটু তরল ঔষধ দিয়া, নবকুমারের কানে কানে কহিলেন, "শীঘ্র বিবির মোহ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেই সময় বিবিকে এই ঔষধ সেবন করাইবেন। আমরা নিকটেই থাকিলাম, যদি তাহাতে উপকার না হয়, সংবাদ দিবেন।"

হাকিমেরা প্রস্থান করিলেন। নবকুমার প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয়ে পদ্মাবতি! আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। আমি তোমাকে—"

পদ্মাবতী সে কথা না শুনিয়া অতি ক্লেশে কহিলেন, "নবকুমার, আমার বড় অসুখ হইতেছে! আর অধিকক্ষণ আমাকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না বোধ হইতেছে, আমার হাত-পা ঝিন্ ঝিন্ করিতেছে।"

নবকুমার চমকিত হইয়া পদ্মাবতীকে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পদ্মার ভ্রূযুগ বিস্তৃত হইতেছে। লোচনতারা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং মস্তক স্পন্দিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে পদ্মা চেতনাহীন হইয়া নবকুমারের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। নবকুমার অতি ব্যস্ততা সহকারে এক হস্তে পদ্মার মস্তক ধারণ করিলেন এবং অপর হস্তে সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে পদ্মার মুখে দিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে, অতি যত্নে ও অতি বিলম্বে কিঞ্চিৎ ঔষধ উদরস্থ হইল। ক্রমে ক্রমে একটু চেতনা হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে পদ্মার লোচনাদি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল; এই সময়ে বাহিরে কতকগুলি পদধ্বনি শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ, উমাপতি ও হাকিমেরা তথায় প্রবেশ করিলেন।

চিকিৎসকেরা রুগ্নাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। বিশেষ করিয়া দেখিয়া একটু অন্তরে গিয়া বাদশাহের কানে কানে কহিলেন, "আর অন্যূন এক ঘণ্টা পরে বিবির আর একবার মোহ হইবে। সে মোহ ভাঙ্গিবে না, তাহাতেই বোধ করি, বিবির জীবনান্ত হইবে।"

জাহাঙ্গীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রুগ্নার নিকটস্থ হইলেন। পদ্মাবতী কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "বাদশাহ! অন্তিম সময়ে আপনাকে আর কি বলিব? আমার জীবন তো যায়। আমি চিরদিনের নিমিত্ত আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি। আর আমাকে মনে করিবেন না। আমি মরিব, তাহাতে আমি স্বয়ং দুঃখিত নহি, আপনারা দুঃখিত হইবেন কেন? পাপিষ্ঠাকে মনে করিয়া কি সুখ?"

বাদশাহ শোকসন্তপ্ত-স্বরে কহিলেন, "পদ্মাবতি!" আর কথা বাদশাহের মুখ হইতে বাহির হইল না।

পদ্মা। বাদশাহ! আমি কে? আমি জগতের পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতে জন্মিয়াছিলাম, যত দূর সম্ভব, তাহা করিয়াছি। আমি পাপিষ্ঠা। পাপিষ্ঠাকে কেন মনে স্থান দিবেন? আমার নাম সংসার হইতে বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। কাহারও হৃদয়ে তাহার চিহ্ন না থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

বাদশাহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সকলেই নীরব। কে কি বলিবেন? অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পদ্মা আবার বলিলেন, "আমার অসুখ ক্রমেই বাড়িতেছে। কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। কত কথা ছিল, তাহা এক্ষণে বলিয়া উঠা অসম্ভব। আমার বোধ হইতেছে, মৃত্যু যেন এবার আমাকে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হয় করুক। জীবিতেশ নবকুমার! (নিস্তব্ধতার পর) তোমাকে অনেক কথা বলিব। (নিস্তব্ধ) এক্ষণে আর বলিয়া উঠিতে পারি বোধ হয় না। এক কথা বলি—এটি আমার অনুরোধস্বরূপ জানিবে। তুমি বল যে, ইহার পর কপালকুণ্ডলার নিমিত্ত যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিবে। (নিস্তব্ধ) যদি স্বীকৃত হও, তাহা হইলে আমার তো মৃত্যু উপস্থিত, আমি এ অবস্থাতেও

কিয়ৎপরিমাণে শান্তি ও সুখ পাই, আর কিছু বলাও অসাধ্য।"

পদ্মাবতী নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নিতান্ত ক্লেশ বোধ হইল। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। নবকুমার সজলনয়নে কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার সুখের নিমিত্ত আমি বিষ-পানে প্রস্তুত, এ তো সামান্য কথা।"

এই সময়ে সকলেই লক্ষ্য করিলেন, পদ্মার পূর্ব্বের ন্যায় মোহের লক্ষণ উপস্থিত। পদ্মা অতি কষ্টে বলিলেন, "আর বিলম্ব নাই। নবকুমার! স্বামিন্! আমাকে বিদায় দেও। ফুরাইল। আমি জন্মের মত—"

পদ্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। ব্যথিতহৃদয় নবকুমার ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "ভয় কি?" এই বলিয়া পদ্মার মস্তক ধারণ করিয়া স্বীয় উরুতে রক্ষা করিলেন। পদ্মার তখন সংজ্ঞা লোপ হইতেছে। তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি তিনি সজোরে নবকুমারের বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার রসনা পরাজিত হইল,—নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল—চরম-সময়ও উপস্থিত হইল। এই সময় পদ্মা একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন।

"ন—ব" বলিয়া বলিতে পারিলেন না। জীবনের শেষ লক্ষণ সকল উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকবার অঙ্গুলি স্পন্দন করিলেন। তাহার অর্থ কে বলিবে? তিনবারমাত্র তিনি নিশ্বাসের নিমিত্ত বদন ব্যাদন করিলেন। প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল। অবিকৃত পবিত্রভাবে পদ্মাবতীর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল। বহু-যত্ন প্রাপ্ত আদরের ধন, নবকুমারের নাম তাঁহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। জীবনবিহীন মস্তক সুখময় আধার হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, বসুন্ধরার আলোক নিবিল। তৎসহ পদ্মাবতীর জীবন-প্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল। জীবনে তাঁহার সুখ ছিল না। সুখের আশায় তিনি কি না করিয়াছেন? বৎসরেক হইতে তিনি কথঞ্চিৎ সুখে ছিলেন। সে সুখের দিন অন্ত ফুরাইল—সকলই ফুরাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মোহে

"He turned to the left—is he sure of sight.
There sat a lady youthful and bright."
—Byron.

পদ্মাবতীর মৃত্যুর প্রায় দেড়মাসকাল পরে কালনার গঞ্জের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাবক্ষে একখানি নৌকা উজান যাইতেছে দেখা গেল। পৌষমাস—রাত্রিকাল—দারুণ শীত—দারুণ অন্ধকার। নৌকা-বাহকেরা শীতে বড় কাতর হইল, এ জন্য তীরে নৌকা লাগাইল, প্রাতে নৌকা মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এক জন নবকুমার অপর উমাপতি।

উমাপতি কহিলেন, "কল্য অন্ধকারে কোথায় নৌকা লাগাইয়াছিল, স্থির করিতে পারা যায় নাই, এখন দেখিতেছ, উপরে একখানি বেশ গ্রাম আছে।"

এই কথার পর উভয়ে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় এক জন স্নাত ব্রাহ্মণকে উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, এ কোন্ গ্রাম?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যশিপুর।"

"যশিপুর" শুনিবামাত্র নবকুমার কিছু চঞ্চল হইলেন। সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না; তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটি পথে উপস্থিত হইলেন। এটি গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ। পথ পর্য্যন্ত আসায় তাঁহাদের গ্রামের মধ্যদেশ দেখিতেও ইচ্ছা হইল। বিবিধ কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া উভয়ে বহুদূর গমন করিলেন। সম্মুখস্থ একটি ভবন তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিল। এতাদৃশ সামান্য গ্রামের পক্ষে এ ভবনটি গর্ব্বস্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে এই আলয়টি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের দৃষ্টি ছাদের উপর সঞ্চালিত হইল। উমাপতির দৃষ্টি সে সময় অন্যদিকে ছিল। নবকুমার দেখিলেন, আলুলায়িতকুন্তলা একটি পরমাসুন্দরী যুবতী রমণী একমনে পার্শ্বস্থ বন-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার বদনের এক পার্শ্বমাত্র নবকুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সহসা রমণীর মনের কি ভাবান্তর জন্মিল, তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার সুচারু বদন সম্পূর্ণরূপে নবকুমারের

নয়নগোচর হইল। আর ভ্রম রহিল না। হৃদয়ে অগ্নি জলিল। সে অগ্নিতেজ সহ্য করে, মনুষ্যের কি ক্ষমতা! চেতনাশূন্য নবকুমারের দেহ ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। সহসা তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে উমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। কি কারণে তাঁহার সহসা এরূপ হইল, তাহা তাঁহার চেতনা না হইলে জানিবার উপায় নাই, অথচ তাহার প্রতীকার এরূপ অবস্থায় থাকাও বিহিত নহে বিবেচনায় সত্বর এক ব্যক্তির সাহায্যে বাহক যানাদি সংগ্রহ করিয়া, নবকুমারের অচৈতন্য দেহ লইয়া নৌকায় গেলেন।

সেই দিবস সায়ংকালে নবকুমারের অচৈতন্য দেহ সহিত নৌকা নবদ্বীপের নিম্নে পৌঁছিল। ইতিমধ্যে নবকুমারের একবারও চৈতন্য হয় নাই, এমন নহে; ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেতনা ক্ষণস্থায়ী। ইতিমধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, উমাপতি তাহারও মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হন নাই। নবকুমারের দেহ মথুরানাথের ভবনে নীত হইল। তথায় নানাবিধ চেষ্টায় সেই দিন রাত্রি শেষে নবকুমারের জ্ঞান হইল। তখন তিনি বলিলেন "কপালকুণ্ডলা আছেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। বিলম্বে আবশ্যক নাই। তোমরা চল; অদ্যই আমি তথায় যাইব। আমাকে এখানে কেন আনিলে?"

উমাপতি, মথুরানাথ, অধিকারী প্রভৃতি সকলে এতচ্ছ্রবণে অবাক্ হইলেন; অথচ এই কথাতে উপেক্ষা করিতেও সাহস করিলেন না। নবকুমার পুনরায় যশিপুর যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল থাকায় আর চারি পাঁচ দিন পরে যাওয়া হইবে স্থির হইল। অধিকারী প্রায় এক মাস পূর্ব্বে নবদ্বীপ আসিয়াছেন।—নবকুমার আজি আসিবেন, কালি আসিবেন করিয়া এত বিলম্ব করিলেন, অধিকারী অগত্যা অপেক্ষায় থাকিলেন। তাঁহার ভবানীসেবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে যে শীঘ্র যাইতে পারিবেন, তাহারও সম্ভবনা নাই। নবকুমারের শরীর সুস্থ না হইলে এবং কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাস ও অসম্ভব হইলেও তাহার শেষ না দেখিয়া তাঁহার যাওয়া হয় না। সুতরাং তিনিও এ কয় দিনের নিমিত্ত থাকিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রহস্যোদ্ভেদ

"Yet heavens are just and time
suppresseth wrongs."
—Shakespear.

দুই দিবস পরে নবকুমার ও উমাপতি মথুরানাথের আলয়পার্শ্বস্থ পথে দাঁড়াইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। পথ বহিয়া নানাবিধ লোক গমন করিতেছে। সহসা উমাপতি বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিতেছি। উনি কোথা হইতে আসিলেন?"

নবকুমার বলিলেন, "কে উনি?"

উমা। মুক্তকেশীর পিতা।

ভট্টাচার্য্য তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইলেন। উমাপতি ও নবকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিস্মিতের ন্যায় উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি এখানে? মঙ্গল ত?"

ভট্টা। সমস্ত মঙ্গল। একটু প্রয়োজন হেতু আমি এ দেশে আসিয়াছিলাম। সে কার্য্যের শেষ হইল না। এক্ষণে বাটী ফিরিতেছি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনি আমার বিশেষ আত্মীয়। আমাদের এক গ্রামেই বাটী। এখানে ইঁহার ভগ্নীপতির আবাস। তিনিও আমার পরিচিত। দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসা হইয়াছিল। আমরা কল্যই বাটী ফিরিব, ভাল হইল, একসঙ্গে যাওয়া ঘটিবে।"

ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন। সকলে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য ও অধিকারী নিকটস্থ হইলে তাঁহারা উভয়ে ক্ষণেক উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রত্যেকে অপরকে পরিচিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ দূর হইয়া প্রতীতি জন্মিল। অধিকারী উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া ভট্টাচার্য্যের পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "দাদা! আপনি কেমন আছেন? আপনার সহিত যে আর সাক্ষাৎ হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, "হরিচরণ!" এই কথা বলিয়া অধিকারীকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বাক্য

তাঁহাদের মনের ভাব বহন করিতে পারিল না। ক্রমে যত অন্তরের শান্তি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার ও উমাপতি বিস্ময়াবিষ্ট এবং হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন, "তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ, হইতে পার; আমি তোমাদের সমস্ত কথা বলিব। শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। নবকুমার! আমি এক দিন কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিব বলিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। বিধাতার অনুগ্রহে অদ্য সে দিন উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়া তোমরাও অবাক্ হইবে,—দাদাও অবাক্ হইবেন। দাদা, একটু বিশ্রাম করুন, পরে সে কথা বলিব।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কৌতূহলপরবশ হইয়া তখনই তাঁহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই এ প্রস্তাবে যোগ দিলেন।

অধিকারী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দাদা! আপনার কন্যাকে আমি জীবিত পাইয়াছিলাম এবং লালন-পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলাম। অদৃষ্ট-দোষে সকলই মন্দ হইল। নবকুমার! এই যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনি কপালকুণ্ডলার পিতা, আমি উঁহার খুল্লতাতপুত্র সুতরাং আমরা উভয়েই তোমার শ্বশুর।"

নবকুমার ও ভট্টাচার্য্য হতবুদ্ধির ন্যায় সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন। অধিকারী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার সহিত তোমার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা এত দিন ব্যক্ত করি নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল; সমস্ত শুনিলে বুঝিতে পারিবে। দাদার যখন প্রথম কন্যা হয়, তখন আমি বাটী ছিলাম। সেই কন্যার নাম পূর্ণকেশী। তাহার যখন দুই বৎসর বয়স, তখন আমি পলাশী ত্যাগ করিয়া হিজলী আসি। হিজলীর ভবানীচরণে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম। আমি ইহা কাহাকেও বলি নাই।

"আমি হিজলীর ভবানীর সেবা করি এবং তথায় থাকি, এমন সময় এক দিন সেই জটাজূটধারী কাপালিক একটি বালিকার হস্ত ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আসিলেন। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম যে, বালিকা অন্য কেহ নহে, আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী। কাপালিক কহিলেন, 'আমি ইহাকে সমুদ্রতীরে কুড়াইয়া পাইয়াছি; তুমি ইহাকে যত্ন করিয়া রাখ। ইহা দ্বারা পরিণামে আমার বিস্তর কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমি কখন্ কোথায় থাকি, কি করি, স্থির নাই; বিশেষতঃ সংসারীর ন্যায় সন্তান-লালন-পালন কার্য্যে আমি নিতান্ত অশক্ত। এ জন্য বলিতেছি, এ বালিকা তোমার নিকট থাকুক। তুমি ইহাতে কি বল?'

"আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, বালিকা আমার আপনার। আমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণে অস্বীকৃত হইলে কাপালিক ইহাকে সমুদ্রতীরস্থ বনে লইয়া যাইবে। তথায় ইহার জীবনরক্ষা হওয়া সঙ্কট। আমি যদিও সংসারের প্রতি মমতা-শূন্য, তথাপি স্নেহ কোথায় যাইবে? আবার কাপালিক যদি জানিতে পারে যে, এ বালিকার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা হইলে কখন তাহাকে আমার নিকট রাখিবে না। আমার নিকট না থাকিলে তাহার বাঁচিবারও আশা থাকিবে না। এই সকল কারণে সমস্ত কথা গোপন করিয়া কহিলাম, আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইবে। বালিকাকে আমিই রাখিব। কাপালিক তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু প্রত্যহ আসিয়া বালিকাকে দর্শন ও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিত। এই সময় কাপালিক বালিকার কপাল-কুণ্ডলা এই নাম রক্ষা করিল। কপালকুণ্ডলা আমার যত্নে পালিত ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

"কপালকুণ্ডলা সেই বিজন বনে কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে প্রথম দর্শনাবধি মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; কিন্তু কি করি, সে কথা আমাকে কে জানাইবে? কপালকুণ্ডলা বালিকা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি স্বয়ং যে তদ্বিষয়ে সন্ধান জানিবার জন্য গৃহাগমন করিব, তাহাও দুর্ঘট। কারণ, অপোগণ্ড বালিকার জীবন আমার হস্তে ন্যস্ত। ক্রমে কপালকুণ্ডলা কথঞ্চিৎ স্বাধীন হইল। এই সময় যদি আমি কিছু দিনের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাই তাহা হইলে কপালকুণ্ডলার বিশেষ হানি সম্ভাবিত নহে। এজন্য কাপালিক আসিলে তাঁহাকে বলিলাম, ভগবন্! আমি দীর্ঘকাল বাটী যাই নাই, যদিও আমার বাটীতে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহ নাই সত্য, তথাপি জন্মভূমি সময়ে সময়ে দেখিবার নিমিত্ত সকলেরই অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মে। এই কারণে আমি কল্য বাটী যাইব স্থির

করিতেছি। আমি শীঘ্র আসিব। যত দিন না আসি, তত দিন কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিবেন।' কাপালিক অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন! ভবানীগৃহে অপর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার উপর সমস্ত কর্ম্মের ভার দিয়া আমি যাত্রা করিলাম।

"কত কি ভাবিতে ভাবিতে যে বাটী আসিলাম, তাহা এক্ষণে সবিস্তার বলিবার আবশ্যক নাই। বাটী আসিয়া দেখিলাম,—চমৎকার! দাদার শূন্য ভবন পতিত রহিয়াছে, তথায় কেহ নাই। প্রতিবাসী-দিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, তোমার দাদার জাতি গিয়াছে। তিনি সমাজচ্যুত হইয়া এস্থান ত্যাগ করিয়াছেন। অধুনা কোথায় আছেন, আমরা জানি না।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসিলাম, 'দাদা অতি নিরীহ মানুষ; তিনি এমন কর্ম্ম কি করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়?' তদুত্তরে তাহারা কহিল, 'তাঁহার গৃহে ফিরিঙ্গী প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীরা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছে।' আমার মনের অন্ধকার অনেক দূর হইল। জিজ্ঞাসিলাম, 'ভাল, তিনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেন কি প্রকারে?' তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, 'তাহা আমরা জানি না। যাহা জানি, তাই বলি শুন। অনেক দিন হইল, এক দল ফিরিঙ্গী জাহাজে করিয়া যাইতেছিল। তাহারা আমাদের গ্রামের নীচে নোঙর করিয়া উপরে উঠিল। বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে দস্যুরা তোমার দাদার গৃহেই প্রবেশ করিল এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে লইয়া জাহাজে উঠিল; অবিলম্বে জাহাজ ছাড়িল। গ্রামে জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা তোমার দাদাকে খ্রীষ্টান করিয়া গিয়াছে। একথা সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফলতঃ যাহাই হউক, তোমার দাদা এই কারণে সমাজচ্যুত হইলেন। সকলে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ অবস্থাতেও তিনি অনেক দিন এখানে ছিলেন, কিন্তু অধিক দিন এখানে থাকা বিড়ম্বনা বিবেচনায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা তিনি কোথায় আছেন বা তাঁহার কি হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।' আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম। জানিতাম, দাদা অতি ধীরপ্রকৃতি। তিনি বহুকাল হইতে নবাব সরকারের কর্ম্ম করিতেন, অন্যায় কার্য্য দ্বারা গ্রামের লোকের হিতসাধন করিয়া প্রভুর ক্ষতি করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। এখন তাবতেই তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত ছিল। তাহারা কোনরূপেই তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত অপদস্থ করিতে পারে নাই। এক্ষণে একমত হইয়া এই উপায়ে তাঁহার উপর নির্য্যাতন করিয়াছে। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে দাদার সন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এজন্য বহুদিন নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইলাম না। আমি যে হিজলীতে আছি, তাহা দাদা জানিতেন না; জগতের কেহই জানিত না। জানিলে দাদা অবশ্য আমাকে সংবাদ দিতেন। যাহা হউক, অগত্যা হতাশ হইয়া ভবানীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"আমার আসিতে অনেক দিন বিলম্ব হইল। পুনরাগত হইয়া দেখিলাম, কাপালিক কপাল-কুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরস্থ বনে লইয়া গিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা এক্ষণে প্রকৃত যোগিনী-বেশ ধারণ করিয়াছে। সেখানে অন্যবিধ পরিচ্ছদ বা ভূষণ দুষ্প্রাপ্য। তখন তাহার বয়স সাত বর্ষ মাত্র। সৌন্দর্য্য-সংবর্দ্ধনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, কপাল-কুণ্ডলার দেহে তৎসমস্তই ছিল। এই যোগিনী-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহার যে কত শোভা হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বনে বনে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় ভ্রমণ করা তাহার স্বভাব হইয়া উঠিল। সন্নিহিত কাননের কোন স্থানই তাহার অগোচর রহিল না। আমার নিকট প্রতিদিন যে কোন সময়ে হউক, একবার আসিত। আমি তাহাকে দেখিলে কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিতাম। তাহার জন্য আমার ভয়ানক ভাবনা হইত। তন্ত্রমতাচারী দুরন্ত কাপালিক তাহাকে যে অভিপ্রায়ে সযত্নে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা আমার অবিদিত ছিল না। সুতরাং কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার হস্ত হইতে নিস্তারের চেষ্টায় আমি বড় ব্যাকুল হইলাম।

"পিতা কে, মাতা কে, আমি কে, কাপালিক কে, কোথায় বাড়ী, এখানে কেন আসিল, এ সকল বিষয়ে কপালকুণ্ডলার অণুমাত্র জ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে তৎসম্বন্ধে আমাকে কখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত না। পাছে কপালকুণ্ডলার মনে তন্নিমিত্ত চঞ্চলতা জন্মে, এই জন্য আমি যথাসাধ্য সে সকল প্রসঙ্গ গোপন রাখিয়াছিলাম। সেও রহস্য-উদ্ভাবনে সমর্থ হয় নাই। তাহার জ্ঞানে

সেই বনই সংসার। বিশ্বসংসার সেই সামান্য স্থান-টুকুতে আবদ্ধ। সেই সমুদ্রতীরস্থ বন, সেই বেলাভূমি, সেই সকল হিংস্র জন্তু, সেই কাপালিক ইত্যাদি লইয়া পৃথিবী। ইহারই সাধারণ নাম সংসার। সরলা বালিকা আর কিছুই জানিত না, সুতরাং সে কখনও চিন্তিত হইত না, কাপালিক মধ্যে মধ্যে দুই এক বিপন্ন ব্যক্তিকে ধরিয়া বলি দিত। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারিল এবং তৎসম্বন্ধে স্বয়ং মীমাংসা করিল যে, আমরা ছাড়া জগতে আরও কতগুলি মনুষ্য আছে। তাহারা কাপালিকের যথার্থ সৃষ্ট হইয়া কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। কাপালিক প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগের এক একটিকে লইয়া আইসে ও বলি দেয়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কপালকুণ্ডলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাপালিকের বলি দিবার মনুষ্যেরা কোথায় থাকে?' তাহার কথায় আমার হাসি আসিল। আমি তাহাকে সংসারের কিছু কিছু সংবাদ যথাসম্ভব বুঝাইলাম, কাপালিক কেন তাহাকে এত যত্নে প্রতিপালন করিতেছে, তাহা যত দূর তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারে, তত দূর বলিলাম। কপালকুণ্ডলা সমস্ত শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হইল। সতীত্ব-রত্ন যে নারীজাতির প্রধান অলঙ্কার আমি তাহাকে তাহা জানাইয়াছিলাম। সে নিজের অবস্থার নিমিত্ত চিন্তিত হইল; সোৎকণ্ঠায় কহিল, 'কি হইবে? কিরূপে মুক্ত হইব?' আমি কহিলাম, 'এ স্থান হইতে পলায়ন ব্যতীত নিষ্কৃতি লাভ করা সুকঠিন। তাহাতে অনেক বাধা আছে। তুমি ভবানীর আশ্রিতা, চিন্তিত হইও না, ভবানী অবশ্যই রক্ষা করিবেন।'

"এই সময় কপালকুণ্ডলার পলাইবার সুযোগ হইয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমার একটি শিষ্য আসিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত পলায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু আমার তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। পরপুরুষের সহিত পাঠাইতে আমার মন সরিল না। ভবানীর যাহা ইচ্ছা, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে? আমি সে সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকে পাঠাইলাম না। তখন কপালকুণ্ডলার বয়স বারো বৎসর। ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করিল। বনমধ্যে বনকুসুমের ন্যায় তাহার অতুল্য শোভা আপন মনে বিকসিত হইতে লাগিল। সে আমার বড় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে প্রতিনিয়ত কপালকুণ্ডলার কল্যাণকামনা ভিন্ন অন্য কিছুই আমার মনে হইত না। আমি তাহাকে লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলাম। 'পরিণামে কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে কি হইবে,' ইহা ভাবিলে আমার গায়ে জ্বর আসিত—আমার শোণিত শুষ্ক হইত।

"নারীর মন স্বভাবতই পরের দুঃখ দেখিলে দ্রব হয়। কাপালিক যে সময়ে সময়ে বিপন্ন পথিক ধরিয়া বলি দিত, তাহাতেই কপালকুণ্ডলা বড়ই ক্লেশ পাইত। কিছু দিন পরে এই নবকুমার ঘটনাক্রমে কাপালিকের চক্রে পড়িয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা সেই সময় ইহাকে অনেক যত্নে রক্ষা করিয়া আমার নিকট পলাইয়া আইসে। আমি দেখিলাম, এ ঘটনায় কাপালিক কপালকুণ্ডলার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইবে এবং তাহাতে কপালকুণ্ডলার বিলক্ষণ বিপদ্ সম্ভাবিত। ভাবিলাম, কপালকুণ্ডলা যাঁহার প্রাণরক্ষা করিল, তিনি অবশ্যই ইহাকেও রক্ষা করিবেন। পরিচয়ে জানিলাম, নবকুমার সদ্‌ব্রাহ্মণ ও কুলীন। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করায় ইনি কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি মহানন্দে যথাসম্ভব শাস্ত্রানুসারে দেবীর আলয়ে এই নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা সম্প্রদান করিলাম। দাদা! এই নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার জামাতা।"

ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অধিকারীর কথা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি রোরুদ্যমান হইয়া নবকুমারকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। অধিকারী তাঁহাকে সুস্থির করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "পরদিন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। এ সময় কপালকুণ্ডলার বয়স সপ্তদশ বৎসর। আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম, এক দিন না এক দিন কপালকুণ্ডলা সুখ কাহাকে বলে, জানিতে পারিবে। সকলই বিপরীত হইল। মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিয়া অধিকারী আবার কহিলেন, "প্রায় ছয় মাস হইল, ভবানীর আলয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আসিবার প্রায় বৎসরেক পূর্ব্ব হইতে আমি স্বপ্ন দেখিতাম যে, ভবানী মহেশমোহিনী সিংহবাহিনীরূপে আমার শিয়রে

দাঁড়াইয়া কহিতেন, 'বৎস! তোমার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইল কেন? তোমার কপালকুণ্ডলা সংসারে কত কষ্ট পাইতেছে, তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন?' এইমাত্র বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইতেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইত। আমি থর থর করিয়া কাঁপিতাম। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শীঘ্র ভবানীর ইচ্ছাস্বরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না। কার্য্য হইতে অবকাশ প্রাপ্তিমাত্র আমি কপালকুণ্ডলার তত্ত্বে আসিলাম। সপ্তগ্রামে পৌঁছিলাম; তথায় নবকুমার নাই! অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি সপরিবার নবদ্বীপে তাঁহার ভগ্নীপতি মথুরানাথের বাটী গিয়াছেন। আমি নবদ্বীপ আসিলাম। এখানে নবকুমারের মুখে শুনিলাম, অভাগিনী কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন।"

ভট্টাচার্য্যের মনে নিজ কন্যা সম্বন্ধে একটু নূতনবিধ আশার সঞ্চার হইয়াছিল, অধিকারীর সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি শোক সমুপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "সে নাই বলিয়া তো আমি অনেক দিন জানিয়াছি। মনে এমন ভরসাও করি নাই যে, কখন তাহাকে পাইব; কিন্তু বাছা যে এত দিন জীবিত ছিল এবং সজ্জনের সহিত বিবাহিত হইয়া আমার এত নিকটে আসিয়াছিল, অথচ আমি তাহাকে আর একটিবারও দেখিতে পাইলাম না, ইহা বড় দুঃখের কথা; কিন্তু দুঃখ হইলেও অদ্য আমার আনন্দের দিন। যেহেতু, অদ্য আমি অসম্ভাবিত উপায়ে ভ্রাতা ও জামাতা লাভ করিলাম। বাপু নবকুমার! আমার কন্যা তোমার গৃহিণী হইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টে এতদূর ঘটিয়াছিল, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। আমি অদ্য তোমাকে পাইয়া বিস্তর আনন্দ লাভ করিলাম।"

অধুনা যে প্রকারে ও যে ভাবে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছেন, তাহা অধিকারী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন। তদ্বিষয়ে অন্যের সহস্র সন্দেহ থাকিলেও নবকুমারের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যাহার জীবনে এক বিন্দু সুখ ছিল না, সেই অভাগী যে জলে ডুবিয়া আবার অসম্ভাবিত উপায়ে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে পুনর্জীবন লাভ করিবে, ইহা নিতান্ত দুরাশা। তবে ঐ পথ দিয়া বাটী যাইতে হইবে, তোমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, একবার দেখিতে হয় দেখিও।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন, "স্বস্থান ত্যাগ করার পর অবধি আপনি কোন্ স্থানে কি ভাবে আছেন, জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহাই বটে। আমাকে সেই বিপদের উপর গ্রামের লোকেরা সমাজচ্যুত করিল। আর আমাকে লইয়া যে কত আমোদ করিতে লাগিল, তাহা তোমাকে কি বলিব? এই সকল কারণে আমার বড় ঘৃণা জন্মিল। সে স্থানে আর এক তিলও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কি করি, কোথায় যাই, কাহার নিকট আশ্রয় লইয়া এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করি? সপ্তগ্রাম-সন্নিহিত গোপালপুর গ্রামে আমার এক পরমাত্মীয় আছেন। তিনি আমার সাহায্যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে অতি উন্নত পদে আরূঢ় হন। তাঁহার নাম হরিহর। তিনি এই উগ্রপতির মাতুল। যদিও আমি হরিহরের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ নহি এবং যদিও আমি তাঁহার বিশেষ কোন উপকার করি নাই, তথাপি হরিহর স্বীয় সৌজন্য ও মহত্ত্বহেতু আমাকে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। নিজ গ্রামমধ্যে হরিহর অদ্বিতীয় ধনী, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্, এ জন্য গ্রামের যাবৎ লোক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে ইচ্ছুক হইলাম। তাঁহারই পরামর্শক্রমে আমি গোপালপুরে লুক্কায়িতভাবে বাস করিতে লাগিলাম। হরিহরের যত্নে এখানে সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। পলাশীর কোন লোক সহসা আমি কোথায় গেলাম অথবা আমার কি হইল, তাহা জানিতে পারিল না।

আমার উপার্জ্জিত যে অর্থ ছিল, তাহা ফিরিঙ্গীরা লুঠিয়া লইয়াছিল, সুতরাং নিঃস্ব হইলাম। একটু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইলাম, তাহার কিয়দংশ দ্বারা গোপালপুরে বাসোপযোগী একটি সামান্য বাটী হইল। অপর অংশ হরিহর কারবারে খাটাইতে লাগিলেন। তাহার উপস্বত্বে আমাদের চলিতে লাগিল। আমার অনুরোধে হরিহর অপহৃত কন্যার নিমিত্ত

নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন ; আমিও যথাসাধ্য অনুসন্ধানের ক্রটি করিলাম না, কিন্তু কিছুই হইল না। দেশত্যাগ করার কিছু দিন পরে আমার আর একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম মুক্তকেশী।

ক্রমে মুক্তকেশীর বিবাহের সময় হইল। কিন্তু তাহার বিবাহের পক্ষে বড়ই বিঘ্ন ঘটিল। আমার বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিবে ? বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইলে পলাশীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহারা কখনই বলিবে না। এই কারণে হরিহরের সম্মতি ও পরামর্শানুসারে বিবাহের বিলম্ব হইল। সম্প্রতি বিধাতার অনুকম্পায় ও মুক্তকেশীর শুভাদৃষ্টক্রমে এই উমাপতির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। মাঘ মাসে বিবাহ দিব সঙ্কল্প করিয়াছি। এ প্রদেশে আমাদের দুই জন জ্ঞাতি-কুটুম্ব আছেন, তাহা তুমি জান। পাছে গ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছি শুনিয়া তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করেন, এই ভয়ে আমি এত দিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎও করি নাই, সংবাদাদিও দিই নাই। এক্ষণে আমার আর সে ভাবনা নাই। কন্যার বিবাহ লইয়া ভাবনা ছিল, সে ভাবনার প্রতিবিধান হইয়াছে, আর আমার ভয় কি ? তাঁহাদের সমস্ত বলিয়া বাটী যাইতেছি। বিধাতার ইচ্ছায় পথে এই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ। মনে যাহা ভাবি নাই, যাহা কখনও আশা করি নাই, তাহা অদ্য ঘটিল। অদৃষ্টে যত দুঃখ ছিল, তাহা ঘটিয়াছে, আর ভগবানের মনে কি আছে, কি জানি। নবকুমারের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা যদিও অসম্ভব ও অঘটনীয়, তথাপি বাটী যাইবার ঐ পথ। কল্য তোমরা বাটী যাইবে, সে সন্দেহও ভঞ্জন করিও।”

এইরূপ কথাবার্ত্তায় যুগপৎ আনন্দে ও শোকে সে দিন কাটিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুসংবাদে

“ক ঈপ্সিতার্থং স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ ...”

—কুমারসম্ভবম্।

পরদিন প্রত্যূষে সকলে যাত্রা করিয়া সমুচিত সময়ে যশিপুর পৌছিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা জমীদার রামদাস রায়ের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে সকলেই হতাশ হইলেন। শুনিলেন, রামদাস সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে কেহ নাই। তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ তথায় অবস্থান করিতেছেন। এ সংবাদে অন্যের যত মনঃপীড়া হউক না হউক, নবকুমার নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অন্যেরা যাহা বিশ্বাস করে নাই, অথবা যাহা আশা করে নাই, তাহা না হওয়ায় তাহাদের তাদৃশ মনঃপীড়া জন্মিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের সুখের পরিণাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়, তদন্যথায় তাহার নিতান্ত ক্লেশ হইবে সন্দেহ কি ? নবকুমার এ সংবাদে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেন। কপালকুণ্ডলা আছেন এবং তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে, এ আশা কেহই হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কেহই ইহা বিশ্বাস করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ নূতন কোন ক্লেশ হইল না ; কিন্তু নবকুমার নিশ্চিত জানিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা আছেন। যদি মনুষ্য স্বকীয় দর্শনকে অপ্রত্যয় না করে, নবকুমার তাহা হইলে কপালকুণ্ডলা আছেন, তাহাতে স্থিরনিশ্চয় না হইবেন কেন ? সুতরাং এ সংবাদে নবকুমারের ক্লেশ অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আর তথায় অনর্থক অপেক্ষা করিয়া কি হইবে, বিবেচনায় সকলেই প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। নবকুমার এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। সকলে তাঁহাকে অনর্থক কালক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। নবকুমার কহিলেন, “আমি এ বিষয়ে সবিশেষ সন্ধান না লইয়া যাইব না ; আপনাদের প্রয়োজন থাকে, যাইতে পারেন। আমি যাইব না।”

তাঁহারা অতঃপর নবকুমারের কথায় প্রতিবাদ করা অবিধেয় বোধ করিয়া কহিলেন, “তবে এক্ষণে কি করিবে কর।”

নবকুমার তাহাদের সঙ্গে লইয়া রামদাসের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ জাতিতে কায়স্থ, প্রাচীন, বুদ্ধিমান্ এবং বিজ্ঞ। ব্রাহ্মণ দর্শনে কর্ম্মাধ্যক্ষ গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের বসিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে কর্ম্মাধ্যক্ষ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

নবকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়ের নাম ?"

কর্ম্মা। আমার নাম মধুসূদন বসু।

নব। আপনি এ সংসারে কর্ম্ম করেন ?

মধু। পিতৃপিতামহক্রমে আমরা এই অন্নে পালিত। সম্প্রতি মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে শুভাগমন হইয়াছে ?

নব। ক্রমে জানাইতেছি, আপাততঃ গৃহস্বামী কোথায় ?

মধু। কর্ত্তামহাশয় দুই দিন অতীত হইল, সস্ত্রীক তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছেন। সন্তানাদি অভাবে বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী নহেন। প্রায়ই এরূপ গিয়া থাকেন।

নব। তিনি সস্ত্রীক গিয়াছেন, আর কেহ সঙ্গে যান নাই ?

মধু। আর একটি ব্রাহ্মণকন্যা সঙ্গে আছেন। তিনি কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। তাঁহারা ইঁহাকে এক মুহূর্ত্ত চক্ষুর অগোচর হইতে দেন না। অন্য সন্তানাদি অভাবে ইনি তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ। বাস্তবিক তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা অসম্ভব।

নব। তাঁহার বয়স কত—তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ?

মধু। তাঁহার বয়স অনুমান দ্বাবিংশ বর্ষ হইবে। প্রকৃতির কথা কি বলিব ? তেমন ধীর, শান্ত, নির্ম্মল স্বভাব জগতে আর আছে কি না সন্দেহ ; কিন্তু তাঁহার অন্তরে সুখ নাই। খলতা-কপটতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না। গৃহিণী আদর করিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকেন। তিনি এখানে ঐ নামেই পরিচিত।

নব। তাঁহাকে আপনারা কোথায় পাইলেন ?

মধু। কর্ত্তা তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, কর্ত্তা কোন ঘটনাক্রমে নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিবার নিমিত্ত নৌকা হইতে অবতরণ করেন। তথায় গঙ্গার চড়ায় উন্মাদিনীর মৃতপ্রায় দেহ পতিত দেখিতে পান। তিনি বিস্ময়সহকারে মৃতার সৌন্দর্য্য ও জীবিতের ন্যায় অবিকৃতভাব দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, বাস্তবিকই রমণী এখনও জীবিত আছেন। তিনি সত্বর লোকজন ডাকিয়া বহু শুশ্রূষায় তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং গৃহে আনিয়া কন্যার ন্যায় যত্নে ও স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।

নব। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় কিছু জ্ঞাত আছেন ?

মধু। কর্ত্তা, গৃহিণী এবং আমি উন্মাদিনীর পূর্ব্ব-পরিচয় জ্ঞাত আছি। অন্যে কিছু জানে না। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমরা সে কথা প্রকাশ করিব না বলিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। যাহা বলিয়াছি, এতদূর ব্যক্ত করাও উন্মাদিনীর অভিপ্রেত নহে। তথাপি আপনারা ব্রাহ্মণ, বিদেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া অতদূর বলিলাম। অতঃপর আর কিছু বলিতে পারিব না।

নবকুমার কম্পিতস্বরে কহিলেন, "আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহি না। আপনি যাহা বলিবেন না, তাহা আমি বলিতেছি। আপনারা যাঁহাকে উন্মাদিনী বলেন, তাঁহার পূর্ব্বনাম কপালকুণ্ডলা, এ নাম তাঁহার বাল্যরক্ষক কাপালিক-প্রদত্ত। সপ্তগ্রামনিবাসী দুর্ব্বৃত্ত পাপী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বামী।"

এই সময় বসুজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের নাম কি ?"

নবকুমার বিকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমার নাম কেন জিজ্ঞাসিতেছেন ? আমার নাম জগতে যত অপ্রকাশিত থাকে, ততই মঙ্গল। আমিই সেই ঘোর নারকী নবকুমার। আমি ভদ্রের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা আছেন, নিশ্চয় হইল। এক্ষণে আর বিলম্ব সহে না। বসুজ, কোথায় কপালকুণ্ডলা, বলুন—আমি তাঁহার সমক্ষে এ প্রাণ ত্যাগ করিব।"

কেহই রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। অসম্ভব আশা সফলপ্রায় হইল। হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নয়নজল নিবারণ করে ?

বসুজ নবকুমারকে কহিলেন, "মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না। কপালকুণ্ডলা আছেন নিশ্চয়। আজ না হয়, দশ দিন পরে আপনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

নবকুমার কহিলেন, "মহাশয়! এত দিন কপালকুণ্ডলা নাই বলিয়া জানিতাম, তাহাও প্রাণে সহিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এক মুহূর্ত্তও সহ্য হইতেছে না। আপনি বলুন তাঁহারা প্রথমে কোন্ তীর্থে গমন করিবেন ? আমি এখনই তাঁহাদের অনুসরণ করিব।"

মধু। তাঁহারা প্রথমে কালীমাতাকে দেখিবার জন্য কালীঘাটে যাইবেন, সঙ্কল্প আছে।

নব। আমি চলিলাম। যেমন করিয়া হউক, কপালকুণ্ডলার সহিত পুনঃসাক্ষাৎ না করিয়া আমি অন্নজল গ্রহণ করিব না। আপনি বসুন, আমি বিদায় হই।

সকলেই এই প্রস্তাবে একমত হইলেন এবং সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন।

মধু। মহাশয়েরা শ্রান্ত আছেন ; একটু অপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়কে আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আপনার নিকটে আমরা চিরকাল বদ্ধ রহিলাম। যদি বিধাতা দিন দেন, আপনার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে বাধা দিবেন না।"

মধুসূদন সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গত-চিন্তনে

"Thou art too good, and I indeed
unworthy,
Unworthy of much virtue."
—Ottway.

অদ্য পৌষ-সংক্রান্তি—ত্রিবেণী জনাকীর্ণ। অদ্য গঙ্গাস্নানে মুক্তিলাভাশয়ে নানাদেশ হইতে ব্যক্তিবর্গ সমাগত হইয়া এই স্থান কলরবে পূর্ণ করিয়াছে। সমাগত জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সঙ্কুলনের নিমিত্ত সঙ্গে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে এবং তাহাদের আশ্রয়স্থানের নিমিত্ত বহুসংখ্যক তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গার তট ও বক্ষ নৌকায় আবৃত। কত নৌকা আসিতেছে, তাহার নির্ণয় কে করে? এই সময়ে নবকুমার প্রভৃতি যে নৌকায় ছিলেন, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা কল্য যখন যশিপুর হইতে যাত্রা করেন, তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। কল্য তাঁহাদের আহার নাই ; এ জন্য তাঁহারা অদ্য এই স্থানে নামিয়া গঙ্গাস্নান ও আহার করিতে মনস্থ করিলেন। বাজারের প্রান্তদেশে তাঁহারা বাসোপযোগী দুইখানি ঘর স্থির করিলেন। তাহার পার্শ্বে আরও অধিকৃত ও অনধিকৃত অনেক ঘর ছিল। মধ্যে পথ। পথের উভয় পার্শ্বে এরূপ গৃহসমূহ। তাঁহাদের পার্শ্বস্থ কয়েকখানি গৃহ এক জন অধিকার করিয়াছে বোধ হইল।

নবকুমারের মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। আশা, ভীতি, আশঙ্কা, লজ্জা ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া কিরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সংসার আশার মায়ায় আচ্ছন্ন ; মানবহৃদয়মাত্রই আশা-রাশি-পরিপ্লুত। অতি দুঃখের সময়ও আশা আসিয়া সুখের বার্ত্তা কহে ও সুখ অনায়াসলভ্য বলিয়া বোধ জন্মায়। মনুষ্য দুর্দ্দমনীয় বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হয়। কুহকিনী আশা নবকুমারের কর্ণেও মন্ত্র চালিত করিল। আশার দিগন্তব্যাপক ক্ষিপ্রপথে আরোহণ করিয়া কখন তাঁহার মন কপালকুণ্ডলার নিষ্কলঙ্ক হাস্যময় বদনে চুম্বন করিতে লাগিল, কখন বা তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কখন বা আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিগত দুঃখের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আশার কুহক ত্যাগ করিল ; অমনই পাছে কপালকুণ্ডলাকে না পাই বলিয়া আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রেমময়ী মৃন্ময়ীর সমক্ষে তিনি কি বলিয়া কথা কহিবেন, এবং কিরূপেই বা স্বীয় নিষ্ঠুর নীচদৃষ্টি তদীয় দয়াময় পবিত্র দৃষ্টির সহিত সংমিলিত করিবেন, এ চিন্তা তাঁহাকে দারুণ ম্রিয়মান ও লজ্জিত করিতে লাগিল। কখন বা কপালকুণ্ডলা জীবিত আছেন, অদ্য হউক বা দশ দিন পরে হউক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই হইবে, এই অপার আনন্দ তাঁহার মনকে নাচাইতে লাগিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কপাল-কুণ্ডলা-সম্বন্ধীয় আমূল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সেই নব-জলধরনিভ নীলসমুদ্রতটস্থ বনমধ্যে আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি সংবৃতা রমণীরত্ন দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্রিত পুত্তলী অথবা দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর-স্বরে কপালকুণ্ডলা প্রথম সাক্ষাতে নবকুমারকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। কর্ণের মধ্যে এখন যেন সেই স্বর, সেই কথা আবার বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যেন সেই ধ্বনির দ্বিগুণতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল ; কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আর কত কথা

মনে হইল, তাহার সংখ্যা নাই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অস্ফুটস্বরে নবকুমার কহিলেন, "হায়! কপালকুণ্ডলা এক্ষণে কোথায়? আমি কি নরাধম! এতাদৃশী হিতকারিণীর সুখসংবর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে তৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি। কপালকুণ্ডলার জীবন যায় নাই।"

জীবন যায় নাই মনে হইবামাত্র তাঁহার সাক্ষাতে কত কথা বলিতে হইবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অমনই নিজ অসদ্ব্যবহারজনিত সঙ্কোচ জন্মিল;—ভাবিলেন,—কপালকুণ্ডলার চরিত্র সরলতায় পূর্ণ; রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন হীনবৃত্তি তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। আমি তাঁহার নিকট বিস্তর দোষে দোষী সত্য, তথাপি কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন, না করেন— আমি তাঁহার চরণ ধারণ করিব; কিন্তু সে সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা অসম্ভব; তাঁহার স্বভাব আমার ন্যায় নীচ নহে। তিনি আমার ন্যায় দুরাচার নহেন। রমণীর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ; বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার হৃদয়। আমাতে ও কপালকুণ্ডলাতে লক্ষ যোজন অন্তর। প্রণয় দূরে থাকুক, আমি তাঁহার সহিত কথা কহিবারও উপযুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা স্বর্গীয় দেবী, আমি ঘোর নারকী। আমি কোন্ মুখে তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব? কিই বা বলিব? আমার অপরাধের বাকী আছে কি? আমি কপালকুণ্ডলার চরণ ধরিয়া অকপটে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিব। তাঁহার চরণ নয়নজলে সিক্ত করিব, তিনি ক্ষমা না করিলে এ জীবন রাখিব না। কপালকুণ্ডলাকে ধ্যান করিতে করিতে জলন্ত বহ্নিতে জীবন ত্যাগ করিব, কপালকুণ্ডলার ক্ষমা লাভ না করিয়া জীবনধারণের ফল কি? নবকুমার একান্তে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, কপালকুণ্ডলাকে বলিবেন বলিয়া কত কথাই মনে করিতেছেন, কত ভাবই মনে জন্মিতেছে অথচ তিনি অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিতে পারিতেছেন না। অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী ব্যাপারেও তিনি চিত্তকে বদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। মনের এই প্রকৃতি। মন একেবারে দুই বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ

মিলনে

"উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্।"
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

যে স্থানে বসিয়া নবকুমার তদ্বিধ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সে স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে ভাল লাগিল না। উমাপতিকে আহ্বান করিলেন, উভয়ে গৃহের বিপরীত দ্বার দিয়া পশ্চাদ্ভাগস্থ আম্রবৃক্ষের ছায়ায় গমন করিলেন। সেখানে আর মনুষ্য নাই। সে স্থানটিকে ঐ গৃহের প্রাঙ্গণ বলিলে বলা যায়, প্রাঙ্গণের তিন দিক বেড়ার দ্বারা অবরুদ্ধ; এক দিকে একখানি অপর লোকের গৃহ। এই পতিত ভূমিখণ্ডের দিকে তাহার পশ্চাতে একটি বাতায়ন বা ক্ষুদ্র গবাক্ষ। নবকুমার ও উমাপতি সেই গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার কহিলেন, "দেখিলে ভাই! আমি অলীক আশাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই ও বিষয়ে এতাদৃশ দৃঢ় হইয়াছিলাম।"

উমা। যাহা হইবার নহে, তাহা যে হইবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? তুমি দেখিয়াছিলে সত্য, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, সেটি তোমার মনের ভ্রান্তি, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইল।

নব। তাহা হউক ভাই, অবিলম্বে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইব সত্য, কিন্তু আমার মন তাহাতেও শান্ত হইতেছে না। কত প্রকার চিন্তা যে মনে উপস্থিত হইতেছে, তাহা তোমাকে কি বলিব? কপালকুণ্ডলা জীবনে যত কষ্ট পাইয়াছেন, সে সমস্তের মূল আমি। তিনি যখন শৈশবে অরণ্যে ছিলেন, তখন কষ্ট কাহাকে বলে, জানিতেন না। বনে বনে আপন মনে সদানন্দে বেড়াইতেন। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারে আনিয়া কষ্টের সাগরে ভাসাইলাম। তখন হইতে তাঁহার কষ্টের সূত্রপাত হইল, আর একদিনও সুখ কাহাকে বলে জানিতে পারিলেন না। অবশেষে আমার জন্য তাঁহার অপমৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। তবে তিনি না কি নিতান্ত ভবানী-পরায়ণা, এ জন্য ভবানী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবন দান

করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভাবিতেছি কি—হয় তো কপালকুণ্ডলা আপাততঃ একরূপ সুখ-সচ্ছন্দে আছেন, পুনরায় আমার সহিত সম্মিলনে তাঁহার বিপদ ও ক্লেশ ঘটিবে, আমার কপালগুণে তিনি আবার যাতনা পাইবেন।

উমা। কপালকুণ্ডলা যে মনের সুখে নাই, তাহা কি তুমি মধুসূদনের কথায় বুঝ নাই?

নবকুমার আপন মনে কহিলেন, "হায়! কবে সেই দিন আসিবে, যে দিন আমি পুনরায় কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইব।"

উমা। নবকুমার! তুমি দুই দিনাবধি প্রায় আহার কর নাই বলিলেই হয়। তোমার জন্য আমি কিছু খাদ্য আনিব?

নবকুমার কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি চলিয়া গেলেন। নবকুমার দেখিলেন, আম্রবৃক্ষের শাখায় দুইটি শালিক বসিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ একটি শালিক উড়িয়া নীচে আসিল, অমনি অপরটি সঙ্গে সঙ্গে নীচে আসিল। একটি আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; অপরটি অমনই তাহাই করিতে লাগিল। একটি চঞ্চু ব্যাদন করিয়া শব্দ করিল; একটি উড়িয়া বৃক্ষশাখায় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ন্যায় শব্দ করিল। অপরটিও উড়িয়া সেই স্থানে বসিল। এতদ্দর্শনে নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবংবিধ বিহঙ্গ-চরিত্র দর্শনে কি বিষাদের উদয় হইল, তাহা তিনিই জানেন।

শূন্যদৃষ্টির প্রকৃতি অনুসারে নবকুমার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়নের প্রতি নিপতিত হইল। দেখিলেন, তথায় একটি প্রস্ফুটিত কমল রহিয়াছে। পরক্ষণেই তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাহা রমণীর বদনকমল। সে পদ্মমুখীকে তিনি চিনিলেন। আর দৃষ্টি ফিরিল না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সংজ্ঞালোপ হইল।

"কপাল-কুণ্ডলা"

এই নামটি সজোরে উচ্চারিত করিয়া নবকুমার মূর্চ্ছিত হইলেন। অমনই রমণীর বদন গবাক্ষ হইতে অপসৃত হইল। পরক্ষণেই সুন্দরী যথায় নবকুমারের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ধরণীতলে নিপতিত রহিয়াছে, দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া নবকুমারকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু নিপতিত হইয়া হতচেতনের বদন আর্দ্র করিতে লাগিল। যেমন ঘোরকৃষ্ণ জলদজালমধ্যে স্বর্গীয় অগ্নি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আলুলায়িত আগুল্ফলম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ চিকুরজালোপরি রমণী স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নবকুমারকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবকুমারের মুখে চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তখনও সুন্দরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া সুন্দরীর চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "বল প্রিয়ে কপালকুণ্ডলা! বল বল, আমাকে ক্ষমা করিলে? আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী সত্য; তথাপি আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি ঘোর নারকী; আমি তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। আমার স্পর্শে তোমার পবিত্র দেহ কলুষিত হইতেছে। মৃন্ময়ি! তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমি এ পাপ জীবন রাখিব না।"

নবকুমার রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "স্বামিন্! তোমার অপরাধ কি? তুমি কাঁদ কেন? ভবানীর মনে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, তুমি তাহার কি করিবে? বিধাতার ইচ্ছায় আমরা আবার পুনরায় মিলিত হইলাম। এখন রোদন কেন?"

বীণা যেমন মধুর ধ্বনিতে শ্রোতৃমন মুগ্ধ করে, তদ্বৎ এই বাক্য নবকুমারের কর্ণকে মোহিত করিল। তিনি শুনিলেন, সেই স্বর! সেই স্বর যেন আজ মধুময় হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি দেখিলেন, সেই কপালকুণ্ডলা। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ তাঁহারা তদবস্থায় থাকিলেন, তাহা কেহই জানিলেন না।

ইত্যবসরে উমাপতি তথায় আসিলেন, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। উমাপতি কপালকুণ্ডলাকে চিনিলেন, প্রথমে তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল। তিনি সত্বর ভট্টাচার্য্য, অধিকারী ও মথুরানাথকে এই সুখময় সংবাদ দিলেন। সকলে দৌড়িয়া আসিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না। অধিকারী ভূয়োভূয়ঃ কপালকুণ্ডলার মস্তক আঘ্রাণ

করিতে লাগিলেন। সকলেরই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন। অধিকারী তাঁহাকে চিনাইয়া দিলেন এবং নিজের সহিত কপালকুণ্ডলার কি সম্পর্ক, তাহাও প্রকাশ করিলেন। আনন্দাশ্রু-বিগলিত কপালকুণ্ডলা পিতা ও খুল্লতাত-চরণে প্রণতা হইলেন। ক্রমে অধিকারী তাঁহাকে অন্তর্ভূত সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। অনতিবিলম্বে রামদাস রায় সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি একে একে সমূল ঘটনা জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, "এই কন্যার ন্যায় সতীলক্ষ্মী ভূমণ্ডলে আর নাই। ইনি আমার দুহিতাস্বরূপ। উন্মাদিনি তুমি পর হইতে আপন হইয়াছিলে, তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা হইয়াছিল। এখন তুমি আমার অপেক্ষাও আত্মীয় ব্যক্তিগণের নিকটস্থ হইলে। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি এখন সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক, চিরায়ুষ্মতী হও। আমি তোমার সুখ দেখিলে সুখী হইব। অতএব মা! আমিও তোমার শ্বশুরালয় যাইব।"

সকলই আনন্দময় হইল। বিশ্বসংসারে আর যেন কোথাও নিরানন্দ নাই। মহানন্দে সকলে সপ্তগ্রাম যাত্রা করিলেন।

চিরদুঃখিনী কপালকুণ্ডলা এতদিনের পর, এত কষ্টের পর পতি, পিতা, মাতা, সহোদরা প্রভৃতির সহিত সংমিলিত হইলেন। শৈশবে পিতা-মাতার পূর্ণকেশী অরণ্যমধ্যে পালক কাপালিকের কপালকুণ্ডলা, স্বামীর মৃন্ময়ী এবং রক্ষক রামদাসের উন্মাদিনী পুনরায় আনন্দমধ্যে নীত হইলেন। গ্রন্থকারও কপালকুণ্ডলার এই অজ্ঞাত ইতিহাসখণ্ড পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিয়া বিদায় হইলেন।

উপসংহার

এই সামান্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি যবনিকা পতনের পূর্ব্বে গ্রন্থ-সম্ভূত অপরাপর পাত্রগত দুই একটি কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা গ্রন্থকারের পক্ষে নিতান্ত অবিধেয়।

বলা বাহুল্য যে, অনতিবিলম্বে উমাপতি ও মুক্তকেশী বিবাহিত হইলেন। শ্যামাকে এই সকল সুসংবাদ দিয়া শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন করা হইল। মুক্তকেশীর বিবাহের পূর্ব্ব হইতে অনেক দিন পর পর্য্যন্ত মৃন্ময়ী পিতৃভবনে থাকিলেন।

এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বে দেলবর অথবা গোপালকৃষ্ণ দস্যুদলকে প্রকাশ করত বাটী আসিয়া পিতা, মাতা প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। রাজ-আজ্ঞায় রহিম প্রভৃতি দস্যুগণের শিরশ্ছেদ হইল। গোপালকৃষ্ণ কথিত পুরস্কার পাইলেন ও রাজ-প্রাসাদে অত্যুন্নত পদ লাভ করিলেন।

অধিকারী অনেক দিন সপ্তগ্রামে থাকিয়া আনন্দ-সম্ভোগ করত পুনরায় হিজলি গমন করিলেন।

শ্যামা প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

সম্পূর্ণ